بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়
মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল আরিফ

404206

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০০৭

Dhaka University Library
404206

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়
মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল আরিফ

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
পিএইচ. ডি (ঢা.বি), এম.এ. বি.এ অনার্স (ঢা.বি)
ডি. এইচ (ঢাকা), ডি. টি (মুলতান)

অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : অফিস ৯৬৬১৯২০-৫৯
এক্স. ৪৩১০, ৪৩১৭

DR. A H M MUJTABA HOSSAIN
Ph. D (D.U), M. A, B. A Hons. (D.U)
D. H (Dhaka), D. T (Multan)

PROFESSOR
Department of Islamic Studies
University of Dhaka, Bangladesh.
Phone : Off. 9661920-59
Ext. 4310, 4317

Ref. .....

Date ২৭/০৬/০৭

প্রত্যয়ন পত্র

জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল আরিফ (ম্যানেজার কোম্পানী এফেয়ার্স, দৈনিক নয়াদিগন্ত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত 'ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি :

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত।
২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম।
৩. এটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এই শিরোনামে এম ফিল ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

এ গবেষণা সন্দর্ভটি এম ফিল ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যান্ত দেখেছি এবং এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

২৭.৬.০৭

(প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Res. : 25 Baddanagar Lane, Hazaribagh, Dhaka-1205. Phone : 9661365, 505278

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যাবস্থা শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিশেষভাবে এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, সযত্ন তাকিদ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। আমীন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাবেক চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শাহ্ আবদুল হান্নান এ গবেষণাকর্মের শিরোনাম নির্বাচনসহ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে এবং ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থার মৌলিক দৃষ্টিভংগির নির্দেশনা দিয়ে যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন– তা চিরস্মরণীয়।

ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, স্কীল ডেভেলপম্যান্ট স্কীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী সংশ্লিষ্টদের সহায়তা এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর গবেষণার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করতে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

এ গবেষণাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার জনাব নূরুল ইসলাম এবং জনাব ইকবাল কবীর মোহন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার সহধর্মিনী আলেয়া বেগম সুমী এ কাজ সম্পন্ন করতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে দেয়ার পাশাপাশি উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে সব সময় আমাকে সহায়তা করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণার এ গবেষণাকর্ম।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র প্রিয়ভাজন শামসুল হুদা সোহেল অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কম্পোজ করে আমার কষ্ট লাঘব করেছে। এ ছাড়াও নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যেতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। আমি সকলের মর্যাদামণ্ডিত সফল জীবন কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র/ ৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার/ ৫
সংকেত সূচী/ ১০
ভূমিকা/ ১১

অধ্যায় : এক
ইসলামী অর্থনীতির বিকাশ

অর্থনীতির সংজ্ঞা ও পরিচয়/ ১৬
অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস/ ২০
অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়/ ২৩
অর্থনীতির উদ্দেশ্য/ ২৪
ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা/ ২৬
ইসলামী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ/ ২৯
ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য/ ৩৩
ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি/ ৪৫
ইসলামী অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি/ ৫০
ইসলামী অর্থনীতি ও সনাতন অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য/ ৫২

অধ্যায় : দুই
ইসলামী ব্যাংকের ক্রমবিকাশ

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা/ ৫৪
ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ/ ৫৫
ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ/ ৫৭
ব্যাংকের কার্যাবলী/ ৫৯
ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা/ ৬৪
বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ/ ৬৬
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক/ ৬৮
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি/ ৬৮
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য/ ৭২
ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য/ ৭৩
ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস/ ৭৭
ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ড ও সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড/ ৮০
ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য/ ৮১
ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কেন/ ৮৩
প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলীর সমন্বিত চিত্র/ ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : তিন
প্রাক-ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা

বিভিন্ন নবী-রাসূল (সা.)-এর যুগে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ পদ্ধতি/ ৯৬

- হযরত আদম 'আ./ ৯৬
- হযরত নূহ 'আ./ ৯৭
- হযরত মূসা 'আ./ ৯৮
- হযরত শোয়াইব 'আ./ ৯৯
- হযরত হূদ ও হযরত সালেহ 'আ./ ১০০
- হযরত ইউসুফ 'আ./ ১০০

প্রাচীন আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা/ ১০২

- তায়েফের অর্থনৈতিক অবস্থা/ ১০৩
- মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থা/ ১০৬
- মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থা/ ১১০

প্রাচীনকালে পণ্য বিনিময় পদ্ধতি/ ১১৫

অধ্যায় : চার
বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদে বিনিয়োগ ব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা/ ১১৮

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা/ ১১৯

মিশ্র অর্থব্যবস্থা/ ১২০

ইসলামী অর্থব্যবস্থা/ ১২০

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য/ ১২৯

সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার পার্থক্য/১৩৫

ফ্যাসীবাদ কিংবা নাৎসীবাদ/ ১৩৯

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের অর্থনৈতিক মতাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা/ ১৪২

- মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ধর্মের প্রভাব/ ১৪২
- বাহ্মণ্য মতবাদ/ ১৪৩
- বৌদ্ধ মতবাদ/ ১৪৫
- ইহুদী মতবাদ/ ১৪৬
- ঈসায়ী মতবাদ/ ১৪৭
- ইসলাম/ ১৪৯

অধ্যায় : পাঁচ
ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা : শর'য়ী বিধান

বাই মুরাবাহা : লাভে ক্রয়-বিক্রয়/ ১৫৮

বাই মুয়াজ্জাল : বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়/ ১৬১

বাই সালাম : অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়/ ১৬৪

বাই মুদারাবা : উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ/ ১৬৮

বাই মুশারাকা : শিরকাত অংশীদারী কারবার/ ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

ইজারা বা ভাড়া/ ১৮১
নিলামে ক্রয়-বিক্রয়/ ১৮২
ইস্‌তিসনা শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন/ ১৮৩
ইসলামের দৃষ্টিতে আল ওয়াদিয়া/ ১৮৪

অধ্যায় : ছয়
ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগের গুরুত্ব/ ১৯০
- বিনিয়োগ ও ঋণের পার্থক্য/ ১৯০
- বিনিয়োগে ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রকারভেদ/ ১৯৩
- সময়ের ভিত্তিতে বিনিয়োগের প্রকারভেদ/ ১৯৩
- জামানতের ভিত্তিতে বিনিয়োগের প্রকারভেদ/ ১৯৩

বিনিয়োগ ও ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী পদ্ধতি/ ১৯৪
- বাই-মুরাবাহা বা চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়/ ১৯৬
- বাই-মুয়াজ্জাল বা বাকী মূল্যে বিক্রয়/ ১৯৯
- বাই-সালাম বা অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়/ ২০০
- বাই-ইসতিসনা বা আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়/ ২০২
- বাই-আল ইনা/ ২০৫
- মুদারাবা/ ২০৬
- মুশারাকা/ ২০৯
- হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিলক/ ২১৪

বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতি/ ২১৮

অধ্যায় : সাত
মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়ন/ ২২২
মানব সম্পদ উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মকর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা/ ২৩০
দারিদ্র্য বিমোচনের বিশেষ কর্মপন্থা/ ২৩৩
দারিদ্র্য বিমোচনে রাসূল সা.-এর আদর্শ ও শিক্ষা/ ২৩৬
বেকার লোকদের সমস্যা সমাধানে করণীয়/ ২৪০
মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ব্যবস্থা/ ২৪১

অধ্যায় : আট
ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের পথে সমস্যাসমূহ/ ২৫০
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাফল্য/ ২৬২
অন্যান্য সম্ভাবনাসমূহ/ ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : নয়

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ : অনুসরণীয় কৌশল

বিনিয়োগ পরিকল্পনার ক্ষেত্র নির্দেশ/ ২৬৯

পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়/ ২৭২

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিবেচ্য পরিকল্পনা/ ২৭৩

- যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীবাহিনী গঠন/ ২৭৩
- বিনিয়োগযোগ্য তহবিল একত্রিকরণ/ ২৭৩
- আত্মনিয়োজিত অংশীদার বাড়ানো/ ২৭৬
- সব পর্যায়ে শৃঙ্খলা আনয়ন/ ২৭৬
- গ্রুপভিত্তিক কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন/ ২৭৭
- মানুষ হিসেবে সকলকে যথার্থ মূল্যায়ন ও দায়িত্ব প্রদান/ ২৭৭
- উপার্জন কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ/ ২৭৮
- সম্পদহীনদের কাজে লাগানোর বিশেষ ব্যবস্থা/ ২৭৮
- পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন/ ২৭৮
- গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ/ ২৭৯

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে গ্রহণীয় কৌশলসমূহ/ ২৭৯

- ইরান : প্রাথমিক তথ্যপত্র/ ২৮০
- অর্থব্যবস্থা ইসলামীকরণে ইরানের অনুসৃত পদ্ধতি/ ২৮২
- ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণে পাকিস্তানের অনুসৃত পদ্ধতি/ ২৮৪
- সুদানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণ/ ২৮৬

উপসংহার/ ২৯০

গ্রন্থপঞ্জি/ ২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

(সা.)	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা.)	:	রাযি আল্লাহু 'আনহু
(আ.)	:	'আলাইহিস সালাম
(রহ)	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
হি.	:	হিজরী
খ্রী.	:	খ্রীস্টাব্দ
ই ফা বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বা এ	:	বাংলা একাডেমী
তা বি	:	তারিখ বিহীন
লি.	:	লিমিটেড
খ.	:	খণ্ড
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সং	:	সংস্করণ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
সম্পা.	:	সম্পাদিত
অনূ.	:	অনূদিত
মৃ.	:	মৃত
Ed.	:	Edition
P	:	Page
pp	:	Pages
N d	:	Nil dated
Vol	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের সাধারণ অর্থনৈতিক পদ্ধতির পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতিতেও বিভিন্ন পদ্ধতির বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ ব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে নিত্য নতুন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ পদ্ধতি। কুরআন এবং সুন্নাহকে উৎস ধরে সমসাময়িক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই বিনিয়োগ ব্যবস্থা আকৃষ্ট করছে সকল শ্রেণীর মানুষকে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ সহজেই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সুদকে পরিহার করে নানা ধরনের আকর্ষণীয় ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য অর্থ বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে। বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থায় যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে বিনিয়োগ হচ্ছে, সেগুলো হলো :

১. মুশারাকা : অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণের বিনিয়োগ।

২. মুদারাবা : ব্যাংকের মূলধন এবং ব্যবসায়ীর শ্রম ভিত্তিক বিনিয়োগ।

৩. মুরাবাহা : চুক্তি মোতাবেক পণ্য ক্রয় করে মুনাফাসহ নগদ বিক্রয়।

৪. বাই মুয়াজ্জাল : চুক্তি মোতাবেক পণ্য ক্রয় করে নির্দিষ্ট দামে বাকীতে বিক্রয়।

৫. বাই সালাম : সময় ও মূল্য নির্ধারণ করে চুক্তি মোতাবেক আগাম পণ্য ক্রয়।

৬. হায়ার পার্চেজ/ইজারা বিল : আসল ও ভাড়া কিস্তিতে পরিশোধের মাধ্যমে যন্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয়।

৭. বাই/লিজিং/ইজারা : যন্ত্রাদি, ইমারত ও অন্যান্য টেকসই দ্রব্যাদি ভাড়ায় প্রদান।

৮. কর্জ : শুধু মাত্র সার্ভিস চার্জ নিয়ে টাকা ধার দেয়া।

৯. অন্যান্য।

ইসলামী অর্থনীতির এ সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি এখন পর্যায়ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে এবং ব্যাংকসমূহ এ বিনিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমকে মানুষের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকাংশ জনগোষ্টির আদর্শিক বিশ্বাসের বিপরীত দর্শন দিয়ে অর্থনৈতিক সামষ্টিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাধারণ অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ব্যবস্থায় যে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব, ইসলামী অর্থনৈতিক বিনিয়োগ পদ্ধতিতেও সে সমস্ত বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে দেশের সকল জনশক্তিকে কাজে লাগানো, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু উৎপাদন করতে পারে। নিজের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় বা বাজারজাত করে স্বীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে নিতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাইওনিয়র হিসেবেই কাজ করছে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এটি বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের অন্যতম। প্রায় ১৪ কোটি মানুষের এই দেশে প্রতি বছর শতকরা ২.৫ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

পাচ্ছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৪০ জন। পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা সাড়ে ছয় জন। মানুষের সংখ্যার আনুপাতিক হারে কৃষি জমি খুবই কম। স্বল্প সম্পদ, জনসংখ্যার বৃদ্ধির উচ্চ হার এবং দারিদ্র ও বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই দেশে প্রয়োজন এমন এক বিনিযোগ ব্যবস্থা, যে বিনিয়োগ ব্যবস্থা চক্রাকারে বৃদ্ধি পাওয়া সুদের যাতাকল থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

আগামী ২০০৮ সাল নাগাদ এই দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটিতে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান করে অবস্থার উত্তরণে ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সময়ের প্রেক্ষাপটে একান্তই জরুরি পদক্ষেপে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এদেশের প্রায় ৯০% লোক মুসলমান। ধর্মীয় বিশ্বাস তথা ঈমান আকীদার কারণে এদেশের সকল মুসলমান সাধারণভাবে সুদভিত্তিক বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে না, ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক হারে বিনিয়োগ সম্প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। ইসলামী অর্থনৈতিক বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সাথে সাথে এ ধারায় এক যুগান্তকরী সফলতা অর্জিত হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে কিভাবে আরো সুসংহত করা যায় এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিটি শাখায় পৌঁছে দেয়া যায়– এ লক্ষ্যে এ গবেষণার অবতারণা।

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে উক্ত লক্ষ্য সমাপনে অভিসন্দর্ভকে নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা বিন্যাস করা হয়েছে। শুরুতে ভূমিকায় অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তুর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির বিকাশ শীর্ষক শিরোনামে *অধ্যায় : এক*-এ অর্থনীতির সংজ্ঞা ও পরিচয়; অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস; অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়; অর্থনীতির উদ্দেশ্য; ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা; ইসলামী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ; ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য; ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি; ইসলামী অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি; ইসলামী অর্থনীতি ও সনাতন অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি শিরোনামে ইসলামী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : দুই-এর শিরোনাম ইসলামী ব্যাংকের বিকাশ। এ অধ্যায়ে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা; ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ; ব্যাংকের কার্যাবলী; ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা; বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ; বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক; ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি; ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য;

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য; ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস; ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ড ও সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড; ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য; ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কেন; প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলীর সমন্বিত চিত্র ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ তথ্যপঞ্জিসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাক-ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা *অধ্যায় : তিন*-এর শিরোনাম। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন নবী-রাসূল (সা.)-এর যুগে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। যেসব নবী-রাসূল সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে তারা হলেন : হযরত আদম (আ.); হযরত নূহ (আ.); হযরত মূসা (আ.); হযরত শোয়াইব (আ.); হযরত হুদ ও হযরত সালেহ (আ.); হযরত ইউসুফ (আ.)। প্রাচীন আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা শিরোনামে তায়েফের অর্থনৈতিক অবস্থা; মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থা; মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া প্রাচীনকালে পণ্য বিনিময় পদ্ধতিও এ অধ্যায়ের আলোচনায় যুক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদে বিনিয়োগ ব্যবস্থা শীর্ষক *অধ্যায় : চার*-এ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা; সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা; মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য; সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার পার্থক্য; ফ্যাসীবাদ কিংবা নাৎসীবাদ শিরোনামসমূহে তুলনামূলকভাবে এ সব মতবাদের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের অর্থনৈতিক মতাদর্শের তুলনামূলক আলোচনায় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ধর্মের প্রভাব; বাহ্মণ্য মতবাদ; বৌদ্ধ মতবাদ; ইহুদী মতবাদ; ঈসায়ী মতবাদ সর্বোপরি ইসলাম এর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।

অধ্যায় : পাঁচ-এ ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা : শর'য়ী বিধান শীর্ষক শিরোনামে বাই মুরাবাহা : লাভে ক্রয়-বিক্রয়; বাই মুয়াজ্জাল : বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়; বাই সালাম : অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়; বাই মুদারাবা : উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ; বাই মুশারাকা : শিরকাত অংশীদারী কারবার; ইজারা বা ভাড়া; নিলামে ক্রয়-বিক্রয়; ইস্‌তিসনা শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন; ইসলামের দৃষ্টিতে আল ওয়াদিয়া– এ বিষয়গুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ পদ্ধতি শীর্ষক শিরোনামে *অধ্যায় : ছয়*-এ ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিনিয়োগ ও ঋণের পার্থক্য; বিনিয়োগে ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রকারভেদ; সময়ের ভিত্তিতে বিনিয়োগের প্রকারভেদ; জামানতের ভিত্তিতে বিনিয়োগের প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে এবং বিনিয়োগ ও ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী পদ্ধতি শীর্ষক শিরোনামের অধীনে বাই-মুরাবাহা বা চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়; বাই-মুয়াজ্জাল বা বাকি মূল্যে বিক্রয়; বাই-সালাম বা অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়; বাই-ইসতিসনা বা আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়; বাই-আল ইনা; মুদারাবা; মুশারাকা; হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিলক্ বিষয়ের আলোচনা শেষে বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত আলোচিত হয়েছে।

অধ্যায় : সাত-এ মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ শীর্ষক শিরোনামে ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়ন; মানব সম্পদ উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মকর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা; দারিদ্র্য বিমোচনের বিশেষ কর্মপন্থা; দারিদ্র্য বিমোচনে রাসূল (সা.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা; বেকার লোকদের সমস্যা সমাধানে করণীয়; মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ব্যবস্থা ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা : সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক শিরোনামে *অধ্যায় : আট*-এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের পথে সমস্যাসমূহ; বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাফল্য;

এবং অন্যান্য সম্ভাবনাসমূহ ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনা বিধৃত হয়েছে।

অধ্যায় : নয়-এর শিরোনাম ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ : অনুসরণীয় কৌশল। এ অধ্যায়ে বিনিয়োগ পরিকল্পনার ক্ষেত্র নির্দেশ; পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়; গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিবেচ্য পরিকল্পনা– যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীবাহিনী গঠন; বিনিয়োগযোগ্য তহবিল একত্রিকরণ; আত্মনিয়োজিত অংশীদার বাড়ানো; সব পর্যায়ে শৃঙ্খলা আনয়ন; গ্রুপভিত্তিক কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন; মানুষ হিসেবে সকলকে যথার্থ মূল্যায়ন ও দায়িত্ব প্রদান; উপার্জন কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ; সম্পদহীনদের কাজে লাগানোর বিশেষ ব্যবস্থা; পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন; গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ– এ বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে। একই অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে গ্রহণীয় কৌশলসমূহের আলোচনায় ইরান : প্রাথমিক তথ্যপত্র; অর্থব্যবস্থা ইসলামীকরণে ইরানের অনুসৃত পদ্ধতি; ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণে পাকিস্তানের অনুসৃত পদ্ধতি; সুদানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণ– এ বিষয়গুলোর আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগের অনুসরণীয় কৌশল সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের শেষে রয়েছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি। উপসংহারে এ অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস তুলে ধরা হয়েছে এবং গ্রন্থপঞ্জিতে অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : এক
ইসলামী অর্থনীতির বিকাশ

জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা দার্শনিক ও ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতিতে অর্থনীতির বিশ্লেষণ করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং আজো সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো 'রিপাবলিক' গ্রন্থে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে ক্যাসেল, মিল, স্মিথ, ভেকার্ড ও জন এ বিষয়টিকে দার্শনিক ও ব্যবহারিক রূপ দেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তা তাঁদের চিন্তাধারা ও গ্রন্থরাজিতে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। পরিশেষে কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্র মতবাদ ও তার বাস্তব কর্মসূচির মাধ্যমে ইউরোপে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তা-ভাবনা প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতিতে এর যে প্রভাব পড়েছে তা সমর্থন ও বিরোধিতার সুরে শুধু ইউরোপকেই প্রভাবিত করছে না, এশিয়া তথা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সর্বত্র এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন ক্ষেত্র সোভিয়েত রাশিয়া[১] অন্যদেরও এই পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন।[২]

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতিগুলোর ভিতর এমন একটি পদ্ধতিও নেই, যার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কল্যাণ ও ন্যায়-নীতিকে একত্র করে বিশ্ব মানবের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ঝাণ্ডা উঁচু করেছে। এ কথা তো কল্পনাও করা যায় না যে, তাদের দেয়া মতবাদ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা পার্থিব অগ্রগতির সাথে সাথে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ এবং মানুষের চরিত্র উন্নতির উঁচু স্তরে পৌছানোর দায়িত্ব পালন করেছে।

প্লেটো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাবলিক'-এ অর্থনৈতিক দিক থেকে মানুষকে স্বাধীন ও দাস— এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে মানুষকে মানুষের মনিব হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দুর্বলের উপর সবলের ঘৃণা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাতে করে তিনি শ্রেণী সম্পর্কে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে শুধু সামাজিক ব্যবস্থাকেই বরবাদ করেন নি, জীবনোপায়ের ক্ষেত্রেও সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীগত বৈষম্য অনেকটা টিকিয়ে রেখেছেন

রোমান ও পারসিক আড়ম্বরপূর্ণ সভ্যতা পৃথিবীর মানুষকে পরিতৃপ্ত করেছে বটে, কিন্তু স্বজাতি ও স্বধর্মীয় সাধারণ মানুষের জন্য সত্য ও কল্যাণের কোন বার্তা আনতে পারেনি। যা কিছু করেছে সবই আমীর-উমরা ও রাজা-বাদশাদের মধ্যে সীমিত ছিল। পারস্যে মুজদকের শিক্ষার আলোকে যে ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়েছিল তা তো উল্লেখেরও যোগ্য নয়। অনুরূপ একনায়কত্বও পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে ঘৃণা ও প্রভুত্ব এবং সাধারণ কল্যাণের স্থলে বিশ্বমানবকে পরাধীন সত্তায় রূপান্তরিত করা ছাড়া আর কিছুই দান করতে পারেনি।

সমাজতন্ত্র যদিও সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বার্তাবাহক হওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু একদিকে সে আল্লাহর বিদ্রোহী সেজে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ হয়ে

---

১. সোভিয়েত ব্যবস্থা বর্তমানে বিলুপ্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবগুলো প্রজাতন্ত্র এখন এক-একটি স্বাধীন দেশ।

২. মাওলানা হিফজুর রহমান, মাওলানা আব্দুল আউয়াল অনূ. *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়েছে, অপরদিকে নিজেকে শ্রেণীসংগ্রামে জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজনীন শান্তি বার্তার পরিবর্তে সমাজতন্ত্রও একটি বিশেষ শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী; পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সেটি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী; পুঁজিপতি শ্রেণী নয়।

বস্তুত পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র পরিচালন-ব্যবস্থা এবং বিশ্ববাসীর প্রতিটি উদ্যোগই এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা বরণ করেছে। ইউরোপের বর্তমান ভয়াবহ যুদ্ধ এই ব্যর্থতাকে এমনভাবে প্রকাশ করে চলেছে যে, আধুনিক সভ্যতায় ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ আজ হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না।

এখন দু'টো পথই খোলা রয়েছে– হয় পৃথিবী ধ্বংসের শিকার হয়ে অন্যায় ও পাপাচারে ভরে যাক, নতুবা সত্যিকার শান্তি ও কল্যাণময় পৃথিবীতে পরিণত হোক। আর এই কল্যাণ ও শান্তি পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে আজ থেকে সাড়ে তের শ' বছর আগে মহানবী (সা.) এবং তাঁর উত্তরসূরি খুলাফায়ে রাশেদার খিলাফত আমলে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض-

ফেনা, সে তো শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর মানুষের উপকারে যা আসবে, তা মাটির বুকে থেকে যায়।[৩]

সুতরাং এখানে আমরা ইসলামী নিযামে হুকুমতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার মনস্থ করেছি। অবশ্য আজকের রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনব্যবস্থায় এমন সব চাকচিক্য ও জাঁকজমক রয়েছে, যেগুলো সুখ-শান্তি বিধানের পরিবর্তে মানুষের বিপদাপদ ও সমস্যা বাড়িয়ে চলেছে। এসব জাঁকজমকের দরুন বিভিন্ন দেশের সরকারকে কোটি কোটি টাকা ভুখা-নাঙ্গা মানুষের কল্যাণে ব্যয় না করে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির যুগে এসব জাঁকজমক বলতে কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও তার বাস্তব কর্মতৎপরতায় অর্থনীতির সত্যিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হয়েছে।

মোটকথা, এখানে এমন কোন মতবাদ আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়, যা তার দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণের দিকে তাকালে অত্যন্ত উন্নতমানের মনে হবে। কিন্তু তার বাস্তব উপকারিতা একেবারে শূন্যের কোঠায় কিংবা সভ্যতার ধ্বংস সাধনে অত্যন্ত তৎপর, আমরা এরূপ একটি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো যাতে মানুষের পার্থিব প্রয়োজন ও জীবনোপায়ের জন্য উত্তম কর্মসূচী রয়েছে। এই ব্যবস্থা বাস্তব জীবনেও প্রমাণ করেছে, সে মানুষকে তার সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত চরিত্র গড়ে তোলার সাথে সাথে সবার জন্য বৈষম্যহীন জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করেছে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং শ্রেণী-সংঘাতের স্থলে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী বয়ে এনেছে।

অর্থনীতির সংজ্ঞা ও পরিচয়

মানুষের জীবন অসংখ্য প্রকার প্রয়োজনের সাথে নিবিড়ভাবে বিজড়িত। প্রয়োজন ও আবশ্যকতাকে কেন্দ্র করে তার জীবন দিনরাত চক্রাকারে ঘুরছে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, উন্মুক্ত বায়ু ও অপত্য স্নেহ প্রভৃতি মানুষের জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানুষ তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য এই

---

৩. সূরা রা'দ : ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

অপরিহার্য প্রয়োজন এবং তা পূরণ করার উপায় ও প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় যে সামাজিক বিজ্ঞানে, তারই নাম অর্থনীতি।

প্রয়োজন পূরণের জন্য চেষ্টা ও শ্রম আর চেষ্টা ও শ্রমের ফলে পণ্য উৎপাদন এবং এই উৎপাদনের আয় দ্বারা প্রয়োজন পূরণ এটাই অর্থনীতির মোদ্দা কথা। কিন্তু এই প্রয়োজনসমূহ যেহেতু স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও শাশ্বত, তাই অর্থনীতিও চিরন্তন সত্য। এ জন্য অর্থনীতি ঠিক ততখানি প্রাচীন, যতখানি প্রাচীন মানুষের চেষ্টা ও সাধনা। তাই এর মূল বিষয়ে এবং এর স্বাভাবিক ও বুনিয়াদী গুরুত্বে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম কখনই পরিলক্ষিত হয়নি।

আভিধানিক সংজ্ঞা

অর্থনীতির আভিধানিক অর্থ হল অর্থ সংক্রান্ত বিধি-বিধান। অর্থনীতি النظام الاقتصادى -এর প্রতিশব্দ। قصد 'কসদুন' মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। قصد (কস্‌দ) বা اقتصاد -এর আভিধানিক অর্থ হল রুচিসম্মত চাল-চলন, মধ্যপন্থা বা মধ্যম পদ্ধতি। যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি মধ্যম পন্থায় জীবন যাপনের পদ্ধতির ও পন্থা নির্দেশ করে, এজন্য একে النظام الاقتصاد বলে নামকরণ করা হয়েছে।

অর্থনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Economics (ইকোনোমিকস)। মূলত গ্রীক শব্দ Oikonomia (ঐকোনোমিয়া) থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ হল 'গৃহস্থলীন ব্যবস্থাপনা'। মনে করা হয় যে, প্রাচীন কালে গ্রীক দেশে অর্থনীতির প্রথম সূচনা হয় গৃহস্থলীন ব্যবস্থাপনার সীমিত পরিসর থেকে। তাই তখন একে Oikonomia বা Economics নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্র যেহেতু সে কালের গৃহস্থলীন ব্যবস্থাপনারই সম্প্রসারিত রূপ, তাই অর্থশাস্ত্রকে Economics নামেই অভিহিত করা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

অর্থনীতির পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ করা যায়।

অর্থনীতির বিদগ্ধ গবেষক আল্লামা হিফজুর রহমান সিওহারভী (রাহ.) অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন :

> অর্থনীতি এমন এক শাস্ত্র যা অধ্যয়ন করলে এমন সব নীতিমালা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, যা সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের যথার্থ পন্থা ও সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, সম্পদ বিনষ্ট ও ধ্বংস হওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ের প্রজ্ঞা দান করে।

ড. আব্দুল্লাহ মুহসিন আত্‌তরিকী অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন :

هو العلم بالاحكام الشريعة العلمية عن ادلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال وانفاقه واوجه تنميته-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যে বিদ্যা অর্জন করলে সম্পদ উপার্জন ও তা ব্যয় এবং সম্পদের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল- প্রমাণের আলোকে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় তাকে অর্থনীতি বলে।[৪]

স্যার জেমস স্টুয়ার্ট বলেছেন :

অর্থনীতি এমন একটি শাস্ত্র, যা এক ব্যক্তি সমাজের একজন হওয়ার দিক দিয়ে কিরূপ দূরদৃষ্টি ও মিতব্যয়িতার সাথে নিজ ঘরের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে তা আমাদেরকে বলে দেয়। এজন্য ব্যক্তিগত অর্থনীতির যে গুরুত্ব রয়েছে ঘরের ছোট্ট পরিবেষ্টনীতে, সমগ্র রাষ্ট্রে অনুরূপ গুরুত্ব রয়েছে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির।

এল. এম. ফ্রলার বলেছেন :

কেবল মূল্য ও সামঞ্জস্যের সমন্বয়েই অর্থনীতি হয় না, উহার পরিধি অতিশয় বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। বস্তুত মানবজীবনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের নাম অর্থনীতি এবং মানুষের কল্যাণ সাধন ব্যতীত উহার অন্য কোন উদ্দেশ্যই হইতে পারে না।

আর টি ইলে (R. T. ELY)-ও এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন :

Economis is a science, but something more than a science, a science that though with the infinite variety of human life, calling no only or systematic, ordered thinking, but humam sympathy, imagination, and in an unusual degree for the saving grace of commounsense.

অর্থনীতি বিজ্ঞান হলেও বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। এটা এমন বিজ্ঞান, যা মানবজীবনের অসীম বৈচিত্র্যময় দিক ও বিভাগসমূহের আলোচনা করে। এটা কেবল সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত চিন্তার আবেদনই জানায় না; মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করতে এবং বাস্তব জ্ঞান অসাধারণ পরিমাণ সম্প্রসারণ করতেও তা সচেষ্ট।

অর্থনীতিবিদ মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেছেন :

Economics is a science which studies man in the ordinary business of lire.

অর্থাৎ, অর্থনীতি মানুষের জীবনের সাধারণ কার্যাবলীর পর্যালোচনা মাত্র।

তিনি আরো বলেছেন :

মানুষ কিভাবে আয়-উপার্জন করে এবং কিভাবে উপার্জিত আয় ব্যয় করে অর্থনীতি তারই নির্দেশ দেয়।

অধ্যাপক এল. রবিনস্-এর মতে :

Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and acarce means which have alternative uses.

অর্থাৎ, অর্থনীতি এমন এক বিজ্ঞান যা মানুষের সে সকল আচরণকে অধ্যয়ন অনুশীলন করে, যে সকল আচরণ উদ্দেশ্য এবং নানা বিকল্প দিকে ব্যবহারযোগ্য উপায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

অর্থনীতি কোন ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাপার নয়। অর্থনীতির প্রকৃত রূপ সামাজিক। সামাজিক জীবনেই অর্থনীতির গুরুত্ব। কেয়ার্নক্রস (Cairncross) তাই বলেছেন :

---

৪. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন, ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স, ২য় সং, ২০০৩, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

> Economics is a scial science studying how peoply attempt to accomodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange.

বস্তুত সমাজের সর্বসাধারণের মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজন অনুসারে পণ্যের উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্যের সুবিচারপূর্ণ বণ্টন এবং উৎপাদনের উপায় ও উহার সঠিক বণ্টনের ন্যায়-নীতিসম্পন্ন প্রণালী নির্ধারণ করাই অর্থনীতির কাজ। এ জন্য হওয়েরি (Howerey) দাবি করেছেন :

> অর্থনীতিকে চরিত্রনীতি হতে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না বলে এই বিজ্ঞান কোনদিনই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। কারণ, মানুষ হিসাবেই উদ্দেশ্য ও উপায়-পন্থার উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদদের আরো অনেকে অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল একে 'গৃহ পরিচালনার বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন ও সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের ধ্যান-ধারণায় যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থা ও মূল্যবোধেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এ কারণে অর্থনীতির সংজ্ঞায়ও ক্রম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেছেন এবং এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন :

> অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।

এই সংজ্ঞার সারকথা হল সমাজে সম্পদ কিভাবে উৎপন্ন হয় এবং কিভাবে তা ব্যবহৃত হয়–এর আলোচনার মাঝেই অর্থনীতি সীমাবদ্ধ।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এ সি পিগু বলেন :

> সমাজবিজ্ঞান ও মানবকল্যাণের যে অংশের পর্যালোচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্যের পরিমাপ করে তাকেই অর্থনীতি বলা হয়।

অধ্যাপক কেয়ার্নক্রস বলেন :

> যে সমাজবিজ্ঞান মানুষের অভাব-অনটন পূরণের প্রচেষ্টা, পারস্পরিক বিনিময়ের পন্থা ও পদ্ধতির প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করে তাকেই অর্থনীতি বলা হয়।

অর্থনীতিবিদ জে এস মিল বলেন :

> অর্থনীতি হচ্ছে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবহারিক শাস্ত্র।

অধ্যাপক জে বি সি অত্যন্ত স্বল্প শব্দসম্ভারে অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন :

> যে শাস্ত্র ধন-সম্পদ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা-ই অর্থনীতি।
>
> যে শাস্ত্র অর্থনৈতিক কল্যাণের উপায় ও পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করে তাই অর্থনীতি।

আজকের পৃথিবীর পরিধি ও বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক, আজ বিশ্বসভ্যতায় ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সকল বিষয়াদিই বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই আজকের অর্থনীতি তথা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের প্রদত্ত সীমিত সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল না হয়ে আমরা অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা এ ভাষায় প্রদান করতে পারি যে :

> মানবসমাজের অভাব ও চাহিদা পূরণ, মানবজীবনের কল্যাণ সাধনের কক্ষে অর্থ সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বিকেন্দ্রীকরণ ও মানুষের জীবনকে সুখী সমৃদ্ধকরণ নিয়ে যে সমাজবিজ্ঞান বা মাস্ত্র আলোচনা করে তাকেই অর্থনীতি বা ধনবিজ্ঞান বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, অভাব ও তৃপ্তি লাভের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর স্বল্পতা থেকেই মানবজীবনে অর্থনৈতিক সংকটের উৎপত্তি ঘটেছে। মানুষের জীবনে প্রয়োজনের কোন শেষ নেই। একটা প্রয়োজন পূর্ণ হলে আরেকটা প্রয়োজন এসে দেখা দেয়। এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই মানুষ ছুটে চলে অহর্নিশ। বস্তুত এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদই পৃথিবীর চাকাকে সচল করে রেখেছে; জীবনকে করে রেখেছে সক্রিয় ও গতিশীল। পৃথিবীর অধিকাংশ কর্মকাণ্ডের মূলে কাজ করে এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদ। যদি আবার প্রয়োজন পূরণের উপকরণগুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প না হত, আর চাহিবা মাত্রই যদি সকল আকাংখা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করা সম্ভব হত এবং মানুষের সকল চাহিদার নিবৃত্তি ঘটত তাহলে মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি হত না; আর অর্থশাস্ত্রের উদ্ভবও ঘটত না।

অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস

মানুষ যখন থেকে জীবন যাপন করতে শুরু করেছে তখন থেকেই তার সম্পদের প্রয়োজন হয়েছে নিঃসন্দেহে। সেই প্রাচীনকালে মানুষ সম্পদ আহরণ ও লেনদেনের যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করত, তাই যে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে তা বলাই বাহুল্য। যদিও শাস্ত্রীয় অর্থনীতির জ্ঞান সেকালের মানুষের ছিল না, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে বিবেকোদ্ভূত জ্ঞানের আলোকেই তারা তাদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়। তখনকার মানুষের মাঝেও জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনার প্রচেষ্টা যে ছিল, তা ব্যাখ্যা করে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ নিদর্শনসমূহ থেকে এ কথা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাবে অর্থনীতি কখন থেকে বিকশিত হয়েছে তা বোধ হয় বলা মুশকিল। তবে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল তাদের দর্শন বিশ্লেষণে বাণিজ্য, উৎপাদন ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আধুনিক অর্থনীতিতেও মৌলিকভাবে উৎপাদন, বিনিয়োগ, দামব্যবস্থা, বাজার প্রক্রিয়া, মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাংক ব্যবস্থা, সরকারী আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, বিষয়গত ভাবনা পূর্বেও যা ছিল, বর্তমানেও প্রায় তাই রয়েছে। শুধু প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র।

যদিও শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে শাস্ত্রীয় অর্থনীতি তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি, কেননা তখন পৃথিবী ছিল কৃষিনির্ভর। বাণিজ্যের পরিধি সীমিত ছিল কৃষিপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মাঝে। তখন উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাও ছিল খুব শ্লথ। কিন্তু ইসলাম সেই সময়ই পৃথিবীকে উপহার দিয়েছিল একটি বেগবান, গতিশীল ও সুবিন্যস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো।

শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত ইউরোপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘুমন্ত ছিল বলা চলে। মুসলিম বিশ্ব যখন তাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে সুসংহত ও সুবিন্নস্ত করে নিয়েছে তখনও ইউরোপে অর্থনীতির তেমন একটা চর্চাই শুরু হয় নি। তখন পর্যন্ত তাদের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। চরম দারিদ্র ও অভাবের মাঝে কাটত তাদের দৈনন্দিন জীবন। এ কারণে তখন পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যের পরিধি কৃষি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মাঝে সীমিত ছিল। সে সময় পৃথিবীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাও ছিল খুব শ্লথ। তাই মনে হয় শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত তারা অর্থব্যবস্থার জন্য শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণ ও দানের প্রয়োজন তেমন একটা অনুভব করেনি এবং প্রবৃত্তিজাত মেধার আলোকেই তারা অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম আঞ্জাম দিয়েছে।

১৪০০ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। মানুষ আবিষ্কার করে গতিশীল আরেক নয়া পৃথিবীকে। নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠে

Dhaka University Institutional Repository

এবং মানুষ নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে অর্থনীতির শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

প্রাচীন পৃথিবীতে রোম ও পারস্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কালে কিছু কিছু অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনার উৎকর্ষ সাধিত হলেও তা কোন দার্শনিক রূপ লাভ করতে পারেনি। ১৬০০-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক মতবাদ গড়ে উঠেছিল; তাকে বলা হয় মার্কেন্টালিজম। এ মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করতেন যে, অর্থনৈতিক সম্পদ হল মূল্যবান ধাতব পদার্থ সমূহ। সুতরাং স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা ও মূল্যবান পাথর যে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কাছে বেশী থাকবে; সে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রই অধিক সম্পদশালী বলে পরিগণিত হবে। এ ধরণের রাষ্ট্রই বৃহৎ সেনাবাহিনীর গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীতে তারাই শক্তিধর জাতি হিসাবে গণ্য হবে। আর এই সম্পদ আহরণের জন্য রাষ্ট্র কর ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাগুলোর উপর নির্ভর করতে পারবে। এই চিন্তা ধারার বিকাশে যারা অধিক অবদান রেখেছিলেন তাদের মাঝে ইংরেজ বনিক টমাস মান (১৫৭১ খ্রী-১৬৪১ খ্রী) ও ফরাসী অর্থমন্ত্রী ফিলিপস (১৬৩৮খ্রী-১৭১২খ্রী)-কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়।

১৭৬০-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে ফরাসী ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে। ফিজিওক্র্যাটদের মতে সম্পদের উৎস হল ভূমি। ভূমির মালিকানা যে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের যতবেশী হবে সে ব্যক্তি বা রাষ্ট্র ততই সম্পদশালী হবে। এই চিন্তা ধারার নেতৃপুরুষ ছিলেন ফ্রস্কুইজ (১৬৮৪-১৭৭৪ খ্রী) ও টরগেট (১৭২৭-১৭৮১ খ্রী)।

মার্কেন্টালিজম ও ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারা থেকে পরবর্তীতে পৃথক একটি চিন্তাধারা গড়ে উঠে। সেটিকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা। এটিকেই আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। এই চিন্তাধারায় সম্পদকে ভূমি ও ধাতব পদার্থের মাঝে সীমাবদ্ধ না করে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যেমন– মূলধন ও শ্রম সহ সম্পদের প্রসারিত সংজ্ঞার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

১৭৭৬ সালে এডাম স্মিথ The Wealth of Nations নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে পুস্তকে তিনি মতামত পেশ করেন যে, একটি অদৃশ্য হাত সমাজের মানুষের পছন্দ ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাজার ও বাজারদর প্রক্রিয়া সেই অদৃশ্য হাতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৭৮৯ সালে টমাস মালথাস অর্থনীতিতে একটি নতুন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্যামিতিক হারে অর্থাৎ - ১-২-৪-৮-১৬ এই হারে। আর খাদ্যের যোগান বাড়ে গাণিতিক হারে অর্থাৎ - ১-২-৩-৪-৫-৬ এই হারে এবং তা বাড়ে ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন বিধির আওতায়। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা না হলে আগামী পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ও মৃত্যু হবে অবশ্যম্ভবী। তবে তার এই মতবাদ পরে উপেক্ষিত হয়।

অর্থনীতির অন্য আর একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ হলেন ডেভিড রিকার্ডো। তিনি অর্থনীতিতে একটি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখান যে, কী ভাবে স্পদের স্বল্পতার সমস্যাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বারা কাটিয়ে উঠা সম্ভব। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্জনের পথে যে বাঁধা রয়েছে সেগুলোকে তিনি অলঙ্ঘনীয় মনে করতেন। ফলে তার আশাবাদ হতাশায় পরিণত হয়।

এসময় কার্লমার্ক্স অর্থনীতিতে একটি বিপ্লবাত্মক ধারার সূচনা করেন। তিনি একটি আবেগময় শ্লোগান শুনিয়ে পৃথিবীকে চিরন্তন ধারা ভেঙ্গে একটি নতুন ধারার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। তার দেওয়া দর্শনের সার কথা ছিল পুঁজিপতিরা গরীব ও শ্রমিকদেরকে শোষণ করছে। অতএব পুঁজিপতিদের উৎখাত করে শ্রমিকদের রাজ কায়েম করতে হবে এবং ধনী-গরীবের ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে একটি সাম্যের অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এজন্য পৃথিবী ব্যাপী শুরু করতে হবে শ্রেণী সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামই বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রলেতারিয়েতদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ The capital-এ উল্লেখ করেছেন যে, পুঁজিবাদ তার নিজস্ব গতিতেই ধ্বসে পড়বে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপ যথেষ্ঠ ধনী হয়ে উঠে। ফলে মানুষ তার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী দ্রব্য ক্রয় করার প্রবণতার শিখার হয়। একারণে ভুক্তাদের চাহিদার প্রান্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেন বেশ ক'জন অর্থনীতিবিদ। ষ্টেনলি, জেভন্স, আলফ্রেড মার্শাল, কার্ল মেঞ্জার, লিও ওয়ালরাস ছিলেন তাদের মাঝে অন্যতম।

ওয়ালরাস বাজারদর সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, একটি অর্থনীতি কিভাবে বহু বাজার সমন্বিত হতে পারে। প্রত্যেক বাজার যেমন অন্য বাজারকে প্রভাবিত করে, তেমনি অন্যান্য বাজার দ্বারাও সে বাজারটি প্রভাবিত হতে পারে। মার্শালও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপলস অবইকোনোমিকস'-এ চাহিদা, যোগান, উৎপাদন, ব্যয়, প্রতিযোগিতা মূলক বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছিলেন।

১৯৬৩ সালে কেইনস তাঁর 'জেনারেল থিউরী' নামের গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তার দেওয়া থিউরীর উপর ভিত্তি করে অর্থনীতিতে একটি আধুনিক যুগের সূচনা হয়। তাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিতে যে নতুন যুগের সূচনা হয় তাকে কেইনসীয় অর্থনৈতিক বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কেইনসের তত্ত্বের সফলতা সত্ত্বেও ক্লাসিক্যাল অর্থনৈতিক ধারার বিকাশ অব্যাহত ভাবেই চলতে থাকে। এই ক্লাসিক্যাল চিন্তা ধারাকে মুদ্রায় কেন্দ্রীভূত করে যে নতুন চিন্তাধারা জন্ম লাভ করে তা হল মনিটরিজম। এই চিন্তাধারায় মুদ্রাকেই অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি মনে করা হয় এবং মনে করা হয় যে, আর্থিক নীতির সাফল্যের উপরই অর্থনীতির সাফল্য নির্ভর করে। মিলটন ফ্রিডমেন হলেন এর প্রবক্তা। ১৯৬০ এর দশকে ফ্রিডমেন ও কেইনসের অনুসারীদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

যাই হউক দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও অর্থনীতি আপন গতিতে এগিয়ে চলছে। কিন্তু মনিটরিজমের এই নতুন অর্থনৈতিক ধারার সূচনার ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রতারণা ও ঘাপলার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। মনিটরিজমে মানুষকে প্রতারিত করার এমন অভিনব ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে যে, মানুষ স্বেচ্ছায় প্রতারণার ফাঁদে পা দিবে এবং প্রতারিত হওয়ার পর সে দেখতে পাবে যে, সব কিছু হারিয়ে সে সর্বশান্ত হয়ে গেছে। মনিটরিজম মূলতঃ পুঁজিপতিদের শোষণের অভিনব এক কৌশল। মুদ্রামানে তারতম্য ঘটিয়ে মুদ্রার ব্রবসার মাধ্যমে মানুষকে শোষণ করার দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে এই ব্যবস্থায়। এ কারণেই ইসলাম লেনদেন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাকে মূল হিসাবে গ্রহণ না করে পণ্যকে বিনিময়ের মূল হিসাবে গ্রহণ করেছে আর মুদ্রাকে গ্রহণ করেছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এবং মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুদ্রামানের সমতা রক্ষা ও নগদ লেনদেনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সামান্য এদার উদার হলে তাকে সুদ বলে ঘোষণা করেছে। যাতে মুদ্রামানে ঘাপলা সৃষ্টি করে মানুষকে প্রতারিত করা সম্ভব না হয়।

বস্তুতঃ ইসলাম যে অর্থনীতি প্রবর্থন করেছে তা সর্বকালের জন্যই আধুনিক। কারণ ইসলাম তার অর্থ ব্যবস্থাকে জীবন থেকে আলাদা করে ভাবতে চায়নি। কেননা এ রূপ ভাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে থিউরীসর্বস্ব হয়ে যায়। বরং ইসলাম চেয়েছে মানুষের জীবনধারার সাথে সঙ্গতি রেখে অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এমন কিছু মৌলিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে; যা সর্বকালে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে এবং যার আলোকে সর্বকালের নব উদ্ভূত অর্থনৈতিক সমস্যার মুকাবেলা করা সম্ভব হবে। সেই নীতিমালার আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদরা ৬০০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝেই একট সুবিন্যস্ত ও জোড়ালো অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরী করে নিয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ সহ অন্যান্য ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ তাদের গ্রন্থসমূহে অর্থব্যবস্থার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়

সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজের মানুষের প্রয়োজনসমূহ বিশ্লেষণ– মূলত সেই প্রয়োজন পূরণের বৈধ পন্থা ও সুষ্ঠু পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

অবশ্য অর্থনীতির বিষয়বস্তু ক্রমবর্ধমান। কেননা অর্থনীতি বিষয়টি প্রাচীনকালে খুবই সীমিত ছিল। ক্রমে ক্রমে তা প্রসারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, অর্থনীতির প্রথম চর্চা শুরু হয় গ্রিক দেশে। প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল অর্থনীতিকে 'গৃহ পরিচালনার বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছিলেন। মনে হয় সে সময় অর্থনীতি বিষয়টি গৃহ পরিচালনার পরিসরে সীমিত ছিল। পরে তা বিকশিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রখ্যাত ইংরেজি অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ সর্বপ্রথম এই শাস্ত্রকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' নামে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে :

> অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।

এ থেকে বুঝা যায় যে, সমাজে কীভাবে সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং কীভাবে তা ব্যবহৃত হয় তাই অর্থনীতির প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। তারও পরবর্তী কালে অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে :

> অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।

এ থেকে বুঝা যায় যে, অর্থকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে যে সব কার্যাবলি সম্পাদিত হয় এর সবই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। সুতরাং বলা যায় যে, অর্থনীতি ক্রম-প্রসারমান একটি বিষয় এবং এর বিষয়বস্তুও ক্রম-প্রসারমান।

বর্তমান পর্যন্ত অর্থনীতির পরিধি যতটুকু প্রসারিত হয়েছে সে নিরিখে অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক দিকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা গেল :

১. অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত যে সব কাজকর্ম করে সেগুলো অবশ্যই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। পিতা কর্তৃক সন্তানকে স্নেহ করা ও যত্ন নেয়া যেহেতু অর্থ উপার্জনের জন্য নয় তাই তা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হাসপাতালের নার্সের সেবা-যত্নের পিছনে যেহেতু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যই কাজ করে সুতরাং তা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বটে। এজন্যই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস বলেছেন, মানুষের কার্যাবলির যে অংশ অর্থের সঙ্গে জড়িত মূলত তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

২. মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য সম্পদের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। তাই সম্পদ উপার্জন ও তার ব্যবহারের নিয়মনীতি অর্থনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

৩. সম্পদ সীমিত অথচ মানুষের চাহিদা অসীম। তাই এই সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষের চাহিদা পূরণের বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়া কি হবে এবং কীভাবে মানুষ সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করতে পারবে তা নিয়ে আলোচনা করা অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য বটে।

৪. মানুষের অভাব ও চাহিদা পূরণের সঙ্গে উৎপাদন, লেনদেন পণ্যের বিনিময়, সুষ্ঠু বণ্টন ও ভোগের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। আর এ লেনদেনের সাথে মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সরকারের বাণিজ্যনীতি ও আয়-ব্যয়ের প্রশ্ন ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে অর্থনীতি এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. অর্থনীতি মানবকল্যাণের বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। কেননা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে ব্যক্তি ও সমাজ সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করতে পারে এটিই অর্থনীতির লক্ষ্য। তাছাড়া মানুষের কাজের ভালো-মন্দের দিক নিয়েও অর্থনীতি আলোচনা করে।

৬. মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি চিহ্নিতকরত তা সমাধানের সঠিক দিক নির্দেশনাও প্রদান করে।

৭. সম্পদের সংরক্ষণ, হিফাজত ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কেও অর্থনীতি আলোচনা করে।

৮. সম্পদের ক্ষতির দিকগুলো নিয়েও অর্থনীতি আলোচনা করে যেমন– মাদকদ্রব্য, ক্ষতিরক ঔষধ, হারাম খাদ্য ইত্যাদি।

৯. সম্পদের জরিপ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে, সুতরাং এটিও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বটে।

মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য চেষ্টা-সাধনা, অর্থনৈতিক সম্পদের উৎপাদন এবং তার ব্যয়-বণ্টনের সুষ্ঠু নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করাই অর্থনীতির উপজীব্য বা আলোচ্য বিষয়।

অর্থনীতির উদ্দেশ্য

সম্পদ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে জ্ঞানদানের মাধ্যমে একটি কল্যাণধর্মী ইনসাফপূর্ণ সুষম অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং সার্বজনীন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনের প্রচেষ্টা করা।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণে 'সুষ্ঠু ব্যবহার বিধি' বলতে বুঝানো হচ্ছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের অফুরন্ত সম্পদরাজি মহান রাব্বুল আলামীনের অবারিত অফুরন্ত দান। পৃথিবীর মানুষের জীবন সৌন্দর্য বৃদ্ধি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের মানসেই এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সম্পদ ব্যবহার করে মানুষ তার প্রয়োজন পূরণ করবে, জীবন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে– যাতে জীবন হয়ে ওঠে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভের পথ হয় সহজগম্য; এটাই স্রষ্টার উদ্দেশ্য। ইরশাদ হয়েছে :

انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ابهم احسن عملا-

আমি ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা এই সৌন্দর্য বিধানের জন্য, যাতে আমি পরীক্ষা করতে পারি কে উত্তম আমল করে।[৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

هو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما اتكم-

তিনিই তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন এবং কতিপয়কে কতিপয়ের উপর মর্যাদাগত প্রাধান্য দিয়েছেন, যাতে তিনি যা কিছু দিয়েছেন তার ব্যাপারে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।[৬]

---

৫. সূরা কাহাফ : ৭।

৬. সূরা আন'আম : ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং এই সম্পদের ব্যবহার-বিধি কি হবে তা অবশ্যই সম্পদদাতা কর্তৃক নির্ধারিত হবে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বিধি বলতে স্রষ্টা প্রদত্ত ঐ বিধানকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা সম্পদদাতার ইচ্ছার বিপরীতে যে বিধান হবে তা অবশ্যই সুষ্ঠু বিধান হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না।

'সুষম অর্থব্যবস্থা' বলতে এমন অর্থব্যবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে যেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আকাশ-পাতালের ন্যায় হবে না। অন্যথায় সকলের সম্পদ সমান হবে এ কথা অবশ্যই নয়। কেননা সম্পদের পার্থক্য একটি প্রাকৃতিক বিষয় এবং তা কুরআন কর্তৃক স্বীকৃত। ইরশাদ হয়েছে :

والله فضل بعضكم بعض فى الرزق-

আমি জীবনোপকরণে তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি।[৭]

সমাজের কতিপয় সদস্য অবশ্যই সম্পদশালী থাকবে, তবে তাদের সম্পদ যেন অন্যের দারিদ্র্যের কারণ না হয়; বরং অধিক উপার্জনকারী সদস্য হিসেবে তার উপর অধিক ব্যয়ের বিধান থাকতে হবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সমষ্টি মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হতে হবে। অবশ্য সমাজতন্ত্র সম্পদের ক্ষেত্রে সকলের সমতার প্রবক্তা, যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

'সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণ'-এর কথা বলে প্রত্যেকের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ও অভাবসমূহ পূরণের বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় মানুষের বল্গাহীন অসীম চাহিদা পূরণের মত পর্যাপ্ত সম্পদ পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব হবে না। কেননা মানুষের আহরিত সম্পদ সব সময় সীমিত। রাসূল (সা.) তাই বলেছেন : 'কবরের মাটি ছাড়া তার অভাব পূরণ হবে না।'

'সার্বজনীন কল্যাণ অর্জন'-এর অর্থ এই অর্থব্যবস্থার মূল দৃষ্টিভঙ্গি অধিক লাভ কিংবা মুনাফা অর্জন নয়; বরং সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যক্তি বিশেষের নয়; বরং সার্বজনীন সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

'সামগ্রিক কল্যাণ লাভ'-এর অর্থ এই অর্থব্যবস্থা শুধু মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করবে না; বরং মানুষের নৈতিক চরিত্র, আত্মিক উৎকর্ষ ও পারলৌকিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রয়াস গ্রহণ করবে।

অবশ্য আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অনেকেই শুধু জাগতিক কল্যাণকেই অর্থনীতির উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'জেমস স্টুয়ার্ট' অর্থনীতির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন :

> এ শাস্ত্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য উপার্জন উপায়ের সন্ধান করা।'

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস প্রায় এরই কাছাকাছি উক্তি করেছেন। তাঁর মতে :

> সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজন অনুপাতে পণ্যের উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্যের সুবিচারপূর্ণ বণ্টন, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান এবং তার যথার্থ বণ্টনের ন্যায়-নীতিসম্পন্ন পন্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করাই হচ্ছে অর্থনীতির কাজ।

অবশ্য কেয়ার্নক্রসের বক্তব্যে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের সুর অনুরণিত হয়েছে।

মার্শালও অর্থনীতির কেবল জাগতিক উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করেছেন। তার ভাষায় :

---

৭. সূরা আন নাহল : ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

> অর্থনীতি মানুষের জীবনের সাধারণ কার্যাবলীর পর্যালোচনা মাত্র। মানুষ কিভাবে আয় উপার্জন করবে এবং উপার্জিত আয় কিভাবে ব্যয় করবে অর্থনীতি তারই নির্দেশ দেয়।

অবশ্য অনেক পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ মানবকল্যাণকেও অর্থনীতির উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন এল. এম. ফ্রলার বলেছেন :

> অর্থনীতির পরিধি অতিশয় বিশাল ও বিস্তৃত। বস্তুত মানবজীবনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের নামই অর্থনীতি এবং মানুষের কল্যাণ সাধন ব্যতীত এর আর কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না।

আর. টি. ইলেও মানবকল্যাণকে অর্থনীতির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার মতে :

> অর্থনীতি এমন এক বিজ্ঞান যা মানজীবনের অসীম বৈচিত্র্যময় দিক ও বিভাগসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র কেবল সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত চিন্তারই আবেদন জানায় না; বরং মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করতে এবং বাস্তব জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে অসাধারণভাবে সম্প্রসারিত করতেও একান্ত সচেষ্ট।

অবশ্য অনেকেই নৈতিক দিককে অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করেছেন। যেমন হাউয়েরি বলেছেন :

> অর্থনীতিকে চরিত্রনীতি থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলেই এ বিজ্ঞান উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কোন দিনই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। কেননা, মানুষ মানুষ হিসেবে জীবনের উদ্দেশ্য ও তা সাধনের উপায় পদ্ধতির উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

অর্থাৎ সকলের উদ্দেশ্য এক নয়, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে এবং প্রত্যেকের বেলায় সে উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা ও পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন থাকতে পারে।

এছাড়া এই বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, পৃথিবীতে কোন কাজই উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে না। প্রতিটি কাজের পেছনেই একটা বিশেষ মানসিকতা কাজ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কল্যাণকর-অকল্যাণকর হওয়ার পরিমাণও তার উদ্যোগ ও উদ্দেশ্যের ভালো-মন্দ হওয়ার উপর নির্ভর করে। যদি তার পেছনে খারাপ মানসিকতা কার্যকর থাকে, তাহলে পুরো উদ্যোগটাই খারাপ বলতে হবে। আর এরূপ অবস্থায় নিঃসন্দেহে উক্ত 'ব্যবস্থা' মন্দ ব্যবস্থা। যদি কোন ব্যবস্থার পেছনে ভালো মানসিকতা কাজ করে এবং তার উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য সবই ভালো হয়, তাহলে উক্ত ব্যবস্থা বা পদ্ধতি কল্যাণকর হওয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করারও অবকাশ নেই।

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা

ইসলাম এক ভারসাম্যমূলক পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে যে শুধু সে অংগকে মানুষ নামে আখ্যায়িত করা যায় না, ঠিক তেমনি অর্থ-সম্পদ বিষয় বৈভব দেহ-আত্মা, রাষ্ট্র দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা কোন দিককেই ইসলামী জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে দেখা যায় না। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী সমাজদর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যে ৫টি মৌলিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে মানুষের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন তন্মধ্যে ২টি প্রশ্নই ধনবিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত।

১. জীবন কোন পথে ব্যয় করেছ?

২. যৌবন কোন পথে ব্যয় করেছ?

Dhaka University Institutional Repository

৩. আয় কোন পথে করেছ?

৪. ব্যয় কোন খাতে করেছ?

৫. ইসলামের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছ, বাস্তব জীবনে তা কি পরিমাণ অনুশীলন করেছ?

এ ৫টি প্রশ্নের মধ্যে তিন ও চার নম্বর প্রশ্ন দুটোই অর্থনীতি বিষয়ক।

ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতি। যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন হিসাবে স্বীকার করে না তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানই রাখে না। আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যারা আল কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত পরিপূর্ণ জীবনবিধানকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে চলে না, স্বীকৃতি দেয় না, একে পরিবর্তনযোগ্য ও লংঘনীয় মনে করে ইসলামের কিছু অংশ স্বীয় ইচ্ছা-অভিরুচি ও প্রকৃতিমাফিক মেনে চলে আর অবশিষ্ট জীবনবিধানকে অস্বীকার করে তারা শুধু আদমশুমারীর মুসলমান। কুরআন ও সুন্নাহর মূল্যায়নে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়।

ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে ঠিক তেমনি অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং অর্থনীতির নীতি পদ্ধতি প্রদান করেছে।

ইসলাম একটি কালজয়ী গতিশীল জীবনদর্শন হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহ মারফত মৌলিক অর্থনৈতিক নীতিমালার বিবরণ প্রদান করেছে। আজকের বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুবিচারের খুবই অভাব। অর্থনৈতিক বৈষম্য, বিশ্বব্যাপী সংঘাত, দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাস, নির্যাতন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে অমান্য করারই ফলশ্রুতি।

ইসলামী অর্থনীতি রাসূলের যুগ হতেই পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, খিলাফাতে রাশিদা, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে ইসলামী বিধি-বিধান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামী অর্থনীতির উপর বড় বড় গ্রন্থও সে যুগে রচিত হয়েছে।

ধনবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সাথে তাল রেখে বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী দার্শনিক, পন্ডিত ও অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিবিদের প্রদত্ত ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি :

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, পার্লামেন্টারিয়ান, লন্ডনস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন মহাপরিচালক ও উদ্যোক্তা অধ্যাপক খুরশীদ আহমাদ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন :

> কুরআন-সুন্নাহর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধকে গভীরভাবে ধারণ করে ইসলামী কাঠামোর আলোকে যে অর্থব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সমাজ বিজ্ঞান পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই ইসলামী অর্থনীতি।

অধ্যাপক এস এম আবুল কালাম প্রখ্যাত পাকিস্তানী অর্থনীতি বিশারদ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন :

> মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক ও দৈনন্দিন জীবনাচার, আয়, ব্যয় উৎপাদন, বণ্টন পদ্ধতি ও ভোগ সম্পর্কীয় সমাজ বিজ্ঞানের সে শাখায় ইসলামী অর্থনীতি যা ইসলামী শরিয়ার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডকে পর্যালোচনা করে তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে।

তুরস্কের প্রখ্যাত অর্থনীতি বিশারদ অধ্যাপক ডাঃ সাবাহ জাইম ইসলামী অর্থনীতির একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মতে :

> সমাজ বিজ্ঞানের যে গুরুত্বপূর্ণ শাখায় সুসংঘবদ্ধভাবে মানুষের চাহিদা পূরণে অর্থনৈতিক সমস্যার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও নীতি নির্ধারণ করে– অপর কথায় শরীয়াহভিত্তিক সুষম উৎপাদন,

Dhaka University Institutional Repository

বণ্টন, ভোগ, ব্যয় ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করে এবং বিজ্ঞান ও বাস্তব ভিত্তিক রূপরেখা ও অর্থনৈতিক অবদান রাখে তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে।

অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এ জেড এম শামসুল আলমের মতে :

সৃষ্ট জীবের কল্যাণে সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু ও সুবিচার ভিত্তিক বণ্টন, ন্যায়সংগত ভোগ-বিলাস বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কীয় শাস্ত্র ও সমাজ বিজ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি বিজ্ঞান।

প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক ডাঃ হাসান যামান ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন :

ইসলামী শরীয়াহর বিধি-নিষেধের ভিত্তিতে অবিচার ও যুলুম প্রতিরোধমূলক, বস্তু-সম্পদের আহরণ, উৎপাদন, বণ্টন, ব্যয়ের প্রক্রিয়া ও আল্লাহর খলিফা হিসাবে সমাজের সকল মানুষের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানের নামই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এম, একরাম খান ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন :

পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শরীয়াহভিত্তিক সামষ্ঠিক ও জাতীয় সম্পদকে সৃষ্টি ও মানব কল্যাণের জন্য প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।

বিশ্বনন্দিত যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন :

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও গতিশীলতার ধারাকে অব্যাহত রেখে যথার্থভাবে মানবজীবনের অভাব ও বুনিয়াদী চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুসারে ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ, প্রতিভার বিকাশ সাধনের শরীয়াহসম্মত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পূরণের ইনসাফপূর্ণ প্রয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।

বিশিষ্ট অর্থনীতি বিশারদ ড. মনযর ক্বাফ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন :

ইসলামী আইন, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান, ভূখণ্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, সে সমাজে ইসলামী জীবনধারা ও ইসলামের সামাজিক সুবিচার ও অর্থনীতি প্রয়োগের প্রক্রিয়া ও পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার নামই ইসলামী অর্থনীতি।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্বশীল, বাংলাদেশ সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. এম এ মান্নানের মতে :

ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে এমন ব্যাপকভিত্তিক সুসমন্বিত সমাজ বিজ্ঞান, যা উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের সামগ্রিক সমস্যাবলীকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার সাথে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রেখে বণ্টন, বিনিময় পদ্ধতিকে সামষ্টিক কল্যাণমুখী করে সামাজিক ও নৈতিক ফলাফলকে যথার্থ মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে এবং সমগ্র মানুষের কল্যাণচিন্তাকে প্রাধান্য দেয় ও তাদের উপস্থিতিকে সর্বক্ষেত্রে কল্যাণধর্মী মনে করে এমন কল্যাণধর্মী অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. এস উমার চাপড়া ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে :

ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের এমন শাখার নাম যা মানুষের উৎপাদিত, সঞ্চিত, দুষ্প্রাপ্য সম্পদরাজিকে ইসলামী শরীয়াহ নির্দেশিত প্রক্রিয়া ও পন্থায় সৃষ্টি ও মানবকল্যাণের জন্য ব্যবহার করার প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞান করে দান করে সম্পদের সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ বণ্টন নীতিকে সুনিশ্চিত করে এবং যে কোন প্রকার ভারসাম্যহীনতা, মূল্যায়ন সম্পর্কীয় জ্ঞান দান করে তাই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।

প্রয়োজন ও চাহিদাকে ইসলাম অপরিহার্যতার গণ্ডিতে সীমিত করে দেয়। চাহিদাকে বল্গাহীন করে দিয়ে সীমিত সম্পদের মাধ্যমে তা পূরণের চেষ্টাকে ইসলাম ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস বলে মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

তাই নির্দিষ্ট কতিপয় বিধি-বিধানের আওতায় ইসলাম মানুষের জীবনের প্রয়োজনকে সীমিত করে দিয়েছে। আর সীমিত সম্পদ দিয়ে সেই সীমিত প্রয়োজনকে পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা হওয়া উচিত নিম্নরূপ :

> জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহকে নিরূপণ এবং তা পূরণের জন্য খোদা প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহারের শরীয়তসম্মত বৈধ পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ সহকারে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে।

বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে ইসলামী অর্থ বিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান করে বলা যায় : 'বিশ্ব প্রকৃতির সমগ্র সম্পদ, সম্পত্তিকে মানব ও সৃষ্টির কল্যাণে সুষ্ঠু ও সুবিচার পূর্ণ বন্টন, ব্যক্তি ও সমষ্টির অভাব ও চাহিদা পূরণ, যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ, অর্থ-সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, আদান-প্রদান, বিনিময়, সমুদয় বিনিয়োগ, আমদানী, রফতানী সকল কিছুর ইনসাফপূর্ণ এবং কুরআন- সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক পরিচালনার সামষ্টিক প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানই ইসলামী অর্থনীতি।' ইসলামী অর্থনীতিই হচ্ছে বিশ্বসভ্যতার কল্যাণের ও সমৃদ্ধির জন্য একমাত্র সুবিচারপূর্ণ ভারসাম্যমূলক ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি। সমগ্র বিশ্বসভ্যতার কল্যাণের সমৃদ্ধির জন্য একমাত্র সুবিচার পূর্ণ ভারসাম্যমূলক ইনসাফ পূর্ণ অর্থনীতি সমগ্র বিশ্ববাসীর সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও কল্যাণ একমাত্র ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভরশীল।

ইসলামী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ

ইসলাম মানব জীবনের অন্যান্য দিকের উপর যেরূপ গুরুত্বারোপ করেছে ঠিক অদ্রূপ গুরুত্বারোপ করেছে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপরও; বরং মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেনের স্বচ্ছতার বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহতে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনে কারীম অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে অর্থনীতিতে চিরন্তন, শ্বাশত ও সর্বকালে প্রযোজ্য যেসব মূলনীতিগত বিষয় রয়েছে, তার সবগুলোর প্রতিই মৌলিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে আল-কুরআনে। যেমন অর্থ-সম্পদ উপার্জনের অনুপ্রেরণা দান প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে :

فاذا قضيت الصلواة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله-

> যখন নামায পড়া হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ প্রদত্ত ফযল (রিযিক) অনুসন্ধান কর।[৮]

বৈধ মালিকানার পন্থা তথা উত্তরাধিকার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين-

> আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ছেলেসন্তানরা মেয়ে-সন্তানের দ্বিগুণ পাবে।[৯]

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

احل الله البيع وحرم الربوا-

> আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।[১০]

---

৮. সূরা জুমআ : ১০।

৯. সূরা আন নিসা : ১১।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا-

হে মানুষ! ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু হালাল ও উত্তম বস্তু বিদ্যমান রয়েছে তা থেকে আহার কর।[১১]

কারিগরি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس-

এবং আমি লৌহকে সৃজন করেছি, যাতে অজস্র শক্তি ও মানুষের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[১২]

পারস্পরিক লেন-দেন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه-

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাকীতে লেন-দেন করবে, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রেখো।[১৩]

অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস না করা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

لا تاكلوا اموالكم بالباطل-

তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।[১৪]

এ ধরনের বহু মূলনীতি কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। যে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে গেলে একটি পৃথক পুস্তক হয়ে যাবে। অনরূপভাবে নবী কারীম (সা.)-এর হাদীসেও অর্থনীতির বহু মৌলিক দিক নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে বহু বিবরণ আল্লাহর রাসূলের বাণীতে বিধৃত হয়েছে।

এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, আজ থেকে নিয়ে ১৪শ' বৎসর পূর্বে সূচনাকালেই ইসলাম তার মৌলিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঘোষণা করে রেখেছে এবং বলা যায় যে, চিরন্তন মূলনীতি ঘোষণার সাথে সাথে তদানীন্তন কাল পর্যন্ত বিকশিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা কুরআন সুন্নায় বিধৃত হয়েছে। আজকের অর্থনীতির যে বিকশিত রূপ, তা মূলত সেকালে প্রচলিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেরই সম্প্রসারিত কিংবা প্রবর্তিত রূপ মাত্র। অতএব আধুনিক কালের যে কোন অর্থনৈতিক বিষয়েরই কোন না কোন প্রতিরূপ (নজির) সে কালের অর্থনীতিতে কম-বেশী অবশ্যই পাওয়া যাবে। প্রয়োজন শুধু অনুসন্ধানের। (অবশ্য গুটিকতক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।) উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলেই ইসলামী অর্থনীতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটি সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করেছিল। বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠাকরত যাকাত, সাদাকাহ্, উশর, আশুর ও খিরাজ, বিভিন্ন প্রকার দারাইব বা কর প্রবর্তন, জিযিয়াহ, হিমইয়াহ ইত্যাদি আদায় এবং তার সুষম বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে হিজরী প্রথম শতকেই ইসলামী অর্থনীতি একটি সুবিন্যস্ত অবকাঠামো লাভ করেছিল।[১৫] একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য।

---

১০. সূরা সূরা আল বাকারা : ২৭৫।

১১. সূরা আল বাকারা : ১২৮।

১২. সূরা আল হাদীদ : ২৫।

১৩. সূরা আল বাকারা : ২৮২।

১৪. সূরা আন নিসা : ২৯।

১৫. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় হিজরী শতকে পূর্বের তুলনায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা সম্প্রসারিত হয়, তখন সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান সুবিন্যস্তকরণ এবং নব উদ্ভূত সমস্যাসমূহের কুরআন-সুন্নাহ্ভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিলে তৎকালের আলেম-উলামা, ফিকাহ্বিদ ও মুজতাহিদগণ ফিকাহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। তখনই ইসলামী বিধি-বিধানগুলো অধ্যায়ের আলোকে বিন্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সময় পর্যন্ত যেহেতু অর্থনীতি ভিন্ন একটি বিষয়ের মর্যাদা লাভ করেনি অতএব তারা অর্থনীতি শিরোনাম দিয়ে কোন অধ্যায় শুরু না করলেও বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিধানগুলো অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণসহ যুক্তি-প্রমাণের আলোকে তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে গিয়েছেন। যেমন– তাঁরা যাকাত, কাফ্ফারাহ্, বেচাকেনা, লেনদেন, ভরন-পোষণ, মহর, উত্তরাধিকার, দিয়্যাত বা জরিমানা, ভূমি ভাড়া, ইজারা, উশর, খিরাজ, খনিজ সম্পদ, ব্যবসায়ী কর, যুদ্ধলব্ধ মাল, মালিকানাধীন সম্পদ, প্রোথিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কিফালা, হাওয়ালা ইত্যাদি শিরোনামে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে লিখিত যে সব ফিকাহ্ গ্রন্থে অর্থনৈতিক বিষয় স্থান পেয়েছে এগুলোর মাঝে বাদাযে- আবু হানিফা কৃত, মুদাওয়ানাতুল কুবরা- ইমাম মালিক কৃত, আল মাবসুত- সারাখসী কৃত, আল উম্ম- ইমাম শাফেয়ী কৃত, আল মুগনী-ইবনে কুদামাহ্ কৃত ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৎকালে শুধু অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেও বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছিল। তন্মেধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ কৃত 'আল-খারাজ', ইয়াহইয়াহ ইবনে আদম আল-কুরাইশীকৃত 'আল-খারাজ', আবু উবায়েদ কৃত 'কিতাবুল আম্ওয়াল' মুহাম্মদ আশ্-শায়বানী কৃত 'আল্ ইকতিসাব ফীর্ রিযকিল মুসতাতাব', 'ইয়াহইয়া ইবনে আমর কৃত 'আহকামুস সাওক', মুহাম্মদ আল-হুবাশী আল-ইয়ামানী কৃত 'আল্ বারাকাহ্ ফী ফযলিস সা'য়ী ওয়াল হারাকাহ্', ইবনে তাইমিয়া কৃত 'আল হিসবাহ্ মাওয়ারদী' রচিত 'আহকামুস সুলতানিয়্যাহ্' বিশেষভাবে উল্লে যোগ্য। পরবর্তীকালে রচিত ফিকাহ্ ও ফাতওয়ার গ্রন্থ সমূহেও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহারণ হিসাবে হিদায়া, ফতহুল কাদীর, দুররে মুখতার, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ, ফতওয়ায়ে রহিমিয়্যাহ, আহসানুল ফাতওয়া ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সে কালের বিন্যাস আধুনিক কালের বিন্যাসের চেয়ে ভিন্নতর ছিল এবং তাদের পরিভাষা ও আজকের পরিভাষায় বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ সকল ফাতওয়ার গ্রন্থে অর্থনীতির মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর উপর অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণসহ আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও তাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি।[১৬]

তাদের আলোচনার ধরন থেকে মনে হয় তারা কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকেই অর্থনীতি ও অর্থ উপার্জনের মূল বিষয় বলে ধরে নিয়েছিল। তাই তাদের অর্থনৈতিক আলোচনায় এই দুটি শিরোনাম প্রাধান্য পেয়েছে। আল্লামা মারওয়ারদী তো সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন :

اصول المكاسب الزراعة والتجارة- ثم قال والارجع عندى الزارعة-

উৎপাদনে মৌলিক বিষয় হল দুটি– কৃষি ও ব্যবসা।

পরে তিনি নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, আমার নিকট এ দুটোর মাঝে উত্তম হল কৃষি। অবশ্য সেকালে শিল্প বলতে হস্তচালিত যেসব শিল্পকারখানা ছিল; সেগুলোর ব্যাপারেও তারা ফাঁকে ফাঁকে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা চলে যে, মূলনীতিগত দিক থেকে তাদের আলোচনা এতটাই বস্তুনিষ্ঠ ছিল যে, বর্তমানেও সেগুলো সমানভাবেই প্রযোজ্য ও কার্যকর।

---

১৬. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য মধ্যযুগে ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের ফলে ইসলামী অর্থনীতির উপর তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়নি। যা হয়েছে তা হল পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অর্থনৈতিক অধ্যায়সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। কিন্তু ক্রমবিকাশমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর দিকনির্দেশনামূলক কোন গবেষণা কর্ম ব্যাপক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়নি। এই সুযোগে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্ববাজার দখল করে নেয়। ফলে আলেম-উলামাগণ ঘটমান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কোনটি বৈধ, আর কোনটি বৈধ নয় ব্যক্তিগতভাবেও ফাতওয়া দেওয়ার কাজেই ব্যাপৃত থেকেছেন। কিন্তু তারা উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য দিক নির্দেশনামূলক কোন পথ নির্দেশ করেন নি। অবশ্য রাষ্ট্রক্ষমতার ভিন্ন মেরুকরণও এই স্থবিরতার পিছনে অন্যতম কারণ হয়ে কাজ করেছে।

মধ্যযুগে অর্থনীতির প্রতি ইসলামী ফিকাহবিদদের এই অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতার ফলে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ দেখা দেয় :

- সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা পৃথিবীকে গ্রাস করে নেয়।
- সুদী লেনদেনের পদ্ধতিসমূহ মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।
- অবৈধ লেনদেন ও বেচা-কেনার প্রক্রিয়াসমূহ মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক ভিত্তিতে ছড়িয়ে পড়ে।
- মুসলমানদের মাঝে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া বিধানসমূহ লঙ্ঘনের প্রবণতা শুরু হয়। ফলে তারা এক্ষেত্রে নাফরমানী করে স্থায়ীভাবে পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে। এরই পরিণতিতে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান লঙ্ঘন করার মানসিকতা গড়ে উঠে।
- মুসলিম সন্তানরা ইসলামী বিধি-বিধান থেকে বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে উদাসীনতার শিকার হয় এবং এর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ফলে অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির গড়ে না ওঠার কারণে এক্ষেত্রে অভাব দেখা দেয়।
- সঙ্গত কারণেই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করার মত সামর্থ্যবান যোগ্যব্যক্তি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে; যে কারণে নবতর বিষয়ের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থার জন্য চলমান পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এর পরিণতিতে গোটা বিশ্ব পাশ্চাত্য অর্থনীতির আগ্রাসনের শিকার হয় এবং ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণধর্মী ও সুবিন্যস্ত বিধান থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সার্বজনীন সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় পৃথিবীর মানুষ। অর্থনৈতিক জটিলতার আবর্তে আটকা পড়ে গিয়ে জীবন সমস্যায় হাবুডুবু খেতে থাকে সারা দুনিয়া। আর আখিরাতের শাস্তি তো রয়েছেই।

অবশ্য আল্লামা ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দামায়', আল্লামা কাল-কাশান্দি 'সুবহুল আ'শা' নামক গ্রন্থে, ইবনে মাম্মাতী 'কাওয়ানীনুদ্ দাওয়াবীনে' অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রা.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় অর্থনীতির নতুন বিন্যাসের প্রতি খানিকটা আলোকপাত করেছিলেন। বিংশ শতকের শুরুর দিকে সারা বিশ্বে ইসলামের নতুন জাগরণ শুরু হলে অর্থনৈতিক বিষয়ে গুরুত্ব নতুন করে অনুভূত হয়। তখন নতুন করে এই বিষয়ের উপর সেমিনার সিম্পোজিয়াম, প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র তৈরী হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিকহ্ সপ্তাহ্, ১৯৬১ সালে দামেস্কে অনুষ্ঠিত ফিকহ্ সপ্তাহ, ১৯৬৮ সালে মিসরের কাহেরায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিকহ্ সপ্তাহ এবং ১২৯২ হিজরীতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এ সময় অনেকেই

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বই-পুস্তক ও কিতাবাদী রচনায় প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে মাওঃ হিফজুর রহমান (রহ)-এর 'ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম', মাওঃ মুশাহেদ আলী (রহ.) রচিত 'ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন', ড. আব্দুল্লাহ রচিত الاقتصاد السلامى والاقتصاد المعاصر মুহাঃ বাকের আস-সদর রচিত اقتصاد ডাঃ মুহাম্মদ শওকী রচিত المدخل فى الاقتصاد الاسلامى সুবহী সলেহ রচিত 'আন নাজমুল ইসলামিয়্যাহ্' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে অনেকেই এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক থেকে গবেষণা করেছেন। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মাওঃ তকী উসমানী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওঃ আব্দুর রহীম বাংলাদেশীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। শায়েখ জাকারিয়্যাহ্ (রহ)-এর ফাজায়েলে সাদাকাত যদিও অর্থনীতি সংক্রান্ত পুস্তক নয়, তবে তিনি অর্থনীতির আয়াত ও হাদীসগুলো তাঁর কিতাবে সংকলন করেছেন।

এই দীর্ঘ ইতিহাস থেকে এ কথা দাবী করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরা মুসলিম অর্থনীতিবিদদের থেকে অর্থনীতির চিন্তা-ভাবনা আহরণ করেছেন। অর্থনীতির অন্যতম দিকপাল এ্যাডাম স্মিথ-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ The Wealth of Nation-এ অর্থনীতির ইসলামী চিন্তাধারার যথেষ্ট ছাপ ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

রাব্বুল আলামিনের রবুবিয়াত বা বিশ্ব-প্রতিপালন নীতির অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের জন্য সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক এবং কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থনীতি। এই ব্যবস্থাপনার মূল বৈশিষ্ট্য হলো রবুবিয়াত বা প্রতিপালনবাদ। শুধু বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, এমনকি সমগ্র মানব জাতি নয়, আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতিপালনই হলো রবুবিয়াত। সৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠুতম বণ্টন, ন্যায়সংগত ভোগ বিশ্লেষণই হলো ইসলামী অর্থনীতি বিজ্ঞান

এ নিবন্ধে অর্থনীতির সংজ্ঞা ও ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা পরিবেশনের পর এ পর্যায়ে আমরা ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যাবলী ও রূপরেখার বিবরণ প্রদান করছি :

নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর

ইসলামী অর্থব্যবস্থা এর সামষ্টিক জীবনবোধ ও চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত নয়। ইসলামী জীবন-দর্শনের মূলভিত্তি তাওহীদ। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ, একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ ইখতিয়ার ইসলামী জীবনবোধের প্রধান ভিত্তি। রাষ্ট্র দর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, চিরন্তনতা, সম্মানদাতা, আইন ও বিধানদাতা হিসাবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিকট আত্মসমর্পণই ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের বুনিয়াদ।

পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যক্তির সীমাহীন মালিকানা, অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবাধ স্বাধনীতা, অর্থনৈতিক যুলুম, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার পথকে প্রশস্ত করেছে। অপরদিকে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সমস্ত অন্যায় যুলুম ও অনিষ্টের মূল কারণ বলে ব্যক্তি মালিকানার উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অবাস্তব মানবতাবিধ্বংসী, সমাজতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে হরণ করে রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। ইসলাম সামষ্টিকভাবে রাষ্ট্রীয়করণ ও অবাধ ব্যক্তিমালিকানাকে নিষিদ্ধ করে নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করে ভারসাম্যমূলক অর্থব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার নিরংকুশ মালিকানার ধারণা ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য; ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অবাধ ও নিরংকুশ মালিকানা স্বীকৃত নয়।

ইসলাম ব্যক্তিকে মালিকানায় যতটুকু ইখতিয়ার দিয়েছে তাকে বড় জোরে নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিমালিকানা বা সীমিত ব্যক্তি মালিকানা বৈধ ও সংগতভাবে আল্লাহর নিয়ামত ও সম্পদের ভোগ দখলের ন্যায়সংগত অধিকার বলা যেতে পারে। তাই অবাধ ব্যক্তি মালিকানাও নয় সামষ্টিকভাবে রাষ্ট্রীয়করণ বরং আল্লাহ তায়ালার একচ্ছত্র আধিপত্য নিরংকুশ মালিকানার দৃঢ়চেতনা কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতিই ইসলামী অর্থনীতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারসাম্যমূলক সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ভারসাম্যমূলক সুবিচারপূর্ণ সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অবাধ বুর্জোয়া পদ্ধতিতে পুঁজির সঞ্চয় ও স্তূপীকরণের কোন অবকাশ নেই। অপরদিকে জীবনের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত রাখার মতো সমাজকাঠামোকে ইসলাম অনুমোদন করে না। সুষম ইনসাফপূর্ণ সম্পদ বণ্টন ইসলাম অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কাঠামো ও রূপরেখা। ইসলাম বলে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সুবিচার ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন।' (আল কুরআন)

সম্পদ অর্জন ও উৎপাদনে বৈধভাবে অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার

ব্যক্তিনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন উপার্জনের প্রতিযোগিতার বৈধ স্বাধীনতার অধিকার দিয়ে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সুখ, সমৃদ্ধি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা ও নির্লিপ্ততা থেকে মুক্ত হয়ে মানসিক ও কায়িক শ্রমের প্রতিযোগিতায় সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থ-সম্পদ কোন বিশেষ মহলের হাতে কুক্ষিগত না থেকে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হতে থাকে।

হালাল ও হারামের নিয়ন্ত্রণ

ইসলামের সামগ্রিক জীবন-চেতনায় অর্থ সম্পদের উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের শর্ত আরোপ করে অসৎ উপার্জন ও অবৈধ পথে ব্যয় নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এক সুষম নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। অবৈধ ভোগ-বিলাসে অর্থ ব্যয়, জুয়া, ঘুষ, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ, মাপে কমবেশ প্রদানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা, প্রতারণা ও অবৈধ পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা প্রদান ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে পবিত্রতা, কলুষতা, নৈতিক অপরাধ ও অবক্ষয়মুক্ত, মার্জিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে হালাল পন্থায় উপার্জন, উৎপাদন ও হারাম পদ্ধতিকে বর্জনের উপর ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনিভাবে হালাল ও হারামের সামঞ্জস্যশীল সুস্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতিকে সুষমামণ্ডিত করে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হালাল ও হারামের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী অর্থনীতির এক দৃষ্টান্তহীন বিরল বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য একটি শান্তিপূর্ণ যুলুম ও নিষ্ঠুরতামুক্ত সমাজ গঠন ও মানুষের নিরাপত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

> হে মানবসকল! তোমরা পবিত্র ও হালাল খাদ্য গ্রহণ করো, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।[১৭]

আরও বলা হয়েছে :

> আল্লাহ প্রদত্ত হালাল ও পবিত্র রিযক ভক্ষণ করো, আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করো, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বন্দেগী করো।[১৮]

যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

যাকাত, উশর, গনীমত, ফাই, খুমুস, ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাকাতব্যবস্থা বস্তুত বিত্তহীনদের সঞ্চয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জীবন বীমা। ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত, উশর, ফাই, খুমুস ধনী বিত্তশালীদের নিকট হতে ঋণগ্রস্থ, পঙ্গু, বেকার, বন্দী, দাসমুক্ত, সংকটাপন্ন, পর্যটক ও নব দীক্ষিত মুসলিমদের পুনর্বাসনের খাতে ব্যয় করবে। ইসলামের যাকাতব্যবস্থা দরিদ্রের প্রতি ধনীর কোন অনুকম্পা বা অনুদান নয়; বরং সম্পদশালীদের উপর দরিদ্রদের অধিকার।

আল কুরআন বলে, 'ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে।' হাদীসে বলা হয়েছে, 'ধনীর কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করে, অভাব গ্রস্থদের পুনর্বাসনের জন্য তা ব্যয় করবে।'[১৯]

কুরআনে হাকীমে বলা হয়েছে : 'ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে তাদেরকে মার্জিত, পরিশোধিত পবিত্র করুন।' যাকাত ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস সমাজে সমতা আনয়ন করে। যাকাত দারিদ্র্য বিমোচন, সদ্ব্যহার ও পুনর্বাসনের সর্বোত্তম প্রক্রিয়া। যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে এবং যাকাত সম্পদের সুষম বণ্টনকে সুনিশ্চিত করে।

সুদ ও শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতির ৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট হচ্ছে শোষণের অন্যতম হাতিয়ার সুদের অভিশাপমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তিই হচ্ছে সুদ। সমাজবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত মালিকানার উৎখাত ও সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণ। আর ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সুদমুক্ত অর্থনীতি। ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্যে শ্রম ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করেছে। আর সুদকে করেছে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম সুদকে ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য পাপ বলে; সুদদাতা, গ্রহিতা, সাক্ষ্যদাতা সকলের ব্যাপারে ভীষণ শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে।

আল কুরআনে সুদদাতা ও গ্রহীতাকে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারী রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন ঘোষণা করেছে :

> আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন।[২০]

সুদ মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিষ্ঠুরতা, অর্থলিপ্সা, বুর্জোয়া মানসিকতা, নীতি-নৈতিকতা র্জিত উড়নচন্ডী স্বভাব, উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি করে। সুদ মানুষকে প্রেম, দয়া-দানশীলতা মহৎ গুণাবলী হতে বঞ্চিত করে

---

১৭. সূরা বাকারা : ১৬৮।

১৮. সূরা নাহল : ১১৪।

১৯. বুখারী ও মুসলিম।

২০. সূরা বাকারা : ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

হিংস্রতা ও নিষ্ঠুর মানসিকতাই বৃদ্ধি করে। ইসলামী অর্থনীতি সুদকে শোষণের প্রধান হাতিয়ার মনে করে।

কৃপণতা ও অপব্যয়মুক্ত অর্থকাঠামো

ইসলামী অর্থনীতির সপ্তম বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখা হচ্ছে, কৃপণতা ও অপব্যয়মুক্ত অর্থনীতি। ইসলাম কৃপণ ব্যক্তিকে আল্লাহর শত্রু ও দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহর বন্ধু বলে ঘোষণা দিয়েছে। কৃপণকে মানুষ থেকে আল্লাহর থেকে দূরত্বে অবস্থানকারী এবং দানশীলকে আল্লাহর নৈকট্যের অধিকারী, মানুষের নিকটতম ও সংবেদনশীল বন্ধু বলে ঘোষণা দিয়েছে।

অপরদিকে অপব্যয়কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানবকল্যাণে এমনকি স্বীয় পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, অন্ন-বস্ত্রের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয়কে ইবাদাত বলে ঘোষণা করে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তুমি যদি তোমার স্ত্রীর মুখে হালাল খাদ্যের লোকমা স্বহস্তে তুলে দাও তবে এটি সাদকা ও পুণ্যের কাজ।'[২১]

আবার আল কুরআনে অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে সূরা বনী ইসরাইলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়ে পরক্ষণেই শয়তানকে আল্লাহদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা, অপব্যয়, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, নির্দয়তার ঘৃণ্য স্বভাব বর্জন করে মানবকল্যাণ, দানশীলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতার মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এক সুখী, সুন্দর, কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা ইসলামী জীবনদর্শন ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পুঁজিবাদী বুর্জোয়া মানসিকতামুক্ত অর্থনীতি

ইসলামী অর্থব্যবস্থা অধিক পাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত ও বুর্জোয়া মানসিকতামুক্ত স্বল্প তুষ্টি ও তৃপ্তিভিত্তিক অর্থনীতি। এটি ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, 'আর অধিক পাওয়ার অবদর্মিতা, আকাংখা ও লোভ তোমাদেরকে সমাধিস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধ্বংসের পথে ধাবিত করবে।'[২২]

ইসলাম আরও ঘোষণা করেছে তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত, যারা শুধু সম্পদের স্তূপ বৃদ্ধি করে আর শুধু হিসাব কষতে থাকে আরও কি পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। (সূরা হুমাযাহ) ইসলাম আরও ঘোষণা করেছে : 'যারা শুধু সম্পদের স্তূপ পুঞ্জীভূত করে আর আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না।' (হে রাসূল (সা.) আপনি তাদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ দিন, যেদিন তাদের স্তূপকৃত সম্পদকে অগ্নিগোলকে পরিণত করে তাদের মুখমণ্ডলে, পৃষ্ঠদেশে ও পাঁজরে দাগ লাগানো হবে।'

ইসলামী অনিয়ন্ত্রিত সীমাহীন অবৈধ সঞ্চয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যাকাত দান, জনকল্যাণ, মানবসেবা ও সৃষ্টির সেবায় অর্থ ব্যয়ের মহান গুণাবলীর ভিত্তিতে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরোপকারের বৈশিষ্ট্যাবলী ও স্বল্পতুষ্টি ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

২১. বুখারী।

২২. সূরা তাকাসুর।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রাসূল (রা.) বলেছেন :

> যাদের কোন অভিভাবক নেই আমি (রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে) তাদের অভিভাবক।[২৩]

আল্লাহর রাসূল আরও বলেছেন, 'অমুসলিম নাগরিক যদি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের আনুগত্য করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে তাহলে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা মুসলিম নাগরিকের সমতুল্য।'[২৪] হযরত উমার (রা.) বলেছেন, আমার রাজ্যে সুদূর তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলে একটা ছাগলছানা (কুকুর ছানা)-ও না খেয়ে মরে তবে রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে আল্লাহর আদালতে অবশ্যই আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

যে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সংস্থান করতে পারে না, সে সমাজ ইসলামী সমাজ ও সে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র তথা কল্যাণ রাষ্ট্র নামে অভিহিত হওয়ার কোন অধিকারই রাখে না। তাই সন্দেহাতীতভাবে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ ও মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণ প্রতিরোধ

কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণ প্রতিরোধ ইসলামী সমাজ দর্শন ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ঘুষ, দুর্নীতি, মাপে কমবেশী দেওয়া, বিক্রিত দ্রব্যের ত্রুটি গোপন, চোরাচালন, কালোবাজারী, প্রতারণা, জুয়া, লটারী, যাদু বিদ্যা, ভবিষ্যদ্বক্তা, পৌত্তলিক শিল্প, হারাম দ্রব্যের ব্যবসা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, দেহ ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। প্রচলিত বাজারদরের চেয়ে অতিরিক্ত চড়া দামে ক্রয়-বিক্রয়ের মতো যুলুম ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামের দাওয়াত, তাবলীগ, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা, সর্বস্তরের মানবসেবা, মুসলিম, অমুসলিম, পৌত্তলিক সকল মানুষের কল্যাণ সকল সৃষ্টির সেবা ও সকল বিশ্ববাসীকে সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শনের পথে অর্থ ব্যয়কে ইসলাম ইবাদাতরূপে ঘোষণা দিয়েছে। কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণের প্রতিরোধ এবং হালাল রিযক অর্জন-উৎপাদনে অর্থ ব্যয়কে ইসলাম ফরয ইবাদত হিসাবে নির্ধারিত করেছে।

'বায়তুল মাল' বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার

'বায়তুল মাল' বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যবস্থা ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও অন্যতম কাঠামো। ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ও সম্পদ নয়। ইসলামী পরিভাষায় রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার বা রাজকোষকেই বায়তুল মাল বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রভাণ্ডার জনগণের সম্পদ। জনকল্যাণের জন্য তা

---

২৩. বুখারী।

২৪. বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদিত। ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত, খুমুস, গণীমাত, জিযিয়া, উশর, আয়কর, খারাজ সব ধরনের করই বায়তুল মাল রাষ্ট্রভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় এবং তা শরীয়াত ভিত্তিক দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত খাত সমূহে ব্যয় হয়। জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ, প্রশাসন, নিরাপত্তা, শান্তি-শৃংখলা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সংরক্ষণ সামরিক, আধা সামরিক, সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত, সরকারনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন কর্মকাণ্ড ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা, পেনশন, গ্রাচুইটি, বোনাস আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হলে চিকিৎসা ও অসহায় পরিবারের ব্যয়ভার ও পুনর্বাসনের ব্যয় বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাঘার হতে বণ্টন করা হয়। মূলত বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যবস্থা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

আয়-উপার্জনের বৈধ অধিকার

কায়িক ও মানসিক শ্রম, বিনিয়োগ ও কৃষি, বনজ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বৃত্তি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল পেশাজীবির হালাল উপার্জন ও উৎপাদনের অধিকার প্রদান ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীদের নিরাপত্তা বিধান। তাদের জৈবিক, নৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক কৃষ্টি-সভ্যতা, বিশ্বাস-প্রত্যয়, জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা পূরণের সামষ্টিক ব্যবস্থা গ্রহণ, শালীন ও বৈধ চিত্তবিনোদনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান, সাপ্তাহিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, অসুস্থতা ও নৈমিত্তিক প্রয়োজন, ছুটি প্রদান ও সকল প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী অর্থনীতির অপরিহার্য অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নারীর উপার্জন ও অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামী সমাজ দর্শনে, ইসলামী শরীয়াহর আওতাধীন, শরীয়াহর সীমালংঘন না করে নারীর অর্থনৈতিক রুজী-রোজগারের অধিকার ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নারীর মহরানা, বাসস্থান, অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা পূরণ শিশু-কিশোর জীবনে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে সন্তান-সন্ততির উপর ফরয। নারী স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হওয়া ইসলামী অর্থনীতির অপর এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া শরীয়াতের সীমালংঘন না করে রুজী-রোজগারের বৈধ অধিকারের স্বীকৃতি ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে : 'পুরুষের যেমনি তাদের উপার্জিত সম্পদে অধিকার রয়েছে তেমনি অধিকার রয়েছে নারীদেরও।'

বস্তুত ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ভারসাম্যমূলক অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি ও বিধি-বিধান প্রদান একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সকল বৈশিষ্ট্যই ইসলামী অর্থনীতিতে বিদ্যমান রয়েছে।

সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ

সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের হাতে কুক্ষিগত না থেকে এর আবর্তন ও বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকারী ব্যবসায়-বাণিজ্য, দান, সদকা, যাকাত, উশর এমনকি হজ্বের মতো মৌলিক ইবাদাতের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদে আবর্তন এক হতে হবে অন্যহাতে যাওয়া ও সমাজের ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পদ ও সম্পত্তির বণ্টনের মাধ্যমে এক উত্তম বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টনপদ্ধতি ইসলামী অর্থনীতির এক উত্তম বৈশিষ্ট্য।

মৌলিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ

প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কতকগুলো সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সে মূল্যবোধগুলোকে সরিয়ে নেওয়া হলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। উক্ত মূল্যবোধসমূহ অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ না হলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ এবং সুষ্ঠু গঠনের জন্যে সেগুলো একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় শক্তিও মূল্যবোধকে রক্ষা করে। কমিউনিজম অর্থনীতি হিসেবে রাশিয়ায় যতই সার্থক হোক না কেন, ব্রিটেন বা আমেরিকার গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক কাঠামোতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং অবাস্তব প্রমাণিত হবে। তেমনি ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়ণও রাশিয়ার একনায়কত্ববাদী সমাজ কাঠামোতে সম্ভব নয়।

মুনাফাখোরী মানসিকতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রাণবায়ুস্বরূপ। কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থায় মুনাফার কোন স্থান নেই। একমাত্র এ কারনেই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাশিয়ায় ব্যর্থ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ

যে সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে চৌর্যবৃত্তি গণ্য করা হয়, সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার অন্তর্নিহিত সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও সফলতা অর্জন করতে পারবে না। তাই বলে ব্যক্তিগত মালিকানাকে দুর্বল এবং অসম্ভব ধারণা করলেও ভুল হবে। ইসলামের নৈতিক বিধানই মূল্যবোধের ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় সামাজিক ব্যবস্থাও সমস্ত মূল্যবোধকে দিয়ে থাকে স্থায়িত্ব এবং কৃতকার্যতা। তেমনি ইসলামী অর্থনীতির সফলতাও বিশেষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান এবং অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল।

ইসলামী রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতির ব্যাপক প্রয়োগ ব্যতীত বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা বিধি-নিদের্শ প্রয়োগ করতে গেলে ইসলামী অর্থনীতির কোন কোন দিককে অবাস্তব ও অসংগত বলেই মনে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সুদ এবং উত্তরাধিকার আইনের কথা উল্লেখ করতে পারি। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সুদের কোন প্রয়োজনই থাকবে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমিতদের উত্তরাধিকারহীনতাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অমানবীয় এবং অবাস্তব ইত্যাদি আখ্যা দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তা মোটেই অসংঘত বা অন্যায় মনে হবে না। বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছিলেন :

> যদি কেমং ধন-সম্পত্তি রেখে ইন্তিকাল করেন, তবে তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যদি কেউ এতিম এবং বিধবা রেখে যান, তবে তার দায়িত্ব আমার।

এ ঘোষণায় দেখা যায়, এতিমদের দায়িত্ব নেবে সরকার। রাষ্ট্রীয় খরচে এতিমরা পাবে লেখাপড়ার সুযোগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠা।

মহানবীর মানবীয় অনুভূতি ছিল অত্যন্ত গভীর। সেজন্য মনে হয়, পিতৃ-মাতৃহীনদেরকে অন্যান্যের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বল্প বিত্তবান পিতাকে হারিয়ে এতিম পায় রাষ্ট্রের আশ্রয়। ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করে বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামের দু-একটি ধারাকে অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োগ করতে গেলে কেবল অসংলগ্ন ধারণারই সৃষ্টি হয়।

নীতিশাস্ত্র প্রভাবিত অর্থনীতি

বর্তমান যুগের অর্থনীতি অনেকটা নীতিশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত, যদিও রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদরা এতে খুবই অস্বস্তি বোধ করেন। নীতিশাস্ত্র প্রভাবিত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা নয়; বরং আধুনিক যুগের প্রগতিশীলতারই প্রতীক।

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এখন সমষ্টি চিন্তা অর্থনীতির স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এ নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবেই অপরিহার্য।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া হবে, কিন্তু তাতে পাশ্চাত্যের উগ্র ব্যক্তিবাদ এবং অবাধ-নীতিকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। এ্যাডাম স্মিথের মতে, 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমটি ব্যক্তিগত এবং জাতীয় আয় আর খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য বিধান। দ্বিতীয়টি জাতীয় কল্যাণের জন্য দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সম্পদ সৃষ্টি করা।'[২৫] এ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তিনি ব্যক্তিবাদে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে আদর্শ মনে করে বলেছেন : 'মানুষের সব কাজের মূল প্রেরণা হচ্ছে স্বীয় স্বার্থবোধ। এই স্বার্থবোধ অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং স্বাভাবিক।'

অদৃশ্য হস্ত

প্রত্যেকেই স্বীয় স্বার্থানুসারে কাজ করে যাবে, তাতেই জাতীয় স্বার্থ সমধিক সিদ্ধ হবে। এ্যাডাম স্মিথ বলেন :

> ব্যক্তি যদি কেবল স্বীয় স্বার্থের দিকেই তাকায়, তবুও প্রকৃতির অদৃশ্য হস্ত এমন একটি উদ্দেশ্য পূরণ করে, যাতে ব্যক্তির আদৌ কোনো ইচ্ছা থাকে না। প্রকৃতির বিধান এমনভাবে কাজ করে যায়, যাতে পরিণামে সামাজিক স্বার্থও রক্ষিত হয়। ব্যক্তির প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ না করার প্রধান যুক্তি ছিলঃ অর্থনৈতিক জীবন এতই জটিল যে, তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে কোন মানুষের জ্ঞান এবং বুদ্ধিই পর্যাপ্ত নয়।[২৬]

এ বিষয়ে আমরা দেখি অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে হতাশাই তাকে তার এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে বাধ্য করেছে। ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষে যার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, তা প্রকৃতির বিধানের নিকট সমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর কি থাকতে পারে?

---

২৫. Adam Smith : An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nation, P. 12.

২৬. Adam Smith : Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

অবাধ ব্যক্তিস্বার্থ

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ব্যক্তি-প্রচেষ্টাকে মুক্ত রেখে ব্যক্তিস্বার্থে অনুসরণের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের মূল্যমান নির্ণয় স্বার্থকেন্দ্রিক ও আদর্শবিহীন চিন্তাধারা সমর্থন করতে পারে; কিন্তু ইসলাম তা করে না। এখানে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির আরেকটি মৌলিক পার্থক্য দেখা দেয়। মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে ইসলামের ধারণাই তার অর্থনৈতিক জীবনের মূল্যমান নিয়ন্ত্রণ করবে। আল্লাহই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে রব্বানিয়ত এবং নফসানিয়ত— দুটো প্রবণতা দিয়েছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের অভাবে নফসানিয়তের শক্তিই প্রবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং ব্যক্তিকে ব্যক্তিস্বার্থ অনুসরণের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হলে সামাজিক স্বার্থ সর্বাধিক পূরণ হতে পারে না।

অধ্যাপক পিগু দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিবর্তন সামগ্রিক কল্যাণকে এমন কি ব্যক্তিজীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবেই প্রভাবিত করতে পারে।[২৭] তিনি বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, Marginal Private Net Product এবং Social Net Product-এর মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকে। Private Cost কম হলেও Social Cost নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই বেশি হতে পারে।[২৮] অধ্যাপক পিগুর সাক্ষাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ্যাডাম স্মিথের স্বতঃসিদ্ধ ধারণাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না।

অধ্যাপক পিগু পর্যন্ত না এসে থমাস ম্যালথাস-এর বিখ্যাত Essay-তেও আমরা দেখতে পাই, Laissez Fair Policy অর্থনৈতিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য না এনে দুঃখ মহামারী ইত্যাদিও নিয়ে আসতে পারে। শুধু সামাজিক অর্থনৈতিক নিয়ম কেন— প্রাকৃতিক রাজ্যের অবাধ স্বাধীনতা শৃঙ্খলা না এনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করতে পারে। অধ্যাপক পিগুর পরবর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, Physical Order এবং Economic Order এক রূপ নয়।

এটা এখন পরীক্ষিত সত্য যে, ব্যক্তিস্বার্থ সর্বাধিক সিদ্ধ হলেই সামাজিক স্বার্থ সর্বাধিক সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এ্যাডাম স্মিথ যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অর্থনীতিতে অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা সমর্থন করেছিলেন সে বিশ্বাসেই আজ ফাটল আবিস্কৃত হয়েছে এবং তা আর নির্ভরযোগ্য নয়। ইসলামী অর্থনীতিতে পারদর্শী ব্যক্তিসমষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং মূল্যমান নির্দেশও হবে, যদিও এই মূল্যমান মৌলিক মূল্যমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হতে বাধ্য।

ক্রেতার সার্বভৌমত্ব

ক্রেতার সার্বভৌমত্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ক্রেতার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না। আল্লাহ এবং আল-কুরআনের নীতির সার্বভৌমত্ব ইসলামের আদর্শ। এটা স্বীকার করে নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধের আওতার মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করবে। আল্লাহর নীতির সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি যখন লংঘন করবে, তখনই ব্যক্তির ভোগাধিকারে রাষ্ট্র বা সমাজ হস্তক্ষেপ করবে। আপন ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার ত্যাগ করে ব্যক্তি পায় আল্লাহর নির্ধারিত নীতির আওতায় ভোগের অধিকার ও নিরাপত্তা। এই সীমারেখা ক্রেতা এবং উৎপাদন হিসাবে ব্যক্তির

---

২৭. A.C. Pigou : Economics of Welfare, P. 12, 18.

২৮. 15. A.C. Pigou : Economics of Welfare, Part II, Ch. II. P. 27.

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারকে সংকুচিত করে। এভাবে ক্রেতা এবং উৎপাদকের সার্বভৌমত্বের বিলুপ্তি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে এ ব্যবস্থার এক মৌলিক ব্যবধান সৃষ্টি করে।

সুসামঞ্জস্য ভোগনীতি

ইসলামের সুসামঞ্জস্য ভোগনীতি উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে সামাজিক এবং জাতীয় স্বার্থের মুখাপেক্ষী করে তুলবে। বর্তমানে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা যেরূপ বিত্তবানদের স্বার্থানুকূল, তেমনটি হবে না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই সমাজ উৎপাদন এবং ভোগব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, যাতে ব্যক্তির ভোগের অধিকার সমাজের অপর সকলের ভোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

মালিকানা

ইসলাম সম্পত্তির ব্যক্তিগত বা জাতিগত মালিকানা স্বীকার করে না। আল-কুরআনের আয়াত থেকে আল্লাহর মালিকানা সুষ্ঠুভাবে ঘোষিত হয়।[২৯] কোন বিতর্ক না তুলে বলা যায় আল্লাহর মালিকানার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। সম্পদের মালিক আল্লাহ; কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদ শুধু তার নিজের ভোগের জন্য নয়, বিশ্বের সমুদয় সম্পদ সমস্ত জীবের জন্য। আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদে সকল প্রাণীর অধিকার আছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু মানুষ নয়, প্রতিটি প্রাণীর সংগত দাবি স্বীকৃত। তবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষের থাকবে অগ্রাধিকার। অধিকন্তু, অন্য সকল জীব সৃষ্টি করা হয়েছে মানবেরই কল্যাণের জন্য।

ইসলামী অর্থনীতিতে জাতীয় মালিকানারও স্থান নেই। এ বিষয়ে ইসলামের সঙ্গে সমাজবাদ বা কমিউনিজমের পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়। সমাজতন্ত্রে মালিকানা ব্যক্তি হতে নিয়ে সমাজ বা জাতিতে অর্পণ করা হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা যেমনি গর্হিত বিবেচিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে জাতীয় মালিকানা। ব্যক্তিগত মালিকানার অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে ওঠে ব্যক্তিজীবন। অনুরূপভাবে জাতীয় মালিকানায়ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে বিশেষ বিশেষ জাতি বা সমাজের জন্ম বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চল— উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি বিপুল সম্পদের অধিকারী। সমাজতন্ত্র অনুসারে এসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের একমাত্র অধিকার যথাক্রমে আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান এবং রাশিয়ানদের। দারিদ্র্য-পীড়িত, অর্ধভুক্ত এশীয়দের আইনত কোন অধিকারই থাকতে পারে না এসব অঞ্চলের সম্পদে। এ সম্পদের ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের চরম অধিকার রয়েছে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের।

সম্পদের জাতীয়করণ

ইসলাম এ ধরনের জাতীয় মালিকানাকেও স্বীকার করে না, যেহেতু সমগ্র বিশ্বের সম্পদে সকল মানব গোষ্ঠীর নীতিগত হক রয়েছে। তবে ভৌগোলিক এবং জাতীয় শৃঙ্খলার জন্য জাতিসমূহ পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সম্পদ ব্যবহারের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিতে জাভাবাসীদের নীতিগত হক আছে মালয়ের রাবারে, দক্ষিণ আফ্রিকার হীরকে, বাংলাদেশের পাটে বা আমেরিকার স্বর্ণে। বাংলাদেশের কোন অধিকার নেই অন্য দেশকে তার প্রয়োজনীয় পাট থেকে বঞ্চিত করার।

---

২৯. সূরা ইবরাহীম : ২, আরাফ : ১২৮, বাকারা : ২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ জাতীয়করণ হলে উপকৃত হবে সে দেশের নাগরিকবৃন্দ; তিব্বতের শীতক্লিষ্ট নাগরিক... অস্ট্রেলিয়ার চারণ-ভূমিতে প্রতিপালিত মেষ-পশমের উপর সঙ্গত অধিকার আছে আইসল্যান্ডের অধিবাসীদের। ইসলামী অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদে অপেক্ষাকৃত অধিকতর অনুগৃহীত কোন জাতির সম্পদের কোন অপব্যবহার, অপচয় বা বিলাসিতার অধিকার নেই, যদি অন্য জাতি সে সম্পদের অভাবে অসুবিধার মধ্যে থাকে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই সম্পত্তি জাতীয়করণের পরিবর্তে মানবীয়করণই ইসলামী অর্থনীতির আদর্শ। মানবসমাজ শ্রম এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদের ভোগ-দখল করবে। সম্পদ ব্যবহারের প্রশ্নে সকল জাতির প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে।

সুষ্ঠু, সঙ্গত ও সর্বাধিক ব্যবহার

ইসলামী অর্থনীতিতে বিশ্বের সম্পদ ব্যবহার করে মানুষ অর্থনৈতিক প্রগতির যে কোন স্তরে উঠতে পারে। আল্লাহ্ আল-কুরআনের কয়েক স্থানে ঘোষণা করেছেন, 'বিশ্বের যা কিছু সম্পদ, ঐশ্বর্য— সবই আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জীবের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন; সকল প্রাণীই সমভাবে হিস্সা পাবে এবং ভোগ করবে।'[৩০] বিশ্বের সম্পদ অব্যবহৃত থাকার জন্য বা অপচয় হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়নি। প্রতিটি বস্তুকেই আল্লাহ্ প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন। সম্পদের সুষ্ঠু এবং সঙ্গত ব্যবহার ইসলামী অর্থনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সম্পদের সঙ্গত ব্যবহার করে মানুষ আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তাঁর প্রশংসা করবে, আল্লাহ্ তাই চান।

দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তির মূলোৎপাটন

আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন : 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়।'[৩১] কুফরের দিকে অগ্রসর হলে সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। যদি কোন সমাজের বিপুল সংখ্যক লোক দারিদ্র্যের পঙ্কিলতার মাঝে ডুবে থাকে, তবে সে সমাজও সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য দূর করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্মীয় কর্তব্য। দারিদ্র্য দূর করে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এগিয়ে আসবে এবং কুফর থেকে দূরে সরে থাকবে। ব্যক্তিকে কুফর থেকে সত্য পথে আনা এবং রাখা সমাজের কর্তব্য। সর্বনিম্ন কি পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তিকে কুফর হতে সরিয়ে রাখে আল-কুরআন তারও নির্দেশ দিয়েছে।[৩২]

তাই সমাজের দুঃস্থ, দরিদ্র, পঙ্গু, অসহায়, বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তির বিলুপ্তি সাধন, ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুস্থ দেহের অধিকারীর জন্য ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ ও সমাজের বিত্তহীন বেকার, দরিদ্র, পুঙ্গ অসহায়দের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ফরয করা হয়েছে।

---

৩০. সূরা আল বাকারা : ১৯, সূরা হূদ : ৬।

৩১. তিরমিযী, আবদুল কাদের জিলানী, ফতুহুল গায়েব।

৩২. সূরা ত্বাহা : ১১৮-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক অধিকার

ইসলামী অর্থনীতিতে জীবনযাত্রার সরল-সহজ মান এরূপ হবে যে, কোন আদমসন্তান ক্ষুধার্ত থাকবে না, সবাই শীত-তাপ নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র পাবে, সবাই তৃষ্ণার প্রয়োজনীয় পানীয় পাবে, আর কেউই আশ্রয়ের অভাবে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের শিকারে পরিণত হবে না।

যে পরিবেশে ব্যক্তি এই প্রকারের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে, সেখানে রাষ্ট্রই এগিয়ে আসবে তার মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। বস্তুত ইসলামী অর্থনীতিতে শেষ দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রেরই উপর। অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য রাষ্ট্রকে ব্যাপক ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে।

প্রতিটি নাগরিককে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং কর্মের সুযোগ প্রদানের চূড়ান্ত দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সমাজে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহ আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন : 'পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার ব্যবস্থা তিনি করেননি।'[৩৩] প্রত্যেক প্রাণীরই জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন।

যারা আল্লাহর পথ অনুসরণ করে তাদের জন্য আল্লাহ পাক এ দুনিয়ার সচ্ছলতার সংবাদ দিয়েছেন।[৩৪] যাদের প্রতি আল্লাহ বিমুখ, তাদেরকে অনটনের ভয় দেখিয়েছেন। আল্লাহ সন্তান-সন্ততিগণকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন; কেননা জীবিকা দানের দায়িত্ব আল্লাহ পাকের হাতে ন্যস্ত।[৩৫] কিন্তু আমাদের সমাজে যেভাবে দারিদ্র্য বিরাজ করছে, তাতে না খেতে পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যুবরণ করছে; অভাবের তাড়নায় মানুষ আত্মহত্যা করছে। তাদের প্রতি আল্লাহর দায়িত্ব কি? আল্লাহ তো প্রবোধ দেওয়ার জন্য মিথ্যা ওয়াদা করতে পারেন না।

রাষ্ট্রীয় প্রতিপালনবাদ

ইসলামী সমাজে আল্লাহর ওয়াদা পূরণের দায়িত্ব নেবে প্রগতিশীল, জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি; আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে চরম দায়িত্ব থাকলে রাষ্ট্রের উপর। ..... যখন বলা হয়, 'তোমরা অভুক্তদের খাদ্য দানে ব্যয় কর তখন তারা বলে, আমরা কি তাদেরকে আহার প্রদান করব, যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আহার দিতে পারেন?' এ ভাবধারার অনুগামীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তোমরা অবশ্যই ভ্রান্তির মধ্যে আছ।'

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন যে, যারা মনে করে— আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রত্যক্ষ সাহায্য করতে পারেন তারা ভুল করে। অলৌকিকভাবে সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমাজকেই দারিদ্র্যের অভাব মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নবী করীম (সা.) বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার পর ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি কেউ সম্পত্তি রেখে মারা যায়, তবে তা তাদের উত্তরাধিকারীর; আর যদি কেউ সহায়হীন এতিম এবং বিধবা রেখে মারা যায়, তবে তাদের ভার আমার উপর ন্যস্ত।' এই ঘোষণার পর অভাবগ্রস্তদের সম্বন্ধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না।

---

৩৩. সূরা হূদ : ৬।

৩৪. সূরা আল লাইল : ৫-১০।

৩৫. সূরা আনআম : ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিগুলো প্রধানত, আল-কুরআন ও সুন্নাহ এবং দ্বিতীয়ত, আল-কুরআন ও সুন্নাহ এবং তৃতীয়ত, ইজমা ও ক্বিয়াস হতে উৎসারিত। ইসলামী অর্থনীতির জগৎ নির্মাণের জন্যে এই মূলনীতিগুলি খুবই তাৎপর্যবহ। এখানে এগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ের নীতি

ইসলামী প্রেক্ষিতে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অর্থনৈতিক নীতি যা সুস্পষ্টভাবে আধুনিক বা সনাতন অর্থনীতির নীতিমালার সাথে পার্থক্য নির্দেশ করে। আল-কুরআনে বিধৃত তাওহীদের মতবাদ হতে এই নীতি উদ্ভূত। তাওহীদের মর্মবাণী হলো আল্লাহ এক এবং মানুষকে তাঁর কাছেই জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং, অন্য কোন কিছুই ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। কারণ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রূপই তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সমাজের প্রাত্যহিক জৈবিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। মানবীয় আচরণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রসঙ্গসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের এই প্রয়োজনীয়তাকে সনাতন অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করেন। কিন্তু এর ফলে উদ্ভূত জটিলতাকে এড়াবার জন্যেই তারা 'অন্য সব কিছু একই রকম থাকলে' ধরনের সরল কথা ব্যবহার করে আসছেন। উদাহরণস্বরূপ, অন্যান্য সবকিছু একই রকম থাকলে চাহিদা নির্ভর করে আয় ও দামের উপর। এক্ষেত্রে অন্যান্য চলক যেমন রুচি, পছন্দ, গুণাগুণ ইত্যাদি স্থির ধরে নেওয়া হয় যা বাস্তবে আদৌ হয় না। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে বস্তুগত উন্নতি এবং আত্মিক অনুধ্যানকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয় না।

সহযোগিতার নীতি

ইসলামী অর্থনীতিতে লাগামহীন প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতাকে অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

> 'তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।'[৩৬] আরও বলা হয়েছে, 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর।'[৩৭]

আল-কুরআনের এই নির্দেশসমূহের অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের জন্যে সহযোগিতামূলক শক্তির কৌশল কাজে লাগাবার উপর জোর দিতে হবে। শরীয়াহর সীমার মধ্যে সমাজের বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ সামাজিক কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানই হলো সঠিক উপায়।

দরিদ্র ও দুঃস্থদের সাহায্যের নীতি

এই নীতিটিও সরাসরি আল-কুরআন হতে উৎসারিত হয়েছে যেখানে, বলা হয়েছে :

> এবং তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। [৩৮]

---

৩৬. সূরা আন-নিসা : ২৯।

৩৭. সূরা আল-মায়দা : ৩।

৩৮. সূরা আয-যারিয়াত : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এই নীতির মূল তাৎপর্য হলো ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে এমন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে, যার মাধ্যমে যাদের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ যাদের যৎসামান্য রয়েছে বা কিছুই নেই তাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাকাত, উশর ও সাদাকাহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নিজে উপার্জনের নীতি

উপরের দরিদ্র ও দুঃস্থদের সাহায্যের নীতির অর্থ এই নয় যে, ইসলামী অর্থনীতিতে লোককে অলস থাকতে বা ভিক্ষা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বাস্তব চিত্র বরং ভিন্ন। আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে সকল মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে প্রতিদিন ফজরের নামায আদায়ের পরে যমীনে ছড়িয়ে পড়তে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করতে।[৩৯] হাদীসে বলা হয়েছে :

> কোন মানুষের নিজের চেষ্টায় উপার্জিত আয়ের চেয়ে আর কোন উপার্জনই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।[৪০]

ইসলামে কাজকে পুণ্য ও অলসতাকে পাপ গণ্য করা হয়েছে। আল-কুরআনে রাসূলে করীমকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

> আর তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ।[৪১]

ইসলামে কাজকে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত বলা হয়েছে। কায়িক শ্রম ইসলামে সম্মানিত স্থান লাভ করেছে। রাসূলে করীম (সা.) জনৈক শ্রমিকের হাতে চুমু খেয়েছেন বলেও উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু ইসলামে সন্ন্যাসবাদ ও ব্রহ্মচর্যকেও নিন্দা করা হয়েছে। যারা জীবিকা অর্জনের জন্যে কোন কাজ না করে সব সময়ে শুধু ইবাদাতে মশগুল থাকে তাদেরকে যারা খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দেয় তারা প্রথমোক্তদের চেয়ে উত্তম বলে রাসূল স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো জনগণকে কাজের সুযোগ করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে ব্যক্তির দায়িত্ব হলো কাজের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

কৃষিকাজের মাধ্যমে উপার্জনের নীতি

আল-কুরআনে আল্লাহ মানুষকে দেওয়া তাঁর অকৃপণ অনুগ্রহ ও উপকরণসমূহ উল্লেখ প্রসঙ্গে কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে তার উদাহরণ পাওয়া যাবে। তিনি বলেন :

> তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের প্রতি লক্ষ্য কর– যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে।[৪২]

---

৩৯. সূরা আল-জুময়া : ১০।

৪০. সূরা ইবনে মাজাহ।

৪১. সূরা আত-তাওবাহ : ১০৫।

৪২. সূরা আল-আনআম : ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেছেন :

> আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্যে তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যে, যাদের অন্নদাতা তোমরা নও।[৪৩]

সুতরাং দেখাই যাচ্ছে কৃষিকাজের জন্যে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণী রয়েছে। একে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহেই সহজ করে দিয়েছেন। কেউ কৃষিকাজে নিয়োজিত হলে সে আরও অতিরিক্ত ফায়দা হাসিল করতে পারে। এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে বলা হয়েছে :

> কোন মুসলিম কোন গাছ লাগালে বা ফসল চাষ করলে তা থেকে কোন মানুষ বা পশু-পাখী খেলে তা ঐ ব্যক্তির জন্যে সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।[৪৪]

শিল্প ও পেশার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের নীতি

ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে শুধু কৃষির মাধ্যমেই জীবিকা অর্জনের চেষ্টা কাম্য নয়। রাসূলে করীম (সা.) মুসলমানদের তাদের কার্যক্রম পশুপালন ও কৃষিকাজের মধ্যেই সীমিত রাখার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন, কেননা তাহলে তারা অপমান ও পরাজয়ের সম্মুখীন হবে, এমনকি ধর্মীয় স্বাধীনতা পর্যন্ত খুইয়ে বসতে পারে। এক হাদীসে বলা হয়েছে :

> যদি তোমরা ভিন্ন নামে সুদের ব্যবসা কর, গরুর লেজ ধরে সময় কাটাও অথবা কৃষিকাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাক এবং জিহাদ থেকে বিরত থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের অসম্মানিত করবেন, যতক্ষণ না তোমরা পুনরায় দ্বীনের প্রতি ফিরে আস।[৪৫]

ইউসুফ কারাযাবীর কথায় :

> কৃষিকাজ ছাড়াও মুসলমানদের অবশ্যই এমন সব শিল্প, পেশা এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে যা সমাজের জন্যে অপরিহার্য; একটা স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্যে সহায়ক এবং একটা দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে অনুকূল। ইসলামী শরীয়াহতে শুধু অপরিহার্য শিল্প ও পেশাকে গ্রহণের অনুমোদনই দেওয়া হয়নি, বরং ইসলামের মহান ইমাম ও ফকীহগণ তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্যে বাধ্যতামূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধরনের বাধ্যবাধ্যকতাকে পর্যাপ্ততার বাধ্যবাধ্যকতা (ফরযে কিফায়া) বলা হয়।

যদিও উপরের নীতি দুটি প্রকৃতিতে পরস্পর বিরোধী তবু এ ব্যাপারে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। বরং এ দুয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, যেক্ষেত্রে খাদ্য অপ্রতুল সেক্ষেত্রে কৃষিই সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে এবং যেক্ষেত্রে শিল্পজাত সামগ্রীর অভাব বেশী সেক্ষেত্রে শিল্পায়নের উপরই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। উপরন্তু যেসব ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী বা শস্য স্থানিক সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিই পাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সুতরাং কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য কোনটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর।

---

৪৩. সূরা আল হিজর : ২০।

৪৪. বুখারী ও মুসলিম।

৪৫. আবু দাউদ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বনির্ভরশীলতার নীতি

এই নীতি প্রকৃতপক্ষে উপরের নীতিকেই জোরদার করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

> আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[৪৬]

এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাউকে ততক্ষণ সাহায্য করার কোন উদ্যোগ নেওয়া উচিত হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য কঠোর শ্রম দিতে এগিয়ে না আসবে। অন্য কথায়, ইসলাম এমন এক সমাজের কল্পনা করে, যেখানে কেউ কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। প্রতিটি মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এভাবে ইসলামী অর্থনীতি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক লোক স্বাভাবিকভাবে তাদের জীবন যাপনের জন্যে উপার্জন করে থাকে। অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনীতিতে দৈনিক মজুরীর বা ভাড়ায় শ্রম বিক্রীকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীত মুদারাবার মতো স্বনিয়োজিত কর্মোদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

সুবিচারপূর্ণ বণ্টনের নীতি

'যেন ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়।'[৪৭] এই আয়াতের মর্ম অনুসারে ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের কল্যাণের জন্যে তাদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক তহবিল বা অর্থের বরাদ্দ থাকতে হবে। এই নীতি বাস্তবায়নের ফলে ইসলামী সমাজে প্রবৃদ্ধি ও সমতার দ্বৈত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভবপর হবে।

সরকারের ভূমিকার নীতি

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা খুবই সীমিত হয়ে আসছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে সরকার বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে এমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা রাখার প্রয়োজন রয়েছে, যেক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই কিছু করতে অপারগ অথবা ব্যক্তিস্বার্থ সমষ্টি স্বার্থের বিরোধী। সরকারকে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেসবের মধ্যে রয়েছে :

১. সেসব কাজ সম্পন্ন করা যা একক ব্যক্তি উদ্যোগে করা সম্ভব নয় (যেমন– রাস্তাঘাট ও সেতু তৈরী, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা ইত্যাদি)।

২. ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের (যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আশ্রয়) নিশ্চয়তা বিধান করা যেন দরিদ্র ও অভাবীরা উৎপাদনক্ষম হতে পারে এবং তাদের নিজেদের চেষ্টায় ন্যূনতম জীবন যাপনের মান অর্জনে সক্ষম হয়।

৩. সকল ধরনের অর্থনৈতিক অনাচার ও বৈষম্য দূরীকরণের পাশাপাশি সামাজিক শৃংখলা ও সাম্য অর্জনের জন্যেও সরকারকে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

---

৪৬. সূরা রা'দ : ১১।

৪৭. সূরা হাশর : ৭।

Dhaka University Institutional Repository

সমতার নীতি

বর্ণ-লিঙ্গ-গোত্র-এলাকা নির্বিশেষে ইসলাম মানুষের সাম্যে বিশ্বাসী। বস্তুত আল-কুরআন নাজিল হয়েছিল মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনার জন্যে।[৪৮] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একজোড়া মানব-মানবী হতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে নানা গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছেন যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে।[৪৯] আল্লাহ আরও বলেছেন :

> পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[৫০]

সুতরাং, ইসলামী অর্থনীতিতে কোন প্রকার ভেদাভেদ না করে পুরুষ ও মহিলা সকলকেই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গবেষণা ও উন্নয়নের নীতি

ইসলামী দুনিয়ায় ইজতিহাদের দরজা কখনও বন্ধ হয়নি; বরং এটি ইসলামী সমাজব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থনীতির বিধি-বিধান রচনা ও ব্যবহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

> এবং আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে এবং যা আছে ভূমণ্ডলে তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।[৫১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ The Meaning of the Glorious Quran-এ বলেন, আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহে মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তিকে পদানত করার এবং যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে গভীর রহস্য ভেদের ক্ষমতা দিয়েছেন। এই অনুগ্রহই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের জোর তাগিদ দেয়। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, শিল্প ও বিজ্ঞানের কোন অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে যদি যথাযথ দক্ষ ও যোগ্য লোকের ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে গোটা মুসলিম উম্মাহই এজন্যে নিন্দনীয় হবে; বিশেষ করে এই দায়ভার আরো বেশী তাদের, যারা সমাজের নেতৃত্বে আসীন রয়েছে। ইমাম গাজ্জালী বলেন :

> এই দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে বিজ্ঞানের যেসব ক্ষেত্রে রজ্ঞান অপরিহার্য তাকে ফরযে কিফায়া গণ্য করতে হবে, যেমন–ঔষধ, গণিত, কৃষি, বস্ত্রবয়ন, রাজনীতি এবং এমনকি দর্জির কাজ। উদাহরণস্বরূপ কোন শহরে যদি শিঙ্গা লাগবার লোক না পাওয়া যায় তাহলে সে শহর ধংসের সম্মুখীন হয়ে পরিণামে নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার নীতি

ইসলামী অর্থনীতির সর্বশেষ মূলনীতিটি হলো ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার নীতি। এর মোদ্দা কথা হলো, ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত। তাই সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করা যাবে না। ইরশাদ হয়েছে :

---

৪৮. সূরা ইবরাহীম : ১।

৪৯. সূরা আল-হুজুরাত : ১৩।

৫০. সূরা আন-নিসা : ৩১।

৫১. সূরা আল-জাসিয়াহ : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

> নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না যে, আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[৫২]

এই নীতি ইসলামী অর্থনীতিবিদদের সংশয়পূর্ণ ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদানে বিরত রাখে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে তার ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক করে কিছুই বলা যাবে না, কেননা তার পরিণাম বা চূড়ান্ত ফল কী হবে কেউ-ই তা সঠিক করে বলার ক্ষমতা রাখে না। এক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতেই হবে। তাই সুদের নির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত হার অবশ্যই ইসলামবিরোধী বলে গণ্য হবে।

ইসলামী অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি

সনাতন অর্থনীতি প্রায় কয়েক শতাব্দী ধরে নানা চিন্তা ও গবেষণার ফলে বিকশিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি স্তর পেরিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইসলামী অর্থনীতিও এখন বিভিন্ন স্তর পার হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই এই অর্থনীতি এতটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছে। তাই ইসলামী অর্থনীতি সাহিত্যে এর প্রকৃতি ও পরিধি বিষয়ে বিস্তৃত ও সঠিক করে বলার সময় এখনও আসে নি। তবু এ প্রসঙ্গে সম্ভাব্য কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো।

ইসলাম অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞান হলেও সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের মতো শাস্ত্র নয়। মান্নান একে বলেছেন, 'সামষ্টিক সামাজিক বিজ্ঞান'। এর অর্থ ইসলামী অর্থনীতির চর্চা উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ফলাফলকে সমন্বিত রূপে দেখতে আগ্রহী। যদিও ইসলামী অর্থনীতি মূলত আল-কুরআন ও হাদীসের প্রেক্ষিতেই বিকাশ লাভ করেছে তবু কোনকমতেই একে এ দুয়ের কোনটিরই অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। নিজের ক্ষমতাবলেই এ আজ এক পৃথক ও বিকাশমান শাস্ত্র। শুরুতে ইসলামী অর্থনীতিকে শুধু আল-কুরআন বা হাদীস হতে প্রাসঙ্গিক আয়াত বা বাণী উদ্ধৃত করার বিষয় হিসেবে দেখা হতো। সত্যিকার অর্থে তা ইসলামী অর্থনীতি ছিল না। এটা আসলে একটা প্রক্রিয়া, যার দ্বারা প্রাপ্ত ভোগ্যপণ্যের প্যাকেজের প্রতি ভোক্তার আচরণ অথবা উৎপাদক হিসাবে ফার্মের আচরণকে অনুশীলন করা হয়।

ইসলামী অর্থনীতি না পুরো ধনাত্মক (positive), না পুরো ঋণাত্মক (normative)। ধনাত্মক বিবরণ ব্যক্ত করে কি আছে বা ছিল বা আছে। পক্ষান্তরে আদর্শবাদী বিষয় বলে কি হওয়া উচিত ছিল। ইসলামী অর্থনীতিতে ধনাত্মক বিবরণ হতে আদর্শবাদী বিবরণকে আলাদা করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। ইসলামী অর্থনীতির যে মৌলিক ভিত্তি সেই আল-কুরআন ও সুন্নাহতে ধনাত্মক ও আদর্শবাদী উভয় ধরনেরই অনুশাসন রয়েছে।[৫৩]

এই অর্থনীতিতে সামষ্টিক মানবকল্যাণ, সহযোগিতার বাস্তবায়ন এবং সীমিত প্রতিযোগিতা বিবেচনায় আনা হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক আচরণে দক্ষতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণস্বরূপ আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অপব্যয়কে যেন অবশ্যই পরিহার করা হয়। 'এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। 'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই'।[৫৪] আধুনিক অর্থনীতির মতো ইসলামী

---

৫২. সূরা লোকমান : ৩৪।

৫৩. Zarka ১৯৮৯ পৃ. ১৪ : ১৮।

৫৪. বনি ইসরাইল : ২৭৬-২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতিও অর্থনৈতিক চলকসমূহের আচরণ পর্যালোচনা করে; কিন্তু তা অধিকতর সমন্বিত ও ব্যাপক আকারে। এর মধ্যে সামাজিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের রঙে রঞ্জিত হওয়াও রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দরিদ্র ও দুঃস্থদের সাথে ধনীদের আয় ও সম্পদের বাধ্যতামূলক অংশীদারীত্বের কথা উল্লেখ্য।

সনাতন অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় প্রকৃতির কৃপণতা বা খাম-খেয়ালিপনার ফলে। এখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে মানুষের অভাব অসীম এবং তা পূরণের জন্যে যে সম্পদ তা সীমিত। অর্থৎ, যোগানের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করা হয় যে মানুষের সকল অভাব পূরণের জন্যে আল্লাহ অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন। এখানে ধরে নেওয়া হয়, অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় একদিকে সমাজ ও ব্যক্তির উদ্যোগে অভাবের কারণে, অন্যদিকে মানুষের লাগামহীন চাহিদার কারণে। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্যে ইসলামী অর্থনীতি সাঁড়াশী আক্রমণ চালাবার সুপারিশ করে। একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ সামগ্রীর ভোগ কমাতে হবে, অর্থাৎ চাহিদা কমাতে হবে। বস্তুত ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষ তার সকল চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে না; বরং প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করে। মদ, মাদকদ্রব্য, জুয়া, অতিভোজন এবং সকল নৈতিকতাবিনাশী উপকরণ ও ব্যাপক গণবিধ্বংসী সমরাস্ত্র উৎপাদন ও মজুত করাকে ইসলামে অপব্যয় হিসাবে গণ্য হয়। অপরদিকে যোগান প্রসঙ্গে ইসলামী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করা হয় যে, যদি আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদকে পরিপূর্ণ, উপযুক্ত ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানুষের প্রয়োজন পূরণ কোন সমস্যা নয়।

ইসলামী অর্থনীতির পরিধি সংজ্ঞা অনুসারেই সনাতন অর্থনীতির চেয়ে বিস্তৃত। শুধুমাত্র ফার্ম ও গৃহস্থালীর মধ্যেই রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক এক বিরাট আকারের সামাজিক ও নৈতিক আচরণ প্রসঙ্গ। সুদ ছাড়াই ভোগ ও বিনিয়োগের জন্যে ঋণ দান, বৃদ্ধ মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ, প্রতিবেশীদের সহায়তা প্রদান এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-লিঙ্গ-বয়স নির্বিশেষে দরিদ্রজনের সেবা ও ইয়াতীমদের দেখা-শুনা ইত্যাদি সবই ইসলামী অর্থনীতির পরিধির আওতাভুক্ত।[৫৫]

সবশেষে এর পরিধি শুধু ইসলামী সমাজের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকবে কি না এই প্রশ্নও তোলা হয়েছে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক সাহিত্যে। এর উত্তর খুব সোজা-সরল। যারকা বলেন :

> আমি দৃঢ়ভাবেই বলব ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু বা পরিধি শুধুমাত্র ইসলামী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা সকল ধরনের লোকদের-হোক তারা ইসলামের অনুসারী অথবা বিরোধী–আচরণকেই অন্তর্ভুক্ত করবে।[৫৬]

এটাই হওয়া উচিশ। কেননা আল-কুরআনের নির্দেশ ও অনুশাসন শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যে। পূর্বেই বলা হয়েছে, আল-কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আহ্বান করে।[৫৭] এজন্যেই ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ ও ব্যবহার হবে বিশ্বজনীন।

---

৫৫. Mannan ১৯৮৪, পৃ. ৫৬।

৫৬. ১৯৯১, পৃ. ৫৬।

৫৭. সূরা ইবরাহীম ১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতি ও সনাতন অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

আলোচ্য অংশে পাঁচটি বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতি ও সনাতন অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য বিচার করা হলো।[৫৮] যথা : ক. সম্পত্তির মালিকানার ধরন, খ. উৎপাদনের ধরন, গ. বণ্টনের ধরন, ঘ. ভোগের ধরন, এবং ঙ. বিনিময়ের ধরন।

ক. সম্পত্তির মালিকানার ধরন

সনাতন অর্থনীতিতে সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। এর অন্তর্নিহিত অনুমিতি হলো সম্পত্তিতে মানুষের মালিকানা নিরংকুশ যার তাৎপর্য হলো সে তা যেভাবে খুশী ব্যবহারের বৈধ অধিকারী, এমনকি তার অপব্যবহারও করতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতিতে সমাজের দরিদ্র ও অভাবী শ্রেণীকে উপেক্ষা করে কেউ কোন কিছু ইচ্ছামতো ভোগের ক্ষমতা রাখে না। এখানে আল্লাহই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সকল কিছুর নিরংকুশ মালিক।[৫৯] মানুষ আল্লাহর খঠীফা হিসেবে সকল সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু এসবের নিরংকুশ মালিকানা আল্লাহর, তাই মানুষ সম্পত্তিকে তার নিজের, পরিবারের, দেশের এবং সার্বিকভাবে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থেই ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু এর অপব্যবহার করার বা শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের কোন অধিকার তার নেই। প্রত্যেককেই তার সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের জন্যে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

খ. উৎপাদনের ধরন

সনাতন অর্থনীতিতে উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তারা করুণার সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিবর্তে নিজের স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা দাম-পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যেকোন সামগ্রী যেকোন পরিমাণ যে কোথাও উৎপাদন করতে পারে। এক্ষেত্রে দক্ষতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে দাম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পছন্দের স্বাধীনতার উপর এই নির্ভারতা সনাতন অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতিতে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ সকল উৎপাদকেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য।

এর বিপরীতে ইসলামী ঋর্থনীতি উৎপাদনে দক্ষতা ও সাম্যের সমন্বয়ের উপর জোর দেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক উপাদানসমূহও বিবেচনা করা হয়। এই অর্থনীতিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ব্যক্তিস্বার্থের গুরুত্বকে কোনক্রমেই ছোট করে দেখা হয়নি; কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে এটিই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়থইসলামী অর্থনীতি তা মানতে রাজী নয়। সাম্প্রতিককালে জাপানের অর্থনীতির সাফল্যের কারণসমূহ পর্যালোচনা করে খুরশীদ আহমভদ বলেন :

> ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণ, সুনাম এবং আপনজনদের মধ্যে রয়েছে এমন অনুভূতি শিল্পে সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৬০]

---

৫৮. দেখুন Mannan ১৯৮৪, ৫ম অধ্যায়।

৫৯. সূরা আল-বাকারাহ : ২৮৪।

৬০. Khurshid Ahmad 1992, P. 24.

Dhaka University Institutional Repository

উপরন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তির স্বার্থ, নৈতিক মূল্যবোধ, আদর্শবোধ এবং বিধি-বিধানের প্রেক্ষিতেই বিচার্য, যা মানুষের ইচ্ছার দ্বারা নয় বরং আল-কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত।

গ. বন্টনের ধরন

সনাতন অর্থনীতিতে দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার কারণে সাম্যের প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত রয়ে গেছে। বিদ্যমান আয় ও সম্পদ বণ্টনকে নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত ধরে নেওয়া হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বন্টনের ধরন সবসময়েই তীর্যক (skewed)। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতির নীতিমালা যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে বণ্টনের ধরন হবে সুবিচারপূর্ণ ও সাম্যভিত্তিক। অবশ্য আয়ের হুবহু সমবন্টন ইসলামে প্রত্যাশিত নয়। বস্তুত বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সুবিচারপূর্ণ আয় বন্টন ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ঘ. ভোগের ধরন

সনাতন অর্থনীতিতে উৎপাদনকারীর মতো ভোক্তার সার্বভৌমত্বও স্বীকৃত। উপযোগ সর্বোচ্চকরণ তাদের লক্ষ্য এবং সমাজের স্বার্থের প্রতি তোয়াক্কা না করেই যেকোন সামগ্রী যেকোন পরিমাণ ভোগ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। কী'নেসের মতে, ভোগ আয়েরই একটি অপেক্ষক। উপরন্তু ইসলামী ভোক্তার পছন্দ নৈতিকতা, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা তাও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

ঙ. বিনিময়ের ধরন

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, বিনিময় হলো নৈর্ব্যক্তিক এবং মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিময় সমন্বয় পদ্ধতিতে একই সাথে সামাজিক, নৈর্ব্যক্তিক ও নিয়ন্ত্রিত।

এভাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ক্রমশ বেড়ে ওঠে। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের আনাচে-কানাচে। ইসলামী ব্যাংকিং সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা মানুষকে উপহার দিয়ে শুধু মুসলিম সমাজেই নয়, সর্বপর্যায়ে অর্জন করেছে এক সুবিশাল সফলতা। আল কুরআনের নির্দেশিত এই অর্থব্যবস্থা শুধু মানুষেরই কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। আল কুরআন ঘোষণা করেছে :

واتكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار-

> তিনি তোমাদেরকে সে সবকিছুই দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছ। তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তবে তা করতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ বড়ই অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দুই
ইসলামী ব্যাংকের বিকাশ

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইতালীয় ভাষায় (Banco) ব্যাংকো শব্দ থেকেই এর উৎপত্তি; ইতালীয় ভাষায় যার অর্থ হল বেঞ্চ বা লম্বা টুল। প্রাচীনকালে ইতালীর লোম্বার্ডিতে বসবাসরত ইয়াহুদী ব্যবসায়ীরা লম্বা টুলে বসে অর্থ লেনদেন, মুদ্রা বিনিময় ও ঋণের ব্যবসা করত। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং কার্যাবলী যেহেতু সেই টুলের ব্যবসারই সংস্কারকৃত রূপ, তাই (Banco) শব্দ থেকেই (Bank) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইতালীয় (Monte) কিংবা জার্মানীয় (Banke) শব্দ থেকে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন ভ্যানিসে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার জনগণের কাছ থেকে এক ধরনের বিশেষ ঋণ গ্রহণ করত এই ঋণকে জার্মানী ভাষায় (Banke) ও ইতালীয় ভাষায় (Monte) বলা হত। এই ঋণ গ্রহণের সরকারি ব্যবস্থাপনাই ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা করেছে বলে তারা মনে করেন। সুতরাং তাদের মতে ব্যাংক শব্দটি (Banke) বা (Monte) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যে শব্দ থেকেই এর উৎপত্তি হোক না কেন বর্তমানে অর্থ লেনদেন, ঋণদান ও মুদ্রা বিনিময়ের কাজে নিরত প্রতিষ্ঠানকেই ব্যাংক বলা হয়।[১]

ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানতকারীদের উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে জমা রাখে এবং তা থেকে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদেরকে অর্থের সংস্থান করে।

ব্যাংক সঞ্চয়/আমানতকারী এবং উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

A bank is a financial intermediary between the savers/depositors of money and the users of money for business, commerce and industry.

অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা হলো :

ব্যাংক নিজের ও অন্যের ঋণের ব্যবসায়ী।

> A bank is a dealer in debt-his own and other people's. –জি. ক্রাউথার।

ব্যাংক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যার প্রধান কাজ হলো জনগণের অব্যবহৃত অর্থ সংগ্রহ করে তা অন্যদেরকে ধার দেয়া।

> A bank is an institution, the principal function of which is to collect the unutilized money of the people and to lend it to others. - আর. পি. কেন্ট।

অর্থ নিরাপদে রাখা এবং ঋণ মঞ্জুর ও হস্তান্তর করার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন ফার্মই ব্যাংক।

---

১. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন,* ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স, ২য় সং, ২০০৩, পৃ. ৪৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

> Banks are variety of firms for the safe keeping of money and for the granting and transfer of credit. - অধ্যাপক কোলব্রন।

আল্লামা তকী উসমানী ব্যাংকের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে :

> ব্যাংক এমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় যা মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পুঁজির সংকটে নিপতিত ব্যক্তিদেরকে কর্জ প্রদান করে থাকে। আজকাল আধুনিক ব্যাংকগুলো ব্যাংকে টাকা আমানতকারীদেরকে স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। পক্ষান্তরে কর্জ গ্রহীতার কাছ থেকে উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করে এবং থাকে। এতে যে মধ্যস্বত্ত্ব লাভ হয় তাই ব্যাংকের মুনাফা বলে গণ্য হয়।

আলোচ্য সংজ্ঞাসমূহ থেকে ব্যাংকের একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, ব্যাংক হলো বিনিয়োগ/অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কম মুনাফায়/সুদে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে থাকে।

ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা সম্ভব না হলেও এ ব্যাপারে সকল জ্ঞানীজনরাই একমত যে, যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্রম বিকাশের মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যেহেতু মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ অর্থের লেনদেনের মুখাপেক্ষী হয়েছে, অতএব অর্থ সংরক্ষণ, মুদ্রাবিনিময়, ঋণ দান ও গ্রহণের সূচনাও তখন থেকেই হয়েছে। তাই ব্যাংকিং কার্যক্রম বলতে যা বুঝায় তা অতি ক্ষুদ্র পরিসরে কোন না কোনভাবে সেকালেও বিদ্যমান ছিল বলা যায়। বিশেষ করে তখনকার মানুষের জীবনযাপনের মান ছিল খুবই অনুন্নত। সাধারণতঃ তারা কাঁচা ঘরে বসবাস করত; যেগুলোর সংরণ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। যে কারণে সাধারণ মানুষ তাদের বঞ্চিত সম্পদ নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করত না। তখন ধর্মীয় নেতারাই সমাজের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত ছিল এবং উপাসনালয়গুলো দস্যু ও লুটরাদের থেকে নিরাপদ ছিল। যার ফলে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় নেতাদের নিকট নিজেদের ধন-সম্পদ আমানত রাখাকে নিরাপদ মনে করত। তাছাড়া সমাজের সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষ, ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী যাদের ঘরবাড়ী অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত ছিল; তাদের মাঝে যাদেরকে লোকেরা বিশ্বস্ত মনে করত তাদের কাছেও ধন-সম্পদ আমানত রাখত। বিশেষ করে সমাজে যারা স্বর্ণালংকারের ব্যবসা করত তাদেরকে স্বর্ণালংকারের নিরাপত্তার জন্য সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথা লোহার সিন্ধুক, মজবুত আলমিরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হত। স্বর্ণকারদের মাঝে যাদেরকে মানুষ বিশ্বস্ত মনে করত, তাদের কাছে টাকা পয়সা আমানত রাখাও অধিক নিরাপদ বলে মনে করা হত। স্বর্ণকারদের কাছে যখন মানুষ ব্যাপকভাবে টাকা পয়সা আমানত রাখতে শুরু করে তখন প্রত্যেকের জমাকৃত টাকার পরিমাণ, মেয়াদ ইত্যাদি মনে রাখার সুবিধার জন্য তারা লিখিত (ক্ষেত্র বিশেষে মোহরাঙ্কিত) রশিদ দিয়ে দিত। ক্রমান্বয়ে তাদের দেয়া এসব রশিদ জনগণের নিকট পরিচিত হয়ে যাওয়ার কারণে এগুলোর বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত হয়ে যায়। ফলে প্রয়োজনে ঐ রশিদের বিনিময়ে সমমানের পণ্য ক্রয় করতে চাইলেও বিক্রেতারা পণ্য বিক্রয় করতে সম্মত হয়ে যেত। কেননা ঐ রশিদের বিনিময়ে মুদ্রা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত ছিল। এভাবে স্বর্ণকারদের রশিদের বিনিময়ে লেনদেন ব্যাপকতা লাভ করে। তাই বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে ঐ রশিদের টাকা স্বর্ণকারদের থেকে উঠিয়ে আনার তেমন প্রয়োজন কেউ মনে করত না। স্বর্ণকাররা যখন দেখল যে, তাদের দেয়া রশিদের টাকা কেউ উঠাতে আসছে না তখন সেই টাকা তারা অন্যদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতে শুরু করে। অনেক সময় টাকা না থাকলে তারা ঋণ প্রার্থীদেরকেও রশিদ দিয়ে দিত। এভাবে স্বর্ণকাররা টাকা পয়সার

Dhaka University Institutional Repository

লেনদেনের মধ্য দিয়ে বিনাপুঁজিতে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে। ফলে অনেক ব্যবসায়ী স্বর্ণের মূল ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে।[২] অর্থ লেনদেনের মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জনের এই প্রবণতা থেকেই আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে এই ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীর উদ্যোগে ৮০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে রোমে সর্বপ্রথম যৌথ ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সুতরাং বলা যায় যে, আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তিতে বিভিন্ন দেশের ধর্মযাজক, মহাজন, ব্যবসায়ী, স্বর্ণকার, সাহুকার, সাররাফ, চেটি, শেঠ ও কাবুলীওয়ালাদের সহায়তা ও অবদান রয়েছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, এদের কার্যাবলী ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত ও সুগঠিত হয়ে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে।[৩]

১১৫০ সালে ভ্যানিসে ৫% সুদের হারে ঋণ দানের প্রচলন শুরু হয়। সরকারি উদ্যোগে ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভ্যানিসে ব্যাংক অব ভ্যানিস গড়ে ওঠে। ১১৭৮ সালে জেনেভায় বণিকদের যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠে ব্যাংক অব সেনজির্জিও। অতঃপর বার্সেলোনায় ১৪০১ সালে গড়ে উঠে ব্যাংক অব বার্সেলোনা। ১৪০৭ সালে ব্যাংক অব জেনোয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮৪ সালে ভ্যানিসে (Bankeo di Rialto) নামে একটি গণব্যাংক স্থাপিত হয়। ১৬০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব আমস্টারডাম। এ ব্যাংক আমানতকারীদেরকে তাদের আমানতের বিনিময়ে এক ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করত; যা দিয়ে ঐ ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো যেত। এটিই পরবর্তীতে চেক-এর রূপ লাভ করে। ১৬৫৬ সালে সুইডেনে রিকস ব্যাংক অব সুইডেন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯০ খৃস্টাব্দে হামবুর্গে একটি বিনিময় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪]

মধ্যযুগে স্বর্ণকার ও মহাজন শ্রেণী ব্যাংক ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থের মালিক বনে যায়। ফলে তারা জনগণকে সুদের ভিত্তিতে ঋণদানকারি রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। এমনকি তখন তারা সরকারকেও অর্থ সংকটের মুকাবেলা করার জন্য ঋণদান করত। তখন সরকারি টাকশালে স্বর্ণকারদের স্বর্ণ ও টাকা জমা হত। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস-এর সাথে ঋণের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিলে লন্ডন টাওয়ারে জমাকৃত স্বর্ণকারদের স্বর্ণ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে আটক করে রাখা হয়। ফলে তারা স্বর্ণের ব্যবসা ত্যাগ করে লাভজনক ব্যাংক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। তাদেরই উদ্যোগে রয়াল চার্টারের আওতায় ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৭ জুলাই ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের সূচক বলে মনে করা হয়। এ ব্যাংক নিকাশ ঘর কার্যক্রমের প্রথম সূচনা হয়।

ভারতবর্ষে মোঘল আমল পর্যন্ত মহাজন শ্রেণীর হাতে প্রাচীন প্রথায় ব্যাংকিং কার্যক্রম চলেছে। এরা তখন শেঠ, চেটি, সাররাফ, মাড়ওয়ারী, কাবুলীওয়ালা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। মোঘল আমলে মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসায় ফতেহ চাঁদ যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার মুদ্রা ব্যবসা সম্প্রসারিত ছিল। এ কারণে সম্রাট ফররুখ সিয়ার তাকে জগৎ শেঠ বা বিশ্ব ব্যাংকার বলে আখ্যায়িত করেন। ইংরেজরা এ দেশে আসার পর 'এজেন্সী হাউস' নামে ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা হয়। এ সময় বেশ কিছু এজেন্সী হাউস গড়ে উঠে। পরে 'ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া'। ১৯৩৪ সালে এক সংশোধনীর মাধ্যমে এটিকে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তানে ১৯৮৪ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশবলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় দেশে বিদ্যমান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণ করে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে এগুলোর বেশ কয়েকটিকে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দিকে এসে সারাবিশ্বে ব্যাংক ব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংকগুলোই নির্ভরযোগ্যতার একামাত্র প্রতীক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৫]

ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংককে সাধারণত : তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সরকারি ব্যাংক

২. বেসরকারি ব্যাংক

৩. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক

যে সকল ব্যাংক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিংবা সরাসরি সরকারের পরিচালনাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে ব্যাংকিং কার্যাবলী আঞ্জাম দেয় সে সকল ব্যাংককে বলা হয় সরকারি ব্যাংক। সরকারি ব্যাংককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২. সাধারণ ব্যাংক

যে ব্যাংক দেশের সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক। আর যে সকল ব্যাংক সরাসরি সরকারের পরিচালনাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী আঞ্জাম দেয় সেগুলোকে বলা হয় সাধারণ সরকারি ব্যাংক। যেমন- জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ইত্যাদি।

যে সকল ব্যাংক বেসরকারি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় বেসরকারি ব্যাংক। যেমন- সিটি ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি।

সরকারি ব্যাংকগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. তফসিলী ব্যাংক

২. অতফসিলী ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকেই তফসিলী ব্যাংক বলা হয়। আর যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নয় সেগুলোকে বলা হয় অতফসিলী ব্যাংক। কোন দেশের সকল ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত থাকা অপরিহার্য নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বেসরকারি ব্যাংককে তার তালিকাভুক্ত করে থাকে। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকে।

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তফসিলী-অফতসিলী নির্বিশেষে সকল বেসরকারি ব্যাংককে মালিকনাভেদে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. এক ব্যক্তির মালিকানাধীন ব্যাংক।

২. অংশীদারী ব্যাংক।

৩. যৌথ মালিকানাধীন (কোম্পানী ধরনের) ব্যাংক।

যে ব্যাংকের একজন মাত্র মালিক থাকে তাকে বলা হয় একক মালিকানাধীন ব্যাংক। আর যে ব্যাংক অংশীদারী কারবারের আইনের অধীনে ব্যাংকিং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে অংশীদারী ব্যাংক বলে। আর যে ব্যাংক কোম্পানী আইনের আওতায় ব্যাংকিং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলে। অংশীদারী ব্যাংকে ২ থেকে ১০ জন পর্যন্ত অংশীদার থাকতে পারে। আর যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংকের অংশীদার অনেক হতে পারে। যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক দু'ধরনো হয়ে থাকে। যথা :

১. সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানা।

২. শুধুমাত্র বেসরকারি যৌথ মালিকানা।

যে সকল ব্যাংক সরকার ও নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোকে বলা হয় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানা ব্যাংক। যেমন- উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ইত্যাদি।

আর যে সকল ব্যাংক কেবলমাত্র নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোকে বলা হয় বেসরকারি যৌথ মালিকানা ব্যাংক। যেমন-সিটি ব্যাংক, আল-আরাফা ব্যাংক ইত্যাদি।

আর যে সকল ব্যাংক সরকার বিশেষ আইনের অধীনে গঠিত অথচ স্বনিয়ন্ত্রিত সেগুলোকে বলা হয় স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। যেমন- কৃষি ব্যাংক শিল্প ব্যাংক ইত্যাদি।

একটি দেশে যতগুলো ব্যাংক গড়ে উঠে তার সবগুলোর পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ধরন এক হয় না এবং সেগুলোর কার্যক্রম ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যও এক রকম হয় না। লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ব্যাংকিং কাজের ধরন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে ব্যাংককে বহু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank).

২. শিল্প ব্যাংক (Industrial Bank).

৩. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক (Smoll Industry Bank).

৪. কৃষি ব্যাংক (Agricultural Bank).

৫. গ্রামীণ ব্যাংক (Village Bank).

৬. সমবায় ব্যাংক (Co- operative Bank).

৭. বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank).

৮. বিনিময় ব্যাংক (Irnagaction Bank).

৯. সঞ্চয়ী ব্যাংক (Saving Bank).

১০. গৃহায়ন ব্যাংক (House Building Financial Bank).

১১. উন্নয়ন ব্যাংক (Development Bank).

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম অঞ্চলের ভিত্তিতে ব্যাংককে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. দেশীয় ব্যাংক।
২. বিদেশী ব্যাংক।
৩. আঞ্চলিক ব্যাংক।
৪. আন্তর্জাতিক ব্যাংক।

যে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের অভ্যন্তরে জনগনকে স্বল্প পরিসরে সেবা দিয়ে থাকে তাকে বলা হয় দেশীয় ব্যাংক আর দেশের অভ্যন্তরে ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত যে ব্যাংক সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানায় গঠিত তাকে বলা হয় বিদেশী ব্যাংক। যথা গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক হাবীব ব্যাংক ইত্যাদি। আর যে ব্যাংক কোন বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে তাকে বলা হয় আঞ্চলিক ব্যাংক। আঞ্চলিক ব্যাংক একটি দেশের একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে। যেমন: রাজশাহী উন্নয়ন ব্যাংক, আবার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে। যেমন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (A.D.B) ইসলামিক ডেভলপন্টে ব্যাংক (I.D.B) ইত্যাদি ।

ব্যাংকের কার্যাবলী

ব্যাংকের কার্যাবলীকে মৌলিকভাবে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. আমানত গ্রহণ বা মূলধন সংগ্রহ।
২. সঞ্চিত মূলধন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ।
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতা।
৪. মুদ্রা বিনিময় ও বিল বাট্টাকরণ।
৫. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টিকরণ।[৬]

আমানত গ্রহণ

মানুষের নিকট সঞ্চিত ব্যাপ্তি নিষ্ক্রিত মূলধনসমূহকে সংগ্রহ করে লাভজনক বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত করে রাখা ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তাই ব্যাংকগুলো মানুষকে ব্যাংকে টাকা জমা রাখার জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করে। ব্যাংকের নিকট জমাকৃত টাকা আমানতকারীরা যাতে প্রয়োজন মাফিক উত্তোলন করতে পারে সেজন্য ব্যাংক টাকা জমা করার বিভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে; যাতে প্রত্যেকে তার প্রয়োজন বুঝে সুবিধাজনক খাতে টাকা জমা রাখতে পারে। সাধারণত ঃ ব্যাংকগুলোতে টাকা জমা করার জন্য চার ধরনের হিসাব খোলা যায়। যথা :

১. চলতি হিসাব (CURRENT A/C).
২. সঞ্চয়ী হিসাব (SAVINGS A/C).

---

৬. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মেয়াদী হিসাব (FIXED DEPOSIT A/C).

৪. বিশেষ নোটিশ হিসাব (SPECIAL NOTICE DEPOSIT A/C).

চলতি হিসাব : যে হিসেবে জমাকৃত টাকা চাহিবা মাত্রই উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করত ঃ একটি ন্যূনতম পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়।

সঞ্চয়ী হিসাব : যে হিসাবের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বা স্থির আয়ের মানুষ অল্প অল্প করে পুঁজি সঞ্চয় ও তৎসঙ্গে মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করত ঃ একটি ন্যূনতম পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়।

মেয়াদী হিসাব : নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার নিমিত্তে যে হিসাব খোলা হয় তাকে মেয়াদী হিসাব বলে। ৩ মাস, ১২ মাস, ২৬ মাস বা তার চেয়ে অধিক যে কোন মেয়াদের জন্য এই হিসাব খোলা যায়। ব্যাংকের নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতঃ নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রদেয় টাকা নগদ জমা দিয়ে এ হিসাব খুলতে হয়। জমাকৃত টাকার বিপরীতে ব্যাংক আমানতকারীকে স্থায়ী হিসাবের একটি রসিদ সরবরাহ করে।

বিশেষ নোটিশ হিসাব (S.T.D) : এই হিসেবে ৭ থেকে ৮৯ দিনের মাঝে যে কোন মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা যায়। এ হিসেবে সুদ বা লাভের হার খুবই কম। টাকা উঠানোর জন্য কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়।

পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব (D.P.S) : এ হিসাবে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে যেতে হয়। নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এককালীন বা কিস্তিতে টাকা উঠানো যায়। এ জমার বিপরীতে লাভ বা সুদ দেয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হিসাব আজকাল ব্যাংকে খোলা যয়। যথা : ঋণ হিসাব, বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বীমাসঞ্চয়ী হিসাব, অনাবাসী হিসাব ইত্যাদি।

বিনিয়োগ

ব্যাংকের তহবিল মূলতঃ উদ্যোক্তাদের পরিশোধিত মূলধন, বিভিন্ন জনগণের আমানতকৃত টাকা, বিভিন্ন সংস্থা থেকে সংগৃহীত ঋণ এই তিন পদ্ধতিতেই সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া আমানতকারীদের যে লভ্যাংশ তারা উত্তোলন করে না এবং লভ্যাংশ থেকে যে অংশ রিজার্ভ ফান্ড হিসেবে ভবিষ্যতের ঘটনা দুর্ঘটনার মুকাবেলা করার জন্য কেটে রাখা হয় সেগুলোও ব্যাংকের তহবিল গঠনে কাজে লাগে।

সংগৃহীত মূলধন ব্যাংক কোথায় কিভাবে বিনেয়োগ করে

তফসিলী ব্যাংকসমূহকে তার পরিশোধিত মূলধন ও আমানতকারীদের জমাকৃত টাকা ইত্যাদি মাধ্যম থেকে সংগৃহীত মূলধনের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগরিকদের অর্থ সম্পদ সংরক্ষণের জিম্মাদার এ কারণে আমানতকারীদের নিরাপত্তার জন্য আমানতকৃত টাকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নিকট সংরক্ষিত রাখে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে শতকরা কত টাকা জমা রাখতে হবে তা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির বিচার বিশ্লেষণ করে এবং সরকারের নীতিনির্ধারণী অর্ডিনেন্সসমূহের আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয়। বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংককে সকল মেয়াদী ও তলবী দায়ের ৫% কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিতে হয়। এই সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে সপ্তাহান্তে বৃহস্পতিবারে হিসাব করে নির্ধারণ করা হয়। (তবে পাকিস্তানের তফসিলী ব্যাংক সমূহকে ৪০% স্টেইট ব্যাংকে জমা করতে হয়)। সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে অনেক সময় এই নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী টাকা (ট্রেজারি বিল, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, আয়কর বন্ড, সিকিউরিটিপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে) কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে হলে তার জন্য বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষিত সকল টাকাই Liquidity Reserve বা তরল মূলধন (নগদ বা সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য মূলধন) বলে গণ্য হয়। এ ছাড়া আমানতকারীদের প্রাহ্যহিক চাহিদা ও দৈনন্দিন অন্যান্য ব্যয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নগদ ক্যাশ হিসেবে ব্যাংককে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হয়। নগদ ক্যাশ হিসেবে কতটাকা সংরক্ষণ করা হবে তার হার কোন দেশে নির্ধারিত থাকে যেমন- পাকিস্তানে ৫% নির্ধারিত,[৭] আবার কোন দেশে এটি ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনায় রাখার অনুমতি দেয়া হয়। এক ব্যাংক যদি অন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাহলে সেটাকেও তরল মূলধন বলে গণ্য করা হয়।

অবশিষ্ট টাকা ব্যাংক বিভিন্ন লাভজনক খাতে সুদ বা লাভের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। বর্তমানে এই বিনিয়োগের অনেক খাত রয়েছে। যথা :

১. ব্যবসায়ী ও পেশাদারদেরকে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী কিংবা প্রজেক্টভিত্তিক ঋণ দান।

২. ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট বা আনির্দিষ্ট খাতে ঋণ দান।

৩. বিভিন্ন ব্যাংককে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দান।

৪. বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার, সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের বন্ড, সিকিউরিটিপত্র, ডিভেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় এবং এর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন।

৫. আমদানি-রফতানি খাতে বিনিয়োগ।

৬. বিল বাট্টাকরণে বিনিয়োগ ইত্যাদি।

ব্যবসায়ী, পেশাজীবী বা ব্যক্তি বিশেষকে যে ঋণ দেয়া হয় তার সুদের হার উভয় পরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় তবে এই ধরনের ঋণে সুদের হার ১৫% থেকে ২০% এর মাঝে হয়ে থাকে।

ঋণের আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ব্যাংক উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়া যায় কি না, গৃহীত ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ করা আবেদনকারীর পক্ষে সম্ভব হবে কি না, যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিচ্ছে সেক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হলে তার কাছ থেকে ব্যাংকের পাওনা উঠিয়ে আনা সম্ভব হয়ে কি না ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে তাকে আদৌ ঋণ দেয়া যায় কি না; আর দেয়া গেলে কত টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া যায় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনে ঋণ আদায়ের গ্যারান্টি হিসেবে তার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের জামানত নিয়ে থাকে। যাকে ব্যাংকের পরিভাষায় মর্টগেজ বলা হয়ে থাকে। ঋণ মঞ্জুর করা হলে ব্যাংক তার নামে একটি একাউন্ট খুলে দিয়ে তাকে একটি চেক বই সরবরাহ করে। সেই চেকের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে এই একাউন্ট থেকে টাকা উঠাতে পারে।

এক ব্যাংক তার সাময়িক প্রয়োজনে অন্য ব্যাংক থেকে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করে। মেয়াদ অনুসারে সুদের হার পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই সুদ ও ঋণদাতা ব্যাংকের মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়।

---

৭. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে যে লাভ হয় তাও ব্যাংকের মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়। বন্ড ইত্যাদি ক্রয় করে ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ লাভ করে।

আমদানি-রফতানি খাতে বিনিয়োগ ও মধ্যস্থতা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাংক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে বর্তমানে ব্যাংকের মধ্যস্থতা ছাড়া আমদানি রফতানি করা স্মভব হয় না কেননা কোন আমদানিকারক যখন ভিন্ন কোন রাষ্ট্র থেকে কোন বস্তু আমদানি করতে চায় তখন রফতানিকারক এ ব্যাপারে গ্যারান্টি চায় যে, তার পণ্য যখন পৌছবে তখন তার মূল্য অবশ্যই যথাসময়ে পরিশোধ করা হবে তাই রফতানিকারককে আশ্বস্ত করার জন্য আমদানিকারক ব্যাংক থেকে এ মর্মে একটি গ্যারান্টিপত্র গ্রহণ করে। যে গ্যারান্টিপত্রে ব্যাংক এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অমুক ব্যবসায়ী বা কোম্পানীর নিকট অমূক পণ্য এত পরিমাণ বিক্রি করা হলে তার মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব। এই গ্যারান্টিপত্রকে ইংরেজীতে (LETTER OF CREDET) লেটার অফ ক্রেডিট বলা হয় ব্যাংক থেকে এই গ্যারান্টিপত্র অর্জন করাকে এলসি খোলা বলা হয়। এলসি খোলার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

ক. ফুল মার্জিন এলসি।

খ. জিরো মার্জিন এলসি।

গ. আংশিক মার্জিনে এলসি।

ব্যাংক এলসির জন্য নির্ধারিত হারে কমিশন গ্রহণ করে থাকে। আমদানীকারকের ব্যাংক সাধারণত তিনটি দায়িত্ব পালন করে। যথা :

১. গ্যারান্টি প্রদান।

২. প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন।

৩. ঋণ প্রদান।

অপরপক্ষে রফতানিকারকের ব্যাংক কেবলমাত্র দুটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। যথা :

১. প্রতিনিধিত্বকরণ।

২. ঋণ প্রদান।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই রফতানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য রফতানি খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতাকে বিশেষ ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। এ জন্য রফতানি খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রদত্ত ঋণে সুদের হার কম রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে এ মর্মে দিকনির্দেশনা দান করে এবং রফতানি খাতে বিনিয়োগে সুদের হার কত হবে তা নির্দিারণ করে দেয়। সুদের হার কম হলে তফসিলী ব্যাংকসমূহ রফতানি খাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী নাও হতে পারে এ জন্য রফতানি খাতে বিনিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তফসিলী ব্যাকসমূহকে বিশেষ ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। যেমন রফতানী খাতে প্রদত্ত সুদের হার যত টাকা কম ধরা হয় সেই পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকগুলোকে দিয়ে দেয়। কেননা রফতানি আয় বৃদ্ধি হলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয় এবং মুদ্রামাণ বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রা বিনিময় ও বিল বাট্টাকরণ

বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা বিল বাট্টাকরণ : বিল অফ এক্সচেঞ্জ একটি বিশেষ ধরনের সনদ। কোন ব্যবসায়ী যখন কোন পণ্য নির্ধারিত মেয়াদের জন্য বাকীতে বিক্রি করেন তখন ক্রেতার নামে তিনি একটি বিল তৈরি করেন। এই বিলটিকে একটি সনদ হিসেবে গণ্য করার জন্য ক্রেতা থেকে তা মঞ্জুর করিয়ে এ মর্মে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন যে, এই বিলে উল্লিখিত টাকা আমি অমুক মাসের এত তারিখে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো। ক্রেতার এই স্বাক্ষরকে (Endorsement) বলা হয়।

ক্রেতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এটি একটি সনদের মর্যাদা লাভ করে। ব্যাংকিং পরিভাষায় একে বিল অফ এক্সচেঞ্জ উর্দুতে হুন্ডি বলা হয়। যে তারিখে ক্রেতা বিলের টাকা পরিশোধ করবে বলে উল্লেখ থাকে তাকে (Maturity Date) বলা হয়। উক্ত তারিখ আসার আগেই যদি বিক্রেতার টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি এই বিল অন্যের নিকট বিক্রি করে দিতে পারেন। সাধারণত বিলে যে পরিমাণ টাকার উল্লেখ থাকে তার চেয়ে (Discount) বা কম মূল্যে তা বিক্রি করা হয়। কত কম মূল্যে বিক্রি করা হবে তা নির্ভর করে বিল বিক্রয়ের দিন থেকে (Maturity date) এর ব্যবধানের ওপর। বিলের এই মূল্য হ্রাসকে ব্যাংকিং পরিভাষায় (Discounting of --Bill of Exchange) এবং উর্দুতে বাট্টা লাগানো বলা হয়ে থাকে।

ব্যাংক এসব বিল (Discountng) -এর ভিত্তিতে ক্রয় করে এবং নির্ধারিত সময়ে ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য আদায় করে নেয়। এতে যে লাভ হয় তা ব্যাংকের মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের বিলের মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন মাস হয়ে থাকে। এ জন্য এটাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

এছাড়াও ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করে এবং এ বাবদও শতকরা হারে কমিশন গ্রহণ করে। এটিও ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের একটি খাত।

বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি

ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হল বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি। মূলত টাকা পয়সাই হল বিনিময়ের প্রকৃত মাধ্যম। সাধারণত মানুষ নগদ টাকায় লেনদেন করে থাকে এবং একশ টাকার বিনিময়ে একশ টাকার সমপরিমাণ ফায়দা লাভ করতে পারে। কিন্তু ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত ১০০ টাকা দ্বারা ব্যাংক অনেক টাকার ফায়দা লাভ করতে পারে। আর তা করতে পারে চেক সরবরাহের মাধ্যমে। চেক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে একশ টাকা দিয়ে বহু টাকার কাজ আঞ্জাম দেয়া যায়। এভাবে ১০০ টাকা চেকের মাধ্যমে বহু টাকার কাজ করার কারণে বিনিময়ে মাধ্যম বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি হয়।

যেমন ব্যাংক যদি একশ টাকা কাউকে ঋণ দেয়, আর সে ঋণ চেকের মাধ্যমে সরবরাহ করে, তাহলে ১০০ টাকা ব্যাংকের কাছেই থেকে যায়। অথচ উক্ত ব্যক্তিকে ১০০ টাকার ঋণগ্রহীতা সাব্যস্ত করে তার কাছে থেকে সুদ আদায় করতে থাকে। সেই ব্যক্তি যদি উক্ত চেক উক্ত ব্যাংকেই কিংবা তার অন্য কোন শাখায় জমা দেয়; তখন ব্যাংকে জমার পরিমাণ হয় ২০০ টাকা এবং ঋণ দেয়া হল একশত টাকা। অথচ মূল টাকা ১০০ই রয়ে গেল। আর যদি চেকটি সেই ব্যাংকে জমা না দিয়ে অন্য ব্যাংকে জমা দেয় তবুও দুই ব্যাংক মিলে অতিরিক্ত ১০০ টাকা সৃষ্টি হয়। সেই ব্যাংক যতদিন পূর্বোক্ত ব্যাংক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে না নেয় ততদিন পর্যন্ত পূর্বোক্ত ব্যাংক ঐ টাকা ব্যবহারের সুযোগ পায়। আবার কেউ যদি ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নেয়, তাহলে ব্যাংক তাকে নগদ টাকা না দিয়ে উক্ত ব্যাংকেই তার নামে

Dhaka University Institutional Repository

একটি একাউন্ট খুলে দেয় এবং তাকে একটি চেক বই সরবরাহ করে। সেই চেক দিয়ে সে যখন ইচ্ছা উক্ত ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে পারে। ঋণ গ্রহীতাকে যেদিন চেকবই সরবরাহ করা হয় সেদিন থেকেই সে ব্যাংকের নিকট ঋণী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু সব টাকা সে এক সাথে উঠায় না। অনেক সময় ছয় মাস বা আট মাস পরেও টাকা উঠানো হয়। এই সময়ের মাঝে ব্যাংক উক্ত টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করতে পারে। ফলে ঋণ গ্রহীতা থেকেও সে সুদ পায়; আবার অন্য জনকে দিয়ে তার কাছ থেকেও সুদ আদায় করে। চেক ব্যবহারের সুবিধার জন্য ব্যাংক একই টাকা পুনঃপুন ব্যবহার করে লাভবান হয়।

এছাড়া ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের টাকাকেও ব্যাংক ব্যবহার করতে পারে। অথচ এ বাবদ ব্যাংক আমানতকারীকে কোন সুদ দেয় না। অনেক সময় কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখার পর বছরকালও পেরিয়ে যায়। এই টাকা ব্যবহার করে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে অথচ এ টাকা বাবদ ব্যাংককে কিছুই পরিশোধ করতে হয় না। উপরন্ত আমানতকারী থেকে একাউন্ট চার্জ কেটে রাখা হয়।

ব্যাংকের কাছে কিছু টাকা ফ্লট মানি (Float Money) হিসেবে থাকে পুঁজি হিসেবে সেগুলোও ব্যাংক ব্যবহার করে থাকে। ফ্লট মানি বলতে ব্যাংকের কাছে রক্ষিত অন্তর্বর্তীকালীন হিসাব বহির্ভূত টাকাকে বুঝায়। যেমন- কোন ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ১০,০০০ টাকা নগদ পরিশোধ করে ট্রাভেল চেক গ্রহণ করল। সে চেক যে ব্যাংকে জমা হবে সে ব্যাংক চেক প্রদানকারী ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে নিতে মাঝে কয়েক দিনের ব্যবধান হয়ে যায়। এই অন্তর্বর্তীকালে ব্যাংকের নিকট এই টাকা সংরক্ষিত থাকে। অথচ এ টাকা চেক গ্রহণকারীর হিসেবে জমা থাকে না; যে জন্য কোন সুদও দিতে হয় না। অনুরূপভাবে দীর্ঘ মেয়াদী হিসাবের টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর উঠিয়ে নিতে অনেক সময় বিলম্ব হয়। তখনও ঐ টাকা হিসাব বহির্ভূতভাবে ব্যাংকের নিকট রক্ষিত থাকে। এ ধরনের হিসাব বহির্ভূত সংরক্ষিত টাকাকে ফ্লট মানি বলা হয়। এসব টাকাও ব্যাংক পুঁজি হিসেবে খাটিয়ে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানীর ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। সংজ্ঞাটি হলো :

> "Islami Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures exressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations."
>
> ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জন করে।

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়; এ আইনে ইসলামী ব্যাংকের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক এমন একটি কোম্পানী যা ইসলামী ব্যাংকিং কারবারে নিয়োজিত, আর ইসলামী ব্যাংকিং কারবার হলো এমন কারবার যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।[৮]

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা দু'টি বিশ্লেষণ করলে চারটি উপাদান পাওয়া যায় :

১. সুদ বর্জন করা : প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থা ঋণ ও সুদের উপর ভিত্তিশীল। এসব ব্যাংক ঋণ নিয়ে সুদ দেয় এবং ঋণ দিয়ে সুদ নেয়। গৃহীত সুদ ও প্রদত্ত সুদের পার্থক্যই হচ্ছে এদের মুনাফার প্রধান উৎস। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে সকল প্রকার সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম। ইসলামী ব্যাংক তাই ঋণের ব্যবসা করে না এবং সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ পরিহার করে চলে।

২. মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা : সুদ বর্জন করার পর ইসলামী ব্যাংকের আয়ের বিকল্প পথ হচ্ছে বিনিয়োগ ও মুনাফা। আল্লাহ তাআলা আল কুরআনের সূরা বাকারায় বলেছেন :

واحل الله البيع وحرم الربوا-

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।[৯]

তাই ইসলামী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে ঋণ লেনদেন বর্জন করে এবং মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। এরূপে ব্যাংক বছরে যে মুনাফা অর্জন করে এর একটা অংশ অর্থ জমাকারীদের মধ্যে বণ্টন করে এবং অপর অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ডিভিডেন্ট হিসেবে ভাগ করে দেয়।

৩. শরীয়ত নির্দেশিত হালাল কারবারে বিনিয়োগ করা : ইসলামী শরীয়তে হারাম পণ্যের ব্যবসাকে হারাম করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে মদ কেবল পান করাই হারাম নয়, মদের উৎপাদন, মদের বিনিময় ও ব্যবসাও হারাম। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক শরীয়তে হারাম গোষিত সকল প্রকার ব্যবসা ও কারবার থেকে বিরত থাকে এবং শুধুমাত্র হালাল কারবারে বিনিয়োগ করে।

৪. হালাল পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণ করা : চতুর্থ এবং শেষ কথা হচ্ছে যে ইসলামী শরীয়তে হালাল কারবারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হারাম পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করাও হারাম। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ পন্থা-পদ্ধতিও বর্জন করে এবং কেবল হালাল পন্থাতেই ব্যবসা ও বিনিয়োগ করে থাকে।

মোটকথা, যে প্রতিষ্ঠান সুদ, হারাম কারবার এবং হারাম পদ্ধতি পরিহার করে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে হালাল পথে যাবতীয় ব্যাংকিং কাজ পরিচালনা করে, তাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক।

---

৮. লজ অব মালয়েশিয়া, এ্যাক্ট নং ২৭৬। ১৯৮৩ সালের ৯ মার্চ রাজকীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত। ১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত পৃ. ৮।

৯. সূরা বাকারা : ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ

বর্তমান বিশ্বে মানুষের সামষ্টিক কল্যাণের ক্ষেত্রে যুলুম মূলক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অবাস্তব কল্পনা বিলাসী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কার্যকর প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অধুনা বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম সকল দেশেই এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর দ্রুত প্রসার দেখে মনে হচ্ছে যে, আগামী একবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র বিশ্বে ইসলামের জীবনাদর্শ বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত, জড়বাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত, বিশ্ববাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিকেই মুক্তি ও কল্যাণের ব্যবস্থা হিসেবে বরণ করতে বাধ্য হবে।

এক সময়ে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংক পরিভাষাদ্বয় অনেকের কাছে উপহাসের বিষয়, অবাস্তব কল্পনা ও স্বপ্ন বলে অনুভূত হতো। আজ তা বাস্তব ও ধ্রুব সত্য বলে প্রমাণিত। বর্তমানে অনেক অমুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং অনেক অমুসলিম দার্শনিক ইসলামী জীবন বিধান ও ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নকে আগামী শতাব্দীর মানব সমাজে সামাজিক সুবিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে রাসূলে কারীম (সা.) এর যুগেই সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতি প্রাতিষ্ঠা লাভ করেছে।

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়ামের গৃহিত ব্যবস্থার ফলেই এর উদ্ভব ঘটেছে। অবশ্য আজকের যুগের মতো ব্যাংকিং পদ্ধতির সুবিন্যস্ত ও সুষ্ঠু কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত সংস্থার কার্যক্রম ২২ লক্ষ দিরহাম মূলধন দিয়ে শুরু হয়। তার ইন্তেকালের সময় এর তারাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬ লক্ষ দিরহাম।

ইসলামী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদ ড. আহমদ নাজ্জার মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের বিষময় প্রভাবমুক্ত সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য মোচন ও গগনচুম্বী অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণার্থে ১৯৬৩ সালে অনেকটা গ্রামীণ ব্যাংকের কাঠামোতে মিসরের অবহেলিত বদ্বীপ মিট গামারে। আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাংকের জনপ্রিয়তা ও কল্যাণকারিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত একমাত্র মিসরেই ৯টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা প্রদর্শন করে মিসরের তদানীন্তন শাসক ইয়াহুদী ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক জামাল আবদুস নাসের ১৯৬৭ সালে সব কয়টি ইসলামী ব্যাংককেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

পরবর্তী পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ গণদাবীর সামনে বাধ্য হয়ে জামাল আবদুল নাসের নিজেই ১৯৭২ সালে *সোশ্যাল ব্যাংক* নামে একটি শক্তিশালী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত উপনিবেশ শাসন মুক্ত মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতির সংরক্ষণ ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাদশাহ ফয়সালসহ মুসলিম বিশ্বের কল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে 'ওআইসি' নামে (ওয়ার্ল্ড ইসলামিক কনফারেন্স) সংস্থা গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালে জিদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসি সদস্যভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সক্রিয় সহযোগিতায় (I.D.B) ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক নামে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

১৯৭৫ সালে জিদ্দাকে কেন্দ্র করে গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে সর্বপ্রথম ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (I.D.B) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মিসরে সোশ্যাল ব্যাংক ও জেদ্দাভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়।

তুরস্কের মতো কট্টর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী দেশও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দুবাই-কুয়েত-সউদী আরব প্রভৃতি দেশে বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসে।

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে ও, আই, সি অন্তর্ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র সেনেগালের রাজধানী 'ডাকারে' অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পর্যায়ক্রমে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পর মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপক সাড়া জেগে উঠে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের পরিকল্পনাসহ দুবাইস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহসিন এ দীর্ঘ পত্র লিখে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানান।

১৯৭৯ সালে জনাব মুহসিনের প্রেরিত উল্লেখিত পত্র প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ সরকার ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করে।

জনাব মুহসিনের অনুরোধপত্র প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন গবেষণা পরিচালক জনাব ফখরুল আহসানকে বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের বাস্তবতা ও পিজিবিলিটি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য মিসর, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে। জনাব ফখরুল আহসান বাংলাদেশের ডেপুটি গভর্নর পদ হতে অবসর গ্রহণের পর বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব নিয়োজিত রয়েছেন।

জনাব আহসান ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে মিসরের সোশ্যাল ব্যাংক কায়রো ইসলামী ব্যাংকিং এসোসিয়েশন, দুবাই ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্ভাব্যতার ওপর লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন দাখিল এর পর পরই ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকাস্থ পি. জি. হাসপাতাল মিলনায়তনে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেন।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মরহুম মাওলানা আবদুর রহীমকে চেয়ারম্যান করে ১৯৭৭ সালে 'ইসলামী ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো নামক একটি গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সিলেট নিবাসী মরহুম আলহাজ্জ আবদুর রাজ্জাক লশকরকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশের তদানীন্তন সউদী রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব, রাবেতার পরিচালক মীর কাসেম আলী, ইবনে সিনার ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক আবু নাসের মোঃ আবদুজ জাহের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মফিজুর রহমান, যশোরের শিল্পপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসাইন, বায়তুশ শরফের পীর শাইখ আবদুল জাবার (রহঃ), বিশিষ্ট শিল্পপতি এম, এ রশীদ চৌধুরী, সি, পি আই জনাব মুহাম্মদ ইউনুস, জনাব নুরুজ্জামান, অধ্যাপক আবদুল্লাহ, এ কে ফজলুল হক, হাজী বশির উদ্দিন, আলহাজ্ব আবুল কাসেম, জনাব দাউদ খান, জনাব মোস্তফা আনোয়ার, জনাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাহ, শেখ আহমদ সালেহ যুমযুম, ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ইসলামী ব্যাংক জর্দান, মিনিস্ট্রি অব অওক্বাফ কুয়েত, সোশ্যাল সিকিউরিটি কুয়েত, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, মিনিস্ট্রি মাইনরস এফেয়ার্স অব কুয়েত, আল রাযী কোম্পানী, দুবাই ইসলামী ব্যাংক, আই, ডি, বি ও ইসলামিক সেন্টার ৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালের ২৭শে মার্চ ৭৫ মতিঝিলে সর্বপ্রথম এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে।

১৯৮৩-এর ১২ আগস্ট এক গাম্ভীর্যপূর্ণ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন হয়। এ যাবত কাল পর্যন্ত গোটা দেশে ইসলামী ব্যাংকের মোট ৩৪৫টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ তার নিষ্ঠা ও কল্যাণমুখী সেবার কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ব্যাংক তার কল্যাণধর্মী তৎপরতার জন্য বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক পুরস্কৃত হয়ে ১৯৯৭ সালে সেরা ব্যাংকের তালিকায় সমগ্রবিশ্বে ৪০তম স্থান অধিকারের মর্যাদা লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, আল বারাকা ব্যাংক ও ফয়সল ইসলামী ব্যাংক নামে মোট ৭টি পরিপূর্ণ এবং আরো ৭টি আংশিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ আরও বিভিন্ন ব্যাংক ইসলামী কাউন্টার খোলার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিমসহ মোট ৪১টি দেশে সর্বমোট ১৫৬টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে সমাজবাদের ব্যর্থতার পর পুঁজিবাদীদের শোষণ হতে মুক্তির জন্যে সমগ্র বিশ্ববাসী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে এ প্রত্যাশা পোষণ করছি একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব ব্যবস্থা হবে ইসলাম এবং বিশ্ববাসী স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামকে জীবন বিধান মুক্তির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি

বিশ্বে প্রচলিত প্রতিটি সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কোন না কোন বিশ্বাস বা দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। উদাহরণস্বরূপ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুবাদ, অবাধ ব্যক্তি-মালিকানা এবং নিরংকুশ ব্যক্তি-স্বাধীনতাই (Laissez-Faire) অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদের মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অপরদিকে ব্যক্তি-মালিকানাই যাবতীয় জুলুম, শোষণ ও বৈষম্যের মূল; তাই ব্যক্তি-মালিকানার উচ্ছেদ এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নতি ও মুক্তি নিহত। এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। একইভাবে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবের পৌত্তলিক ও গোষ্ঠীবাদী সমাজ যখন বিশ্বাস করলো যে এ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক ও বিধানদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সা.) মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআন এবং সুন্নাহই হচ্ছে মানুষের উন্নতি, শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ, তখন এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলো ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।[১০]

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা দর্শন থেকেই উৎসারিত। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সেই একই দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার উপর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ভিত্তিশীল। বস্তুতঃ ইসলামে মানব জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রভৃতি দিক ও বিভাগের একটিকে অপরাপর দিক ও বিভাগ থেকে পৃথক করে দেখা হয় না, বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে একই সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ এবং পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতি এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক দার্শনিক ভিত্তিগুলো হচ্ছে ঃ তৌহিদ ও রবুবিয়াত, খিলাফত ও রিসালাত এবং আখিরাত।

তৌহিদ ও রবুবিয়াত

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার ভিত্তি বা মৌলিক বিশ্বাসের প্রথম কথা হলো তৌহিদ ও রবুবিয়াত। তৌহিদ ও রবুবিয়াতের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহ এক, একক ও অদ্বিতীয়;[১১] তিনিই সৃষ্টিকূলের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু ও প্রতিপালক;[১২] সার্বভৌম মতার অধিকারী একমাত্র তিনিই।[১৩] অর্থনীতি ক্ষেত্রে তৌহিদ ও রবুবিয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ বিশ্বের সকল মানুষ, মানুষের যোগ্যতা-প্রতিভা ও শক্তি-মতা এবং এ মহাবিশ্ব ও এর যাবতীয় সম্পদরাজির একমাত্র স্রষ্টা, মালিক, প্রভু ও সার্বভৌম নিয়ন্তা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। বস্তুতঃ তৌহিদ ও রবুবিয়াতের দ্বারাই আল্লাহর সাথে মানুষের, মানুষের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে অন্যান্য সৃষ্টিকূলের সম্পর্ক নির্ধারিত ও নিরূপিত হয়।[১৪] তৌগি দর্শনের মূলকথা হচ্ছে ঃ মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, আর মানুষ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাহ ও দাস;[১৫] আল্লাহ হচ্ছেন সার্বভৌম মতার অধিকারী একমাত্র বিধানদাতা;[১৬] আর আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা হিসেবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে একমাত্র তাঁরই বিধান মেনে চলা। সুতরাং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির, প্রভু ও দাসের, বাদশাহ ও প্রজার এবং আইনদাতা ও আনুগত্যকারীর।

রবুবিয়াতের অর্থ হচ্ছে : আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র প্রতিপালনকারী। প্রকৃতপে মানুষসহ সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তথা জীবিকার ঐশী ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে রবুবিয়াতের মর্মকথা।[১৭] আল্লাহ এ বিশ্বজাহানে অসংখ্য-অগণিত সম্পদরাজির এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে সকল যুগের সকল মানুষ

---

১০. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা,* ঢাকা : আঞ্জুমান প্রিন্টিং প্রেস, পৃ. ২৭।

১১. সূরা আল ইখলাস : ১।

১২. সূরা আল ফাতিহা : ১।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, মুসলিম ইকোনমিক থিংকিং : এ সার্ভে অব কন্টেম্পোরারী লিটারেচার, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউকে, ১৯৮১, পৃ. ৪।

১৫. সূর আল কামার : ৩, ১৪, আল আন'আম : ২৬, আলে ইমরান : ৫১, ৫৬।

১৬. সূরা ইউসুফ : ৬৭, আল আন'আম : ৬২, আল আন'আম : ৫৭।

১৭. ড. খুরশীদ আহমদ, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন এন ইসলামিক ফ্রেমওয়ার্ক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউ.কে।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের যোগ্যতা-প্রতিভা নিয়োজিত করে এ থেকে প্রয়োজনীয় জীবন-সামগ্রী আহরণ, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ করতে পারে এবং পৃথিবীতে সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারে।

দুনিয়ার সকল মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। সুতরাং সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই।[১৮] এ সম্পর্ক পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। গোটা বিশ্ব-প্রকৃতি আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহর সাথে সকল মানুষের সম্পর্ক যেমন একই রকম, তেমনি বিশ্বের সম্পদের উপর সকল মানুষের অধিকার ও দায়িবও একইভাবে স্বীকৃত।[১৯] আল্লাহর বিধান দ্বারাই এ সম্পর্ক, অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত ও নিরূপিত হতে হবে। তৌহিদ হচ্ছে এমন একটি মুদ্রা যার দু'টো পিঠ রয়েছে; এক পিঠে বলা হয়েছে যে আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা এবং অপরদিকে বলা হয়েছে যে মানুষ হচ্ছে সমান অংশীদার, অথবা প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষের ভাই।[২০]

খিলাফত ও রিসালাত

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি বা বিশ্বাস হচ্ছে খিলাফত ও রিসালাত। খিলাফত হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব; ইংরেজীতে বলা যায় Vicegerency বা Trusteeship. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা Viceroy বা Trustee হিসেবে। কুরআন মজীদের সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন :

> এবং স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব ফিরিশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করব।[২১]

রিসালাত হচ্ছে খলিফাদের মধ্য থেকে রাসুল মনোনয়ন করে তাঁর মাধ্যমে খলিফাদের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও বিধান পাঠানোর খোদায়ী ব্যবস্থা।[২২] বস্তুতঃ পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি নিয়োগ করার পর প্রতিনিধির দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের ইচ্ছা। তথা আইন-বিধান অনুসারে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা। এজন্য প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আইন-কানুন পাওয়া জরুরী। আল্লাহ তায়ালা রিসালাতের মাধ্যমে তাঁর আইন-কানুন তাঁর প্রতিনিধি মানুষের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করেছেন।

ইতিপূর্বে তৌহিদ ও রবুবিয়াত সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে যে, এ বিশ্বজাহান, এর সম্পদরাজি, এমনকি মানুষের নিজ সত্তা, তার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা-প্রতিভা এ সবকিছুর প্রকৃত ও একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এরপর খিলাফত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মানুষ হচ্ছে সেই প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি। আর রিসালাতের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, প্রতিনিধির অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত মালিকের বিধি-বিধান পাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে রিসালাত।

---

১৮. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৯. প্রাগুক্ত; সূরা আল আ'রাফ : ৩৫।

২০. প্রাগুক্ত। আল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ : ৩৫।

২১. সূরা বাকরা : ৩০, আল আন'আম : ১৬৫, ৩৫, ৩৯, ৫৭, ৭।

২২. আবুল হাসান মোঃ সাদেক, *ইনট্রোডাকশন : ইসলামিক ইকোনমিক থট : রীডিংস ইন ইসলামিক ইকোনমিক থট*, পৃ. ৪, সম্পাদনা আবুল হাসান মোঃ সাদেক ও আইদিত গাজালি, লংম্যান : মালয়েশিয়া এসডিএন, বিএইডি, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ পৃথিবীতে নিজের খলিফা বানিয়ে মানুষকে একদিকে যেমন সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলে (সা.) মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে ট্রাস্ট সম্পদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিরাট দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তাঁর নিজ পরিকল্পনায় মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য সামনে রেখে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একে মানুষের বসবাসের উপযোগী বানিয়ে এখানে বেঁচে থাকার ও বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। এরপর সম্পদ আহরণ, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ-ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-প্রতিভা ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে মানুষকে তাঁর খলিফা করে পাঠিয়েছেন। অতঃপর খলিফাদের মধ্য থেকে যুগে যুগে রাসূল নির্বাচন করে তাঁদের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ-ব্যবহার সংক্রান্ত আল্লাহর আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতি মানুষকে জানিয়ে ও শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর দেয়া যোগ্যতা-প্রতিভাকে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁরই শেখানো নিয়ম অনুসারে সম্পদ আহরণ করা, তাঁরই আইন অনুসারে সম্পদ বিনিয়োগ ও উৎপাদন করা, তাঁরই দেয়া বিধান অনুসারে সম্পদ বন্টন ও বিনিময় করা এবং তাঁরই কানুন মোতাবেক সম্পদের ভোগ ও ব্যবহার করা। আল্লাহর নিযুক্ত ট্রাস্টি হিসেবে এর অন্যথা করার অধিকার মানুষের নেই। আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষ যদি নিজের ইচ্ছা অথবা অন্য কারো রচিত আইন অনুযায়ী এ কাজ করে, তাহলে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে; সে ক্ষেত্রে মানুষ আমানতের খেয়ানতকারী ও মালিকের বিদ্রোহী বলে গণ্য এবং খলিফার মর্যাদা থেকে মানুষ হবে অপসারিত।

আখিরাত

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার তৃতীয় ও শেষ মৌলিক ভিত্তি বা বিশ্বাস হচ্ছে আখিরাত বা পরকাল অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। আখিরাতের মূলকথা হচ্ছে, এ পৃথিবীর জীবনই মানুষের শেষ নয়; বরং মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ আরেক জগতে প্রবেশ করবে এবং চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে। এ পৃথিবীর বর্তমান ব্যবস্থা একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং আর একটি নতুন জগত সৃষ্টি করা হবে। সেখানে সকল মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। আল্লাহর আদালত কায়েম করা হবে এবং পৃথিবীর জীবনে মানুষ তার উপর অর্জিত খিলাফতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কিনা সেখানে তার হিসাব নেয়া হবে। আল্লাহর বিচারে যারা সফল প্রমাণিত হবেন, তাঁদের বেহেস্তের নেয়ামত দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে; যারা ব্যর্থ প্রমাণিত হবে, তাদের দোজখের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

আল্লাহর প্রভুত্ব ও মালিকানা এবং মানুষের খিলাফতের পর আখিরাত বা পরকালীন জীবন, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। পরকালীন জীবনে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কার লাভের আশা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর আইন-বিধান অনুসারে সম্পদের আহরণ, বিনিয়োগ, উৎপাদন, বন্টন-বিনিময় ও ভোগ-ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করে এবং সতর্ক রাখে। মূল মালিকের কাছে জবাবদিহি করার তীব্র অনুভূতি মানুষকে সর্বদা দায়িত্ব সচেতন রাখে এবং কোথাও কোন ত্রুটি হয়ে না যায় সেজন্য সদা সচেতন থাকতে বাধ্য করে। আর কখনো ভুল হয়ে গেলে মানুষ তার মালিকের কাছে লজ্জিত হয় এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার এ অনুভূতি মানুষকে যাবতীয় অন্যায়, জুলুম, শোষণ তথা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর বিধানের অনুগত বানিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই আল্লাহর খলিফা হিসেবে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধান অনুসারে আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদ সমাবেশ ও বিনিয়োগ করে, যাতে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয় এবং পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য দিক ও বিভাগের মতো এর অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকেও ইসলামের প্রধান আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে হয়। নীচে ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো :

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম করা

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম এবং এ ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল হারাম পথ, পন্থা ও পদ্ধতি থেকে মানবতাকে মুক্ত করাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়-উপকরণের ব্যবহার এবং আর আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান এবং সমাজের উন্নয়ন সাধিত হবে।

এছাড়া ড. এম. ওমর চাপরা ইসলামী ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করেছেন।[২৩]

১. আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।

ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্য ইসলামের নৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পুঁজিবাদের গোটা ব্যবস্থা, বিশেষ করে এর অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা এ লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত নয়। ফলে এ ব্যবস্থায় সৃষ্ট আয় ও সম্পদের পর্বত-পরিমাণ বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইসলাম প্রথমে বৈষম্য সৃষ্টির কারণগুলোর মূলোৎপাটন করেছে; অতঃপর বৈষম্য আরো হ্রাস করার জন্য যাকাত, করারোপ এবং সম্পদ হস্তান্তরের মত অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুতরাং অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনভাবে রূপায়ন করতে হবে, যাতে তা অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং সম্পদ ও আয় বন্টনে অবদান রাখতে পারে।

২. মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন করা।

মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে ইসলামী অর্থব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ মুদ্রামানের অস্থিরতা কখনো মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়, আবার কখনো দীর্ঘমেয়াদী মন্দা ও বেকারত্ব সৃষ্টি করে। উভয় অবস্থাই ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতি ক্রমান্বয়ে আর্থিক সম্পদের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়ে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং ভোক্তা জনসাধারণের উপর জুলুম চাপিয়ে দেয়। মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনশীল কর্ম-প্রচেষ্টার পরিবর্তে ফটকা কারবারকে উৎসাহিত করে এবং আয়-বৈষম্যকে তীব্রতর করে তোলে। এভাবে নৈতিক মূল্যবোধকেও বিকৃত করে দেয়। সুতরাং ইসলামী মূল্যবোধ ও মুদ্রাস্ফীতি পরস্পর বিরোধী।

---

২৩. ড. এস ওমর চাপরা, ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা, পৃ. ২। অনুবাদ মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূ., ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

অপরপক্ষে দীর্ঘস্থায়ী মন্দা ও বেকারত্বকেও ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ মন্দা ও বেকারত্ব অধিকাংশ জনগণের দুর্দশা বাড়িয়ে দেয় এবং সামাজিক কল্যাণকে ব্যাহত করে। মন্দা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।

৩. সুদবিহীন ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৪. লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগকরা।

৫. ইসলামী পদ্ধতিতে উৎপাদনশীল ও কল্যাণকর খাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

৬. ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

৭. জনগণকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

৮. দারিদ্র্য বিমোচন তথা গরীব, অসহায়, বেকার ও স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা।

৯. সমাজের অসহায় ও দরিদ্র লোকদেরকে প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করা।

১০. মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখা।

১১. অর্থ ব্যবস্থায় ধনীকে আরো ধনী হবার এবং গরীবকে আরো গরীব হবার পথ সৃষ্টি না করা।

১২. শ্রমিকের মর্যাদা, অধিকার এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৩. মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে মুসলিম উম্মার উন্নতি ও সংহতি জোরদারে অবদান রাখা।

১৪. ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সম্পাদন করা।

১৫. ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ এবং শোষণহীন সমাজ গঠনে প্রচেষ্টা চালানো।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য তিনটি। এছাড়া অপরাপর যে বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামী ব্যাংক ধারণ করে সেগুলোসহ নিম্নে উপস্থাপন করছি।

রিবা বা সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি

সুদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলাই ইসলামী ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিতে ব্যাংক যার যাই হোক, ইসলামী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ ইসলাম সুদকে হারাম করেছে। ইসলামের এ নিষেধাজ্ঞাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি। জীবন সম্পর্কে ইসলাম যে ধ্যান-ধারণা পেশ করেছে, তার সাথে ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ সংগতিশীল। ইসলামী সমাজে এ জাতীয় যত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, তাও একই ভিত্তির ওপর স্থাপিত হবে। ফলে ইসলামী সমাজের অবকাঠামোর সাথে ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্যের কোন বিরোধ থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রম ও উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা। প্রচলিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করে; এ লগ্নি বা ঋণের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে সুদ। পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার দার্শনিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে এটাই স্বাভাবিক। যে ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কার্যক্রম সেই ধ্যান-ধারণার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণায় হারাম-হালালের প্রশ্ন অবান্তর। সমাজের সাধারণ স্বার্থ ও কল্যাণ সেখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। ব্যক্তিকে সেখানে অবাধ ও নিরংকুশ স্বাধীনতা দেয়া হয়। ফলে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ ও হাসিলের জন্য ব্যক্তি তার সকল শক্তি ও কর্ম-প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে থাকে।

পুঁজিবাদী ব্যাংক যে সব প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করে, সে সব প্রকল্পের কাজের ধরন, সমাজের ওপর এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন বিচার-বিবেচনা করে না। সকল ক্ষেত্রে ব্যাংক কেবল একটি বিষয়ই বিবেচনা করে, তা হলো সুদ বা আয় পাওয়ার নিশ্চয়তা। অর্থাৎ যতক্ষণ কোন প্রকল্পে মুনাফা হতে থাকে আর ব্যাংক তার প্রাপ্য সুদ যথারীতি পেতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত প্রকল্পে অর্থলগ্নি করতে দ্বিধা করে না। সুদ ভিত্তিক ঋণের অর্থ তাই মানবতার জন্যে কল্যাণকর প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয় না। মুনাফার প্রতি খেয়াল রেখে সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে এ অর্থ খাটানো হয়। এতে সমাজের ক্ষতি হলে বা এর নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে গেলেও তাতে বিনিয়োগকারীর কিছু আসে-যায় না। একমাত্র মুনাফার প্রতিই তার লক্ষ্য থাকে।

পক্ষান্তরে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের ধ্যান-ধারণা সুদী ব্যাংকের ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম এবং ইসলামের নিজস্ব জীবন-দর্শনই হচ্ছে এ ব্যাংকের বুনিয়াদ। এ ব্যবস্থায় সুদী লেনদেনের কোনই অবকাশ নেই। ইসলামী আইনবেত্তাগণ ইসলামী ব্যাংকের জন্যে সুদের বিকল্প হিসেবে দু'টি পন্থা অনুমোদন করেছেন। সুদ পরিহার করে ইসলামী ব্যাংক এ দু' উপায়েই অর্থ লেনদেন করছে :

ক. প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ : এ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক নিজেই কোন প্রকল্পে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করবে। প্রকল্পে অর্জিত সাকুল্য মানুফা ব্যাংকেরই থাকবে। আর এতে লোকসান হলে তার পুরোটাই ব্যাংক নিজে বহন করবে।

খ. অংশীদারী বিনিয়োগ : এ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক কোন উৎপাদনমুখী প্রকল্পের মূলধনে অংশ গ্রহণ করবে এবং প্রকল্পের মালিকানায় অংশীদার হবে। এ ক্ষেত্রে সহ-অংশীদার হিসেবে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানেও ব্যাংকের প্রত্যক্ষ অংশ থাকবে এবং পূর্ব-নির্ধারিত চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হবে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতি স্পষ্ট। এখানে সুদ-রূপী পূর্ব-নির্ধারিত সুনিশ্চিত আয়ের মাধ্যমে শোষণের কোন অবকাশ নেই। সুদী ব্যবস্থায় মূলধন পূর্ণ নিরাপদ, উপরন্তু সুদের মাধ্যমে আসলের বৃদ্ধিও সুনিশ্চিত। ফলে সুদী ব্যাংক প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির দিকে আদৌ কোন নজর দেয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় অংশীদারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক মুনাফায় ও লোকসানে অংশগ্রহণ করার স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শর্তে কারবারে অর্থ যোগান দেয়। সুতরাং এতে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট আয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই; উপরন্তু লোকসানের ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব রয়েছে।

ইসলামী ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী জীবন-দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত। তাই শরীয়তের আলোকে বৈধ এবং সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হলেই কেবল ব্যাংক কোন প্রকল্পে সরাসরি বা অংশীদারী ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং কোন প্রকল্পে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা অংশগ্রহণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংককে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় :

Dhaka University Institutional Repository

ক. সরাসরি বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ও সেবা মানুষের বৈধ প্রয়োজন পূরণ করবে কিনা;

খ. উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ও সেবা হালাল সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত কিনা;

গ. উৎপাদন-প্রক্রিয়ার স্তরসমূহ (অর্থ সংগ্রহ, শিল্পায়ন, ক্রয়, বিক্রয়) হালাল কিনা;

ঘ. উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ, কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, মজুরী ব্যবস্থা ইত্যাদি বৈধ নির্দেশের সাথে সংগতিশীল কিনা; এবং

ঙ. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভ দেখার সাথে সাথে সমাজের সাধারণ কল্যাণ এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি যথাযথ নজর রাখা হয়েছে কিনা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন

ইসলামী ব্যাংকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ইসলামের মৌলিক আক্বিদা-বিশ্বাস এবং মানব জীবন সম্পর্কে এর নিজস্ব ধারণা থেকেই ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্য উৎসারিত হয়েছে। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর এক অংশকে অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা সম্ভব নয়।

সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইসলামের নীতি। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ যাকাতের কথা বলা যেতে পারে। যাকাত আদায় ও বন্টন করা একটি সামাজিক ও নৈতিক কাজ। কিন্তু ইসলাম একে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতির মধ্যে শামিল করে দিয়েছে, যার ফলে যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজটি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম রাজনৈতিক দায়িত্বেও পরিণত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উদ্যোগের সামাজিক লাভই হচ্ছে ঈমান ও মূল্যবোধের সাথে অর্থনৈতিক সংগঠনের সম্পর্ক নিরূপণের প্রধান উপাদান বা মাপকাঠি।

সামাজিক লাভালাভের ব্যাপারে সুদী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ঐতিহ্যগতভাবেই সুদী ব্যাংকের কাজ কেবলমাত্র এর ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক যেমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তেমনি একটি সামাজিক ও নৈতিক প্রতিষ্ঠানও। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক শুধু নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে না, বরং নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মনে করে। নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে কোন সুফলই দিতে পারে না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই কাজ করে এবং সামাজিক স্বার্থ ও ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সংগতি রেখে চলে। ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের ন্যায় সামাজিক উন্নয়ন বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত লাভালাভের দৃষ্টিতেই সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে না।

দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করে বিশ্বের প্রায় সব সম্পদ ও ক্ষমতা ধনী ঋণদাতা দেশের হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। বস্তুতঃ বিশ্বের ধনী দেশগুলো ক্রমে আরো ধনী হয়ে ওঠা এবং দরিদ্র দেশসমূহের আরো দরিদ্র হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ সুদ। ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> The regime of interest has been a major factor responsible for the worsening distribution of income and wealth within and between nations.[২৪]

সুদের এ শোষণ ও বৈষম্যের ফলে দেশের ভিতরে পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধনী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো তা হানাহানি, যুদ্ধ ও ধ্বংস বয়ে আনে। ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, সুদখোরদের অর্থলিপ্সা বিশ্বের বহু সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেছে। জি. ফেরো তাঁর 'দি গ্রেটনেস এন্ড ডিক্লাইন অব রোম' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে সুদখোরদের অশুভ তৎপরতারই রোম সাম্রাজ্যকে ধংস করেছে।[২৫]

ম্যাকনায়ার উইলসন ফরাসী সাম্রাজ্য ও নেপোলিয়নের পতনের জন্য সুদের প্রভাবকে দায়ী করেছেন।[২৬]

সুদী ঋণব্যবস্থার ফলে উত্তরের কয়েকটি ধনী দেশের সাথে দণিের বিপুল সংখ্যক দেশের বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলো সুদ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ঋণকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করছে এবং বিশ্বসমাজ একটি ভিন্ন ও উন্নততর অর্থ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে।

এছাড়া অপরাপর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-

১. ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

২. ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় লেনদেন ও কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ সুদমুক্ত।

৩. ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে।

৪. ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকাণ্ড ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত।

৫. ইসলামী শরীয়ায় অনুমোদন করে না এমন কোন কর্মকাণ্ড বা ব্যবসা বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংক অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং কোন প্রকার সহযোগিতাও করতে পারে না; যদিও তা লাভজনক খাত হয়ে থাকে।

৬. ইসলামী ব্যাংকের কর্মকাণ্ড শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকিকরণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের জন্যে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকে রয়েছে একটি শরীয়া কাউন্সিল।

৭. ইসলামী ব্যাংক মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।

৮. ইসলামী ব্যাংক ইসলামী পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে অর্থ বিনিয়োগ করে।

---

২৪. দ্র. ড. আনোয়ারুল ইকবাল কোরেশী, ইসলাম এ্যান্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট, এম. এইচ. মুহাম্মদ আশরাফ অনূ., লাহোর, ১৯৭৪, পৃ. ১৬৬।

২৫. ড. আনোয়ারুল ইকবাল কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

২৬. ম্যাকমিলান কমিটি রিপোর্ট, মিনিটস অব এভিডেন্স, ৩য় খ, পৃ. ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র মুনাফাই অর্জন করে না বরং জনগণের কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

১০. দরিদ্র জনগণকে প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করে এবং যাকাত আদায় করে।

১১. ইসলামী ব্যাংক মানুষকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার না করে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিঃস্ব, গরীব এবং স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।

১২. ইসলামী ব্যাংকে ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্ক; মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সম্পর্ক থাকে অংশীদারিত্বের। এখানে মহাজন-গ্রাহক কিংবা প্রভু-গোলামের মত সম্পর্ক থাকে না।

ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যাংক যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং, অতি-ব্যাংকিং (Extra Banking), অ-ব্যাংকিং (Non-Banking) কাজ করে, ইসলামী ব্যাংকও সে সব কাজ আঞ্জাম দেয়। তবে দর্শন, মূলনীতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নিয়ম-পদ্ধতি ও নীতির দিক থেকে পুঁজিবাদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যাংকের প্রধান পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে সুদ। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় লেনদেন সুদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে সুদমুক্ত ব্যাংক মানেই ইসলামী ব্যাংক নয়। ইসলামী ব্যাংককে সুদ পরিহার করার সাথে সাথে এর যাবতীয় লেনদেন, কাজ-কর্ম এবং নিয়ম-পদ্ধতির সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা ও বিধি-বিধান অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হয়। ইসলামের বাণিজ্যিক নীতিমালা, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইনান্স সংক্রান্ত পদ্ধতি এবং বিধি-বিধান উৎসারিত। ওলামায়ে কিরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এসব নীতি, বিধান ও পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন এবং প্রত্যেক ইসলামী ব্যাংক শরীয়া বোর্ডের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে এসবের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে। ইসলামী ব্যাংক মূলতঃ ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংকিং কারবার প্রতিষ্ঠান।

ইসলামী ব্যাংক সমূহের তহবিলের উৎস হচ্ছে :

১. পরিশোধিত মূলধন;

২. সংরক্ষিত তহবিল;

৩. অন্যান্য সঞ্চিতি ও অবণ্টিত মুনাফা;

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ;

৫. অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ;

৬. ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ;

৭. জনগণের গচ্ছিত আমানত; এবং

৮. যাকাত।[২৭]

---

২৭. অধ্যাপক শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশোধিত মূলধন

এ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তবে এসব ব্যাংকের অনেকগুলোতেই সরকার এবং সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের কোম্পানী আইনের অধীনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে এসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত। বেশ ক'টি ব্যাংকে দেশের ভিতর ও দেশের বাইরের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান মূলধন যোগান দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাংকের ৫% শেয়ারের মালিক; দেশের ভেতর থেকে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ কয়েকটি বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশী সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এই ব্যাংকের মূলধনে অংশ নিয়েছে। অনুরূপভাবে মিশর, সুদান, সেনেগাল ও তুরস্কেও দেশী-বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইডিবিও বেশ ক'টি ব্যাংকের মূলধনে অংশ নিয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং কোম্পানী শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এর মূলধন সংগ্রহ করে। ইসলামী ব্যাংকিং কোম্পানী স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয় এবং শেয়ারের জন্য বিনিময়যোগ্য (Negotiable) সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে। ইসলামী শরীয়তের মুশারাকা (অংশীদারী) নীতিমালার অধীনে এসব শেয়ার ইস্যু করা হয়।

সংরক্ষিত তহবিল

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধান অনুসারে ইসলামী ব্যাংককে প্রতি বছর এর কর-পূর্ব নিট মুনাফার একটি নির্ধারিত অংশ সংরতি তহবিল হিসেবে জমা রাখতে হয়। এ অর্থকে ব্যাংকের মূলধন গণ্য করা হয়। ব্যাংকের এ সঞ্চিতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলধন-ভিত্তিক মজবুত করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইচ্ছা করলে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে এ সঞ্চিতির হার পরিবর্তন করতে পারে এবং কোন ব্যাংকের সঞ্চিত তহবিলকে যথেষ্ট মনে করলে সে ব্যাংককে লিখিতভাবে উক্ত রূপ সঞ্চিতি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। উল্লেখ্য যে, এক বছর পার হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর এরূপ তহবিলের উপর ইসলামী ব্যাংককে যাকাত পরিশোধ করতে হয়।

অন্যান্য সঞ্চিতি ও অবণ্টিত মুনাফা

মূলধন-ভিত্তিকে মজবুত করা এবং ভবিষ্যতের লোকসান বা অন্য যে কোন ধরনের আপদ মুকাবিলার লক্ষ্যে মুনাফা থেকে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে সঞ্চয় করে ইসলামী ব্যাংক বিশেষ সংরক্ষিত তহবিল গড়ে তুলতে পারে। এছাড়া ব্যাংক তার মুনাফা বন্টন না করে সম্পূর্ণ মুনাফা বা এর অংশ দ্বারাও সঞ্চিত তহবিল গড়তে পারে। তবে কর প্রদানের পরই কেবল অনুরূপ সঞ্চয় করা যায়। এসব সঞ্চিত তহবিলও ব্যাংকের মূলধন বলে পরিগণিত হয় এবং ব্যাংককে প্রতিবছর এর উপর যাকাত দিতে হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার বার্ষিক বিনিয়োগ-আয়ের ১০% সঞ্চয় করে 'লস অফসেটিং রিজার্ভ' নামে একটি তহবিল গঠন করেছে।[২৮]

---

২৮. অধ্যাপক শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। ইসলামী ব্যাংক কখনো তারল্য সমস্যায় পড়লে তা মুকাবিলার জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সাময়িকবাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক এরূপ ঋণকে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারী জমা হিসেবে গণ্য করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নামে মুদারাবাহ হিসাব খুলে উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ জমা করে দেয়। ব্যাংক এ অর্থ কারবারে খাটায় এবং মুদারাবাহ হিসাবে যে হারে মুনাফা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সে হারে মুনাফা দেয়।

অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ

দেশে-বিদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রয়োজনে অর্থ লেনদেন করতে পারে। ইসলামী শরীয়তে এরূপ লেনদেনে কোন বাধা নেই। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের কাছ থেকেও আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে; উক্ত সুদী ব্যাংকও প্রয়োজনে সমপরিমাণ অর্থ একই মেয়াদের জন্য ইসলামী ব্যাংককে ধার দেয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশী-বিদেশী সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তবে এ ব্যাপারে কারো অভিমত হচ্ছে, পূর্ব-সমঝোতার ভিত্তিতে ঋণের বিপরীতে আবার নির্ধারিত ঋণ সুবিধা নেয়া সুদের মধ্যে শামিল এবং এরূপ লেনদেন শরীয়তে অনুমোদিত নয়।[২৯] এ ব্যাপারে আরো চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা প্রয়োজন।

ইসলামী অর্থায়ন-পত্র বিক্রয়

ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে সুদী ঋণপত্র ও সিকিউরিটির পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে এর মাধ্যমে অর্থায়নের পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পাকিস্তানে 'পার্টিসিপেশন টার্ম সার্টিফিকেটস' (PTCS) এবং 'মুদারাবাহ সার্টিফিকেটস' জর্দানে 'মুকারাদা সার্টিফিকেটস' এবং মালয়েশিয়া, মিশর ও ইয়েমেনে 'গভর্ণমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট' চালু করা হয়েছে। এসব ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করে ইসলামী ব্যাংক এর তারল্য ঘাটতি মুকাবিলা অথবা কোন বিশেষ প্রকল্পের জন্য লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

জনগণের গচ্ছিত আমানত

ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের বৃহত্তর অংশ আসে গ্রাহকদের গচ্ছিত আমানত থেকে। ইসলামী ব্যাংক প্রধানত ওয়াদিয়াহ্ ও মুদারাবাহ ভিত্তিতে জনগণের অর্থ গচ্ছিত রাখে।

ওয়াদিয়াহ্ হচ্ছে নিরাপদে হেফাজত বা সংরক্ষণ করা। এটি একটি আমানত। কিন্তু আমানতকারীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যাংক এ অর্থ কারবারে ব্যবহার করে; এরূপ আমানতে আমানতকারীকে আমানত ফেরতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং আমানতকারী যখনই ফেরত চায় তখনই ব্যাংক তার সাকুল্য অর্থ ফেরত দেয়। ব্যাংক এর উপর আমানতকারীকে কোন মুনাফা দেয় না। ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাবে এ নীতির ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করা হয়।

---

২৯. মোহাম্মদ আরিফ ও এম এ মান্নান সম্পাদিত, ডেভেলপিং এ সিস্টেম অব ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস, ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ১৯৯০, পৃ. ২১১, টিকা ২।

Dhaka University Institutional Repository

মুদারাবাহ ভিত্তিতে ব্যাংক এ শর্তে জমা গ্রহণ করে, অর্থ খাটিয়ে লাভ হলে জমাকারী পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে লাভের অংশ পাবে; কিন্তু লোকসান হলে তা জমাকারীকে সম্পূর্ণ বহন করতে হবে।

ইসলামী ব্যাংক শরীয়তে বিধিবদ্ধ উক্ত পদ্ধতিতে বিপুল সঞ্চয় সমাবেশ করে এবং তা উৎপাদনশীল ও লাভজনক কারবারে খাটায়।

যাকাত

ইসলামী ব্যাংক প্রতিবছর তার যাকাতযোগ্য সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করে এবং যাকাতের অর্থ দ্বারা পৃথক তহবিল গড়ে তোলে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দুঃস্থ মানুষের পুনর্বাসন ও কল্যাণার্থে এ অর্থ ব্যয় করা হয়। ইসলামী ব্যাংককে যাকাতের অর্থের আয়-ব্যয়ের পৃথক হিসাব সংরণ করতে হয়। ব্যাংক এ অর্থ বিনিয়োগে খাটায় না। আল-কুরআনে নির্দেশিত যাকাত ব্যয়ের যে খাত রয়েছে, ব্যাংক এ অর্থ কেবল সে সব খাতেই ব্যয় করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড ও সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের জন্যই একটি শরীয়াহ বোর্ড রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকাণ্ড ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যেই এ শরীয়াহ বোর্ড গঠিত। শরীয়াত বোর্ড অনুমোদন করে না এমন কোন প্রকল্পে ইসলামী ব্যাংক কোন অর্থ বিনিয়োগ করে না। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্যেই এ শরীয়াত বোর্ড গঠিত হয়।

ইসলামী ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্য-নির্বাহে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেসব বিষয়ে শরীয়াহ সম্মত পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের জন্যে শরীয়াহ বোর্ডের নিকট পেশ করা হয়। শরীয়াত বোর্ড ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সে সকল বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত পেশ করে থাকে। শরীয়াহ বোর্ডের মনোনীত মুরাকিবগণ (অডিটর) প্রয়োজনমত বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম অডিট করেন এবং রিপোর্ট পেশ করেন। দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম, ফকীহ, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের নিয়ে শরীয়াহ বোর্ড গঠিত হয়ে থাকে। ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যগণ কেবলমাত্র জ্ঞানের দিক দিয়েই পণ্ডিত নন; বরং আমল, আখলাক, খোদাভীতি ও পরহেজগারির দিক দিয়েও সর্বজন মহলে স্বীকৃত ও আস্থাভাজন। ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের কোন সদস্যই ব্যাংকের কর্মকর্তা নন। ফলে তাঁরা স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেন।

ইসলামী ব্যাংকসমূহকে শরীয়াহ্ প্রতিপালনের দিক থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একই সাথে সকল ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ডকে কেন্দ্রীয়ভাবে একই নিয়ম নীতি নির্দেশ করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য গঠন করা হয় সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

কেউ কেউ মনে করেন ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের লেনদেনের মধ্যে তো তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আসলে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের লেনদেন, বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে বাহ্যিক তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও, এ দু'য়ের কার্যক্রমের নীতিমালা, পদ্ধতি ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে বহু পার্থক্য। নিম্নে মাত্র কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো :

ইসলামী ব্যাংক

১. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্ম পদ্ধতির সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইসলামী ব্যাংকে সুদের কোন অস্তিত্ব নেই।

২. ইসলামী ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে না, বরং পণ্যের ব্যবসা করে। ইসলামী ব্যাংকে নগদ অর্থ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং নগদ অর্থকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩. ইসলামী ব্যাংক সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার নির্দেশাবলী পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকে। এতদুদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকে একটি তদারককারী শরীয়া বোর্ড থাকে। শরীয়া অনুমোদন করে না এমন কোন কাজে হাত দেয়া ব্যাংকের পে সম্ভব নয়।

৪. ইসলামী ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন করা হয়। ইসলামী ব্যাংক-কে সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাই লাভজনক হলেও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর এমন কোন খাতে ইসলামী ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।

৫. ইসলামী ব্যাংক আসলের অতিরিক্ত কোন অর্থ পাবার উদ্দেশ্যে কাউকে কোন নগদ অর্থ লোন বা ঋণ হিসেবে প্রদান করে না। কারণ লোন বা ঋণের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে ঋণদাতা ঋণ-গ্রহীতার নিকট থেকে কেবল আসল ফেরত নেবে, চুক্তির ভিত্তিতে আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়া যাবে না। আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়ার ইচ্ছে থাকলে ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ অর্থের সাহায্যে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় (ব্যবসা) করতে হবে।

৬. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অংশীদারী কারবারে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব থাকে এবং পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে ব্যবসার লাভ লোকসানে অংশ নেয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব ও লোকসানের বোঝা বিনিয়োগ গ্রহীতার উপর ছেড়ে দেয় না, বরং ইসলামের বিধান অনুযায়ী লোকসানেরও বোঝা বহন করে।

৭. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের নিরাপত্তা এবং সুনির্দিষ্ট আয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে ব্যবসায়ে লাভের জন্যে এবং লোকসানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ব্যাংক বিশেষজ্ঞগণ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

৮. ইসলামী ব্যাংক অর্থ জমাদানকারীদেরকে কোন নির্দিষ্ট লাভ প্রদানের অগ্রিম বাণী শুনায় না। ব্যাংক জমাকারীদের অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জন করে থাকে, তার থেকে একটি অংশ বা হার (পূর্ব শর্তানুযায়ী) জমা-দানকারীদেরকে প্রদান করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদের বিনিময়ে টাকা খাটায় না। বরং ব্যাংক নিজে কিংবা উদ্যোক্তার মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে এবং ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসার মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর নির্দেশিত পথে সমাজ থেকে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা।

১০. ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো পণ্য বিক্রেতা ও ক্রেতার এবং ব্যবসার লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের।

১১. ইসলামী ব্যাংক নিজেকে সমাজ সংগঠনের একটি অংশ মনে করে। ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা।

১২. ইসলামী ব্যাংক নিজের এবং অন্যের যাকাত, সাদাকা ও অনুদানের অর্থ পরিকল্পিতভাবে আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করে।

১৩. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো পণ্য কেনা বেচার সাথে সম্পৃক্ত। এখানে বিনিয়োগ গ্রাহককে কোনক্রমেই নগদ অর্থ প্রদান করা হয় না।

১৪. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ তথা পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একবার মুনাফা ধার্য করার পর তা মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে ব্যাংক দ্বিতীয়বার কোন মুনাফা ধার্য করতে পারে না। কারণ ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্যের মূল্য গ্রাহক/ক্রেতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। আর ঋনের উপর সময়ের ব্যবধানে অতিরিক্ত কিছু আদায় করার অর্থই হচ্ছে সুদ আদায় করা। ফলে কোন বিনিয়োগ হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলে ইসলামী ব্যাংক আর্থিক দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কোন বিনিয়োগ হিসাব যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয় সে জন্যে পূর্ব হতেই ব্যাংক কর্মকর্তাদের সতর্কতা অবলম্বনসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

সুদী ব্যাংক

১. সুদী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার কর্মকাণ্ডের সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। সুদই হচ্ছে তাদের আয়ের প্রধান উৎস এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মূলমন্ত্র।

২. সুদী ব্যাংক নির্দিষ্ট হার সুদে অর্থের ব্যবসা করে অর্থাৎ অর্থকে ব্যবসার পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

৩. সুদী ব্যাংকের অস্তিত্ব যেহেতু সুদের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং সেখানে শরীয়া বোর্ড থাকার কোন প্রশ্নই আসে না।

৪. সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দিতে সুদী ব্যাংকগুলো বাধ্য নয়। এ ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষ। সুদসহ মূলধন ফেরত আসবে কিনা, এটাই তাদের দেখার বিষয়। সেখানে হালাল হারামের প্রশ্ন অবান্তর।

৫. সুদী ব্যাংক আসলের অতিরিক্ত কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট হার সুদে নগদ অর্থ লোন বা ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সুদী ব্যাংক কোন ধার ধারে না, বরং সুদসহ আসল ফেরত পাবে এটাই তাদের হিসাব।

Dhaka University Institutional Repository

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ব্যাংক সুদসহ আসল পূর্ণভাবে আদায় করে নেয়। ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব ও লোকসানের বোঝা ঋণগ্রহীতাকে একাই বহন করতে হয়। ব্যাংক কোন দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না। ঋণ গ্রহীতার লোকসানের দিকে সুদী ব্যাংক আদৌ কোন নজর দেয় না।

৬. সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় মূলধন পূর্ণ নিরাপদ এবং সুদের মাধ্যমে আয়ের বৃদ্ধিও সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত। ব্যাংক আমানতের উপর কম হারে সুদ দেয় এবং ঋণের উপর অধিক হারে সুদ নেয়।

৭. সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত থাকে। ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে অধিক হারে সুদ নেয় এবং তার থেকে কম হারে আমানতকারীদেরকে সুদ প্রদান করে থাকে।

৮. সুদী ব্যাংকসমূহের আসল এবং প্রধান কাজ হলো সুদের বিনিময়ে টাকা খাটানো। ব্যাংক সাধারণত নিজে কোন ব্যবসা করে না বরং ব্যবসায়ীদেরকে সুদের বিনিময়ে মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

৯. সাধারণ মানুষের সেবা ও কল্যাণে কাজ করা সুদী ব্যাংকগুলো বাধ্য নয়। অর্থের ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নেই এর কার্যক্রম প্রধানত সীমাবদ্ধ।

১০. সুদী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক থাকে মহাজন খাতকের এবং সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতার।

১১. সুদী ব্যাংকের এ ধরনের তেমন কোন আগ্রহ নেই। কারণ এ বিষয়ে সুদী ব্যাংক বাধ্য নয়।

১২. সুদী ব্যাংক আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবায় কাজ করতে পারে বটে। তবে এ ধরনের কোন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য থাকে না।

১৩. সুদী ব্যাংকগুলো পণ্য কেনাবেচা করতে বাধ্য নয়। এখানে গ্রাহক/ঋণ গ্রহীতাদের হাতে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

১৪. সুদী ব্যাংকের কোন হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে তারা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে থাকে। ফলে কোন হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তাদের কোন অসুবিধা ও চিন্তা থাকে না। কারণ অতিরিক্ত সময়ের জন্যে তারা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নির্ধারিত অধিক হারে সুদ আদায় করলে এটাই তাদের প্রধান হিসাব।

এই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কেন

বর্তমান বিশ্বে আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেউ কেউ হয়তো মনে করে থাকবেন যে, বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে বহু সংখ্যক ব্যাংক রয়েছে। এ সকল ব্যাংকগুলোর মাধ্যমেই তো মানুষ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের আবার কি প্রয়োজন আছে? এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক, পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূল (সা.) জীবন বিধান দিয়েছেন যা মানব জাতির জন্যে কল্যাণকর। অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান তথা ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে ইসলামী ব্যাংকের অবশ্য প্রয়োজন রয়েছে এবং তা অপরিসীম। ইসলামী ব্যাংকিং হলো ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একটি প্রধান দিক। বর্তমান বিশ্বে অন্তহীন সমস্যার উৎস হলো অর্থনীতি। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, শোষণ, জুলুম, শ্রেণীগত সংঘাত এসবের ক্রমবর্ধমান চাপে বিশ্ব মানবতা আজ আর্তনাদ করছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র কিংবা মানব রচিত অন্য কোন অর্থ ব্যবস্থাই মানবতার এ করুণ আর্তনাদকে স্তিমিত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ নিশ্চিত করতে পেরেছে আল্লাহ পাকের নির্দেশিত ও মহানবীর (সাঃ) প্রবর্তীত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থারই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

বর্তমান সভায় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাংক ব্যতীত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক লেনদেন কোনভাবেই সম্ভব নয়। সুদী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হচ্ছে না-তা নয়। তবে উপকৃত হবার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্তই হচ্ছে অধিক। ব্যাংকগুলো থেকে যদি সুদ প্রথাটি রহিত করা হয় তাহলেই ব্যাংকগুলো মানুষের জন্যে প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠা হিসেবে গণ্য হতে পারে। সুদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কুফল। সুদ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলামে সর্বপ্রকার সুদকেই হারাম ঘোষনা করা হয়েছে। সুতরাং শর'য়ী কারণ ছাড়াও মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক বিবিধ কারণে ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন কেন এর কয়েকটি দিক নিম্নে অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো :

ক. ইসলামী ব্যাংক সুদকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলে।

খ. ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষ সুদের পাপ এবং কুফল থেকে বাঁচতে পারে এবং হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করতে পারে।

গ. বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাস্তবমুখী পদপে গ্রহণ করে থাকে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে বেকারত্ব হ্রাস করতে পারবে।

ঙ. ইসলামী ব্যাংক লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বে অর্থ বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ ব্যবসা করে।

চ. অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে আদল ও ইনসাফ কায়েমে প্রচেষ্টা চালায়।

ছ. সম্পদকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করে।

জ. ইসলামী ব্যাংক উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা দান করে এবং মজুদদারী ও মুনাফাখোরী প্রতিরোধে কাজ করে।

ঝ. গরীব জনগণকে জরুরী প্রয়োজনে লাভ মুক্ত ঋণ (কর্জে হাসানা) প্রদান করে এবং সুদের হাত থেকে রা করে।

ঞ. ইসলামী ব্যাংক দক্ষ হাতে মূলধন অর্পণ করে এবং মানুষের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে।

ট. মানুষকে সহনশীল হতে শিক্ষা দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে।

ঠ. ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকাণ্ড ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়েমে প্রচেষ্টা চালায়। ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন অত্যধিক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলীর সমন্বিত চিত্র

এখানে প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়াস পাব, সে সঙ্গে ইসলামী শরীয়তের আলোকে নির্বাচিত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালানো হবে।[৩০]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

احل الله البيغ وحرم الربا-

আল্লাহ তাআলা ক্রয় বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।[৩১]

তিনি আরো বলেন :

يايها الذين امنوا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون-

এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক।[৩২]

তিনি আরো বলেন :

يايها الناس كلوا مما فى الارض حللا طيبا ولا تتبعوا خطوت الشيطن انه لكم عدو مبين-

হে মানবমণ্ডলী পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ করো। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে না, সে নিঃসন্দেহে তোমার প্রকাশ্য শত্রু।[৩৩]

আমার এ প্রচেষ্টা (প্রচলিত সুদী ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে ইসলাম অনুমোদিত) ব্যাংকিং কার্যক্রম নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হবে। একটি ব্যাংকের অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সে ব্যাংকের প্রকৃতি ও প্রকরণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয় বলে প্রত্যেক ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এজন্য ইসলামী ব্যাংক যেসব কার্যক্রম নির্বাচন করে থাকে, তা প্রচলিত ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচিত কার্যক্রম থেকে ভিন্নতর। এ বিষয়টি নিম্নবর্ণিত আলোচনা থেকে আরো স্পষ্ট হবে :

ক. প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রকারভেদ।

খ. প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদের ক্ষেত্রসমূহ।

গ. নিষিদ্ধ ব্যাংকিং কার্যক্রমের ইসলামী বিকল্পসমূহ।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকসমূহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু অতিরিক্ত কার্যক্রম।

---

৩০. আলোচনাটি এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা, আমি শরীয়ত বিশেষজ্ঞদেরকে এসব কার্যক্রমের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং শরীয়তের আলোকে এগুলোর বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে গবেষণা করার উৎসাহ দিচ্ছি। আমি তাদেরকে অধুনা সৃষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যাংকিং বিনিয়োগ সম্পর্কে শরীয়তকেন্দ্রিক মতামত ব্যক্ত করার আহবান করছি। যাতে করে ইসলামী ব্যাংক ও মুসলমানগণ নিজেদের ব্যাপারে সচেতন হয়। আল্লাহ আমাদের আশা পূরণে সহায়ক হোন, তিনিই সর্বোত্তম বন্ধু ও সাহায্যকারী।

৩১. সূরা বাকারা : ২৭৫।

৩২. সূরা আল মায়েদা : ৯০।

৩৩. সূরা বাকারা : ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ক. প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রভারভেদ

প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অসংখ্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, তাদের লেন-দেনের মাত্রা এতো বেশি যে, এসব ব্যাংকে কেউ কেউ বহুমাত্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাংকিং সুপার মার্কেট অথবা সকল প্রকার সেবা ব্যাংক কিংবা ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাংক ইত্যাদি বলে অভিহিত করে। মূলত এসব ব্যাংক সকল প্রকার ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সেবামূলক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

নিম্নে প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তালিকা দেয়া হল :

১. জমা গ্রহণ, যা নিম্নবর্ণিত রূপে গৃহীত হতে পারে :

   চলতি হিসাবে জমা,

   মেয়াদী হিসাবে জমা,

   পূর্ব জ্ঞাপন সাপে ডিপোজিট,

   সঞ্চয়ী হিসাবে জমা,

   বীমা হিসাবে জমা।

২. ঋণ প্রদান (সাধারণ)

৩. ঋণপত্র (LC) খোলা, তা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে :

   - ব্যক্তিগত সাধারণ ঋণপত্র অথবা বীমাপত্র হিসেবে।

   - দ্রব্যের গ্যারান্টিতে প্রদত্ত ঋণপত্র (অথবা অন্যান্য জিনিসের গ্যারান্টিতে)।

   - বিল বিষয়ক ঋণপত্র (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেডিং বিলের পরিবর্তে প্রদত্ত)।

৪. ব্যবসা উপযোগী (আর্থিক মূল্যমানের) দলিলপত্রের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ কর্তন।

৫. ব্যাংকিং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন (ব্যবসায়ী ব্যাংকার-এর প্রত্যয়নে ব্যবসা বিষয়ক দলিলপত্র গ্রহণ)।

৬. নোট বা মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়।

৭. শেয়ার ও বন্ড ক্রয় বিক্রয় : গ্রাহকের পক্ষে অথবা ব্যাংকের পক্ষে।

৮. ব্যবসায়িক ও আর্থিক মূল্যমানের দলিলপত্র গ্রহণ।

৯. ঋণের নিরাপত্তা বিধান।

১০. নিশ্চয়তা পত্র বিধান।

১১. বিভিন্ন আর্থিক বন্ড ছাড়করণ এবং অন্যের হিসেবে বাজারজাতকরণ, (বিনিয়োগ বিষয়ক অর্থলগ্নী)

১২. শেয়ার ও বিল সংরণ

১৩. শেয়ার নিবন্ধন করা এবং শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ ও সার্টিফিকেট ছাড়করণ, কুপন দেয়া, মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি।

১৪. বহিরাগত অর্থের দেশীয় অর্থে রূপান্তর।

১৫. দেশীয় অর্থের বিদেশী অর্থে রূপান্তর।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. পর্যটন বিষয়ক চেক প্রদান।

১৭. সাধারণ অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা ও প্রচার।

১৮. বিশেষ কর্মবিভাগের মাধ্যমে অর্থবিষয়ক কর্মকাণ্ডে পরামর্শ প্রদান।

১৯. ব্যাংকের নিজস্ব অথবা গ্রাহকের কিংবা অন্যের প্রস্তাবিত যে কোন প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও বাস্তবতা পর্যালোচনা।

২০. গ্রাহকদের পক্ষে তাদের সম্পদ পরিচালনা।

২১. গ্রাহকদের ওয়ারেসীসত্ব পরিচালনা (মৃত্যুকাল থেকে শুরু করে ওয়ারেসীস্বত্ব বন্টন পর্যন্ত)।

২২. বীমা কোম্পানীসমূহ কর্তৃক মধ্যস্থতার বিনিময়ে জীবন বীমা প্রদান।

২৩. ব্যাংকের নিজস্ব বিশেষ বীমা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জীবন বীমা প্রদান।

২৪. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলায় প্রদত্ত জীবন বীমা।

২৫. বীমা প্রতিষ্ঠান কোম্পানী এবং সরকারের বীমা বিষয়ক সেবা পরিচালনা করা।

২৬. অধিক মূল্যের সামগ্রী ভাড়া প্রদান।

২৭. অর্থ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে পরামর্শমূলক সেবা প্রদান।

২৮. গ্রাহকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রমাণপত্র হিসেবে বহুবিধ প্রত্যয়নপত্র প্রদান।

২৯. বিবিধ কার্যক্রম।

খ. প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদের ক্ষেত্রসমূহ

প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রদত্ত ঋণের উপর অতিরিক্ত অর্থ দেয়ার বাধ্যবাধকতার মধ্যেই সুদ নিহিত। মূলত দুই দিক থেকে এসব কার্যক্রমে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে। কেননা ব্যাংক ঋণদাতা হিসেবে আমানত গ্রহণ করে নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে এবং একই অর্থ নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে অপরকে ঋণ দিয়ে থাকে। সুতরাং প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় দ্বিমুখী সুদের মিশ্রণ দুটি প্রধান কার্যক্রমে দেখা যায়-প্রথমটি আমানত গ্রহণে, দ্বিতীয়টি ঋণ প্রদানে। এ ক্ষেত্রে আমানতের ধরনবৈচিত্র্য এবং ঋণের প্রকরণ যা-ই হোক না কেন, তবুও প্রদত্ত এ সুবিধাদ্বয়ের বিনিময়ে গৃহীত অতিরিক্ত মুনাফার ফলে সুদের বৈশিষ্ট্যটি অস্তিত্ব লাভ করে।[৩৪] নিম্নে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

পূর্ব নির্ধারিত লাভে আমানত গ্রহণ

এ প্রকারের আর্থিক কার্যক্রমে ব্যাংক আমানতকারীদেরকে আমানতী টাকার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লাভ দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আমানতী টাকার মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে লাভের হারে তারতম্য ঘটে। আর এসব গচ্ছিত অর্থ ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহারের বিনিময় হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব নির্ধারিত থাকায় এসব লাভকে সুদের অবিকল দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

---

৩৪. এ প্রসঙ্গে দেখুন ড. সামী হাসান হামুদ : তাতবীরুল আমাল আল মাছরাফিয়াতি বিমা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ শরীয়াতুল ইসলামীয়াহ, আল কাহেরা, দারুত তুরাছ, ১৯৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব নির্ধারিত লাভে প্রদত্ত সাধারণ ঋণ

যে ঋণ গ্রাহককে নগদ দেয়া হয়, অথবা ফেরত দেয়ার নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাক্কলিত লাভসহ তার হিসেবের বিপরীতে ঋণ দেয়া হয় তাকে সাধারণ ঋণ বলা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহক প্রাপ্ত ঋণ ব্যবহার করুক বা নাই করুক তাকে লাভ দিয়ে যেতে হবে। এখানেই সুদ নিহিত।

ঋণপত্র

ব্যাংকিং কার্যক্রমে ঋণপত্র ব্যবস্থায় যে নির্ধারিত লভ্যাংশ ধরা হয় তা সুদী ঋণের পর্যায়ভুক্ত। তবে প্রচলিত ঋণ ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ঋণপত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের কাছ থেকে পূর্বনির্ধারিত ও প্রার্থিত অর্থের যে পরিমাণ উত্তোলিত হয়েছে, কেবল সে পরিমাণ অর্থের উপর নির্ধারিত হারে সুদ গ্রহণ করে। অর্থাৎ ঋণপত্র বিষয়ক কার্যক্রমে একজন গ্রাহক কেবলমাত্র তার ব্যবহৃত অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করবে। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণ ও ঋণপত্রের উপর গৃহীত লাভের মধ্যে পার্থক্য নেই। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় ক্ষেত্রে গৃহীত লভ্যাংশ সুদ ছাড়া আর কিছু নয়।[৩৫]

ব্যবসা উপযোগী আর্থিক মূল্যমানের দলিল পত্রের[৩৬] ওপর প্রদেয় লভ্যাংশ কর্তন

ব্যবসা উপযোগী বিল বা দলিলপত্রের ওপর প্রদেয় লভ্যাংশ কর্তন প্রক্রিয়াটিতে যদি একজন গ্রাহক কোন একটি বলি বা নগদ মূল্যমানের কোন ডকুমেন্ট ব্যাংকের নিকট মেয়াদের পূর্বে নগদায়নের জন্য পেশ করে তখন ব্যাংক ডুকুমেন্টটির নগদায়ন করবে। তবে মেয়াদের পূর্বে নগদায়নের কারণে লভ্যাংশ কর্তন করবে এবং প্রয়োজনীয় সার্ভিস চার্জ কর্তন করবে। সুতরাং কর্তনের মর্মকথা হলো এটি এক ধরনের চুক্তি, যে চুক্তিতে কর্তনকারী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একটি মেয়াদী আর্থিক মূল্যমানের ডুকুমেন্ট গ্রাহক কর্তৃক মেয়াদের পূর্বে উপস্থাপন করার ফলে অবশিষ্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রদেয় লভ্যাংশ কর্তন করে নগদায়ন করা। এরূপ কর্তন ঋণের ওপর আরোপিত লভ্যাংশের পর্যায়ভুক্ত বলে সুদ হিসেবে চিহ্নিত। এ প্রকারের লেন-দেনে কর্তনপ্রার্থী গ্রাহক পেশকৃত ডুকুমেন্টের মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়ন কালের সেই ডুকুমেন্টের মূল্য অনুযায়ী নগদ অর্থ যেন কর্জ হিসেবে গ্রহণ করল। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে মেয়াদ পূর্তি না হওয়ার ফলে কর্তনকৃত অর্থ যেন সেই ব্যাংক কর্তৃপকে লাভ হিসেবে প্রদান করল। এসব ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ এরূপ লেন-দেনকে অন্যান্য ঋণের পর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করে।

ঋণের বিনিময়ে মজুরি বা পারিশ্রমিক

দৃশ্যত মজুরি সুদী মুনাফার চেয়ে ভিন্ন। মূলত কোন সেবা বা শ্রমের বিনিময়ে গৃহীত পারিশ্রমিক মজুরির নামান্তর। প্রকৃত পক্ষে ব্যাংক কর্তৃক সেবাত্তোর গৃহীত এরূপ মজুরি সুদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, যদি ঋণ গ্রহীতার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব পালন না করে।[৩৭]

---

৩৫. ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৩৬. দলিলপত্র বলতে-শেয়ারপত্র, সঞ্চয়পত্র, টি,ডি,আর, বীমা পলিসি ইত্যাদি বুঝায়।

৩৭. ড. মুহাম্মদ সালেহ, *শারহিল ক্বানুনিত তেজারী আল মিসরী*, ২য় খণ্ড, কায়রো : দারুত তাবায়াতিল মিসরিয়াহ, ১৯৩৯, পৃ. ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং এ ধরনের সেবামূলক মজুরির ক্ষেত্রে বৈধতা সৃষ্টির প্রয়োজনে এটিকে বৈধকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে হবে। অর্থাৎ সেবার বাস্তব উপস্থিতির বিনিময়ে এবং উদ্দিষ্ট কল্যাণ সাধনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে হবে। যদি এরূপ করা সম্ভব না হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র ঋণ দেয়ার বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ অথবা প্রদত্ত ঋণ থেকে শতকরা হারে মজুরি কর্তন করা হয় তবে এ প্রক্রিয়াটি নিঃসঙ্কোচে সুদের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। সুতরাং সেবাভিত্তিক পারিশ্রমিকের সুদী চরিত্র পরিত্যাগ করার একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে পারিশ্রমিকের জন্য শ্রম থাকা চাই এবং প্রদত্ত ঋণের সঙ্গে কিংবা তার মেয়াদের সঙ্গে সেই পারিশ্রমিকের সম্পৃক্ততা হবে অনুপস্থিত।[৩৮]

গ্যারান্টিপত্র

গ্যারান্টিপত্র হলো ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্তভাবে ইস্যুকৃত একটি পত্র, যাতে গ্রাহককে কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হোক না না হোক নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে চাওয়া মাত্র নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

এটা সর্বজনবিদিত যে, এরূপ গ্যারান্টিপত্র নগদ বীমার সহজ বিকল্প। এ ব্যবস্থাকে ইসলামী ফিকহ্ বা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত 'কাফালাত' বা জামিনদারির আওতাভুক্ত করা যেতে পারে। মূলত ব্যাংকের এরূপ গ্যারান্টিপত্রের বহুবিধ কল্যাণকর দিক থাকায় এর বৈধতা সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত বিশারদদের আংশিক মতৈক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এরূপ সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত অর্থ কোন দায়িত্ব পালনের পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হলে বৈধতার প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক থাকে না।[৩৯]

ব্যাংকিং গ্রহণযোগ্যতা

গ্রাহক কর্তৃক পেশকৃত কোন বিল বা এ জাতীয় পত্র ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণ করাকে ব্যাংকিং গ্রহণযোগ্যতা বলা হয়। মূলত পেশকৃত বিলের ব্যাপারে ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষমতাকে যে ক্ষমতা বিলটিকে সহজ লেনদেনযোগ্য অথবা অন্য ব্যাংক কর্তৃক মেয়াদের পূর্বে নগদায়নকালে কর্তনযোগ্য করে তোলে, তাকেই ব্যাংকিং গ্রহণযোগ্যতা বলে। যেহেতু এ প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত "ওকালত" বা জামিনদারি পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়, সেহেতু এ সেবার বিনিময়ে ব্যাংকের গৃহীত অর্থ পারিশ্রমিকের মর্যাদা লাভ করে, যা সুদের পর্যায়ে পড়ে না।

প্রামাণ্য ঋণপত্র

প্রামাণ্য ঋণপত্র ব্যাংকে গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন ধরনের নিশ্চয়তাসূচক নির্দেশনা, যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা ও প্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী তৃতীয় কোন পক্ষকে অর্থ প্রদান অথবা গ্রহণ কিংবা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক উত্তোলিত বিল ক্রয় অথবা তার পেশকৃত প্রত্যয়নপত্র কিংবা কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশনা ও শর্ত বাস্তবায়ন সাপেক্ষে অপর এক পরে অনুকূলে বিল ভাঙ্গানো, গ্রহণ করা, অথবা ক্রয় করা এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংকের প্রামাণ্য ঋণপত্র বিষয়ক লেন-দেনে দীনী উপকরণের অনুপস্থিতি এ প্রক্রিয়া লব্ধ ব্যাংকের পারিশ্রমিকে সুদের অনুপ্রবেশে সহায়তা করে। তবে ব্যাংকের অর্জিত অর্থকে কাজের বিনিময়ে অথবা

---

৩৮. সামী হামুদ, *তাত্বীরুল আ'মাল আল মাছরাফিয়্যাহ বিমা ইয়াততাফিকু ওয়াশ শরীয়াতুল ইসলামীয়াহ*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩২২।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উপকার সাধনের বিনিময়ে গৃহীত পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ ঋণপত্র ভিত্তিক লেন-দেনে দ্বীনি অনুশাসন ও নির্দেশনা না থাকায়, ব্যাংকের অর্জিত পারিশ্রমিকের মধ্যে সুদ বিষয়ক সন্দেহ থেকে যায়।

মুদ্রার বিলম্বিত ক্রয়

ব্যাংকের একজন গ্রাহক কিছু বিদেশী মুদ্রা ক্রয়ের জন্য পরবর্তী নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে উত্তোলন করার শর্তে ব্যাংকের সাথে আগাম চুক্তিবদ্ধ হতে পারে এবং ক্রয়কৃত মুদ্রার Forward rate বা আগাম মূল্য বর্তমান মূল্যের সমান, বেশি অথবা কম হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে মুদ্রার বিলম্বিত ক্রয় বলা হয়। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, স্থানীয় ও বিদেশী মুদ্রাদ্বয়ের নিজ নিজ দেশের কেন্দ্রীয় মুদ্রামান অনুযায়ী বিনিয়োগকৃত মুদ্রা দুটির বর্তমান নগদমূল্য ও বিলম্বিত নগদ মূল্যের তারতম্যের কারণে প্রত্যাশিত লভ্যাংশের মধ্যেও তারতম্য ঘটে। মূলত এ থেকেই মুদ্রার বিলম্বিত মূল্যের সঙ্গে সুদের সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। এক্ষেত্রে মুদ্রা দুটির সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রামানের হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে বিরাজমান লভ্যাংশের পরিমাণগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুদের হ্রাসকৃত অথবা বর্ধিত হারে আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৪০]

গ. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকগুলোর মত যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তবে পার্থক্য হচ্ছে এ যে, সুদী ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী শরীয়াহ অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক তার যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করে এবং করতে বাধ্য থাকে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজের অংশগ্রহণ করে।

ইসলামী ব্যাংক যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে এক নজরে তা হচ্ছে :

১. আমানত গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং পুঁজি গঠন করা।
২. ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।
৩. বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় কার্যক্রম সম্পাদন করা।
৪. যাবতীয় ব্যাংকিং সেবা তথা টিটি, ডিড, পে-অর্ডার ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা।
৫. জনগণ/গ্রাহকদের মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও দলিলপত্র নিরাপদ সংরক্ষণের জন্যে লকার সুবিধা প্রদান করা।
৬. যাকাত তহবিল গঠন করে তা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে বিতরণ করা।
৭. সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।
৮. অসহায় ও গরীব লোকদের প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করা।
৯. অর্থনৈতিক অন্যান্য কার্যাবলী।

তবে একটু বিস্তারিত আলোচনায় যা প্রতিফলিত হয়।

---

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুদী আমানতের বিকল্প হিসেবে বিনিয়োগযোগ্য আমানত

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রচলিত ব্যাংকিং ধারায় জমাকৃত আমানতি অর্থের বিপরীতে প্রদত্ত লভ্যাংশই সুদ, যা অবৈধ। এখান থেকে বলা যেতে পারে, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাপনায় গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত মতাবলে বিনিয়োগযোগ্য আমানতি অর্থই উক্ত সুদের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে।

মুদারাবা[৪১]

ফিকহের পরিভাষায় মুদারাবার সংজ্ঞা হলো, দুটি পক্ষের চুক্তি যাতে এক পক্ষ অপর পক্ষকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের বিনিময়ে ব্যবসার নিমিত্তে অর্থ যোগান দেয়। এতে এক পক্ষ অর্থ যোগান দেয় যাকে রাবুল মাল বলা হয়, আর অপর পক্ষকে বলা হয় মুদারিব, যাকে এ অর্থের বিনিয়োগ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উভয় পক্ষের মধ্যে লাভের পরিমাণ বণ্টন করা হবে তাদেরই চুক্তি অনুযায়ী যা সমুদয় লাভের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বা অন্য যে কোনা পরিমাণ হতে পারে। মুদারাবার বৈধতার শরয়ী দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (স) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন তখন লোকেরা এরূপ মুদারাবা লেন-দেনে লিপ্ত ছিল। হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের এ লেন-দেনের স্বীকৃতি দিলেন এবং তিনি নিজেই নবুয়ত প্রাপ্তির পর তার স্ত্রী খাদিজা (রা) সম্পদকে মুদারাবা ব্যবসায় নিয়োজিত করেছিলেন। এরূপ লেন-দেনের বৈধতার ব্যাপারে শরীয়ত বিশারদদের ঐকমত্য রয়েছে। কুরআনেও অনেক আয়াত রয়েছে, যা ফিকহ বিশারদগণ মুদারাবার বৈধতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

মুদারাবার লেন-দেনের বিশুদ্ধতার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে :

১. উদ্যোক্তা ও অর্থের মালিকের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী অর্জিত লভ্যাংশ হতে হবে অংশীদারিত্বমূলক যাতে একজন তার শ্রমের বিনিময় পায়, অপরজন তার পুঁজির বিনিময় পায়।

২. মুদারাবার ফলে উভয় পরে অর্জিত লভ্যাংশের কে কত পাবে তা যেন নির্দিষ্ট থাকে। যেমন- অর্ধেক হারে, এক চতুর্থাংশ হারে, এক তৃতীয়াংশ হারে, এক ষষ্ঠাংশ হারে। তবে যদি তাদের উভয় পক্ষের অংশ অজ্ঞাত থাকে তাহলে মুদারাবা অবৈধ হবে। আর যদি উভয় অংশ বা একটি অংশ সমুদয় লাভ থেকে এভাবে পরিমাণ নির্ধারিত হয়-যেমন বলা হল, তোমাকে পঞ্চাশ অথবা একশত টাকা দেয়া হবে। তাহলে মুদারাবা অবৈধ হবে।

৩. এ চুক্তিকে কোন সময় নির্দিষ্ট থাকবে না, যদি করা হয় তবে তা ইজারায় পরিণত হবে।

উপরিউক্ত শর্তাবলি চুক্তিতে সংরক্ষিত হলে চুক্তিটি বৈধতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে উভয়কে চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ ভাগ করে নিতে হবে। তবে ব্যবসায়ে লোকসান হলে ছাহেবুল মাল বা পুঁজি সরবরাহকারীকে

---

৪১. বলা হয়ে থাকে, আল মুদারাবা বা আল কেরাজ ঃ মুদারাবা ইরাকীদের নামকরণ। হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাবের কিতাবগুলোতে এ নাকরণের বহুল প্রচলন রয়েছে। অপরদিকে আল কেরাজ অথবা আল মুকারাজা হেজাযীদের নামকরণ। শেষোক্ত নামকরণটি মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবগুলোতে বহুল ব্যবহৃত।
দেখুন– ড. আসাসিদ্দিক আদ্দবীর, 'আশকাল ওয়া আসালিবুল ইসতেছমার ফিল বুনুকিল ইসলামীয়াহ' শীর্ষক প্রবন্ধ যা কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ১২/১২/১৯৮০ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসানের দায়ভার নিতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রম বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তাকে লোকসানের কোন কিছুই বহন করতে হবে না। কারণ তার শ্রমই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিবেচিত হবে।[৪২]

মুশারিকা বা শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারী কারবার)

মুশারিকা হলো এমন একটি ব্যবসায়িক চুক্তি যাতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে সম্পন্ন হয়। এ চুক্তিতে তারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসার নিমিত্তে মূলধন সরবরাহ করবে এবং নির্দিষ্ট হারে পরস্পরের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন করে নেবে। মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শেষোক্তটিতে অর্থাৎ মুদারাবার ক্ষেত্রে এক প অর্থ সরবরাহ করবে অপর পক্ষ শ্রম বিনিয়োগ করবে, কিন্তু মুশারিকা (শিরকাতুল ইনান) এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগ করবে, অতঃপর উভয় অংশীদারের মধ্যে লাভের অংশ নির্দিষ্ট থাকবে। যেমন-এক তৃতীয়াংশ, দুই তৃতীয়াংশ ইত্যাদি হারে নির্দিষ্ট হতে হবে। তবে ব্যবসায়ীক লোকসানের দায়ভার সকল পক্ষকে বহন করতে হবে এবং মূলধনের আনুপাতিক হারে তাদের মধ্যে লোকসানের দায়ভার বণ্টন হবে।[৪৩]

হ্রাসমান অংশীদারিত্ব (মুশারাকান্তে মালিকানা প্রদান)

হ্রাসমান অংশিদারিত্ব হলো, যে অংশীদারী ব্যবসায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অপর অংশীদারকে উভয়ের সম্মত চুক্তির ভিত্তিতে এক সঙ্গে বা পর্যায়ক্রমে মালিকানার অধিকার প্রদান করেন। এ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও ভিত্তি অনুযায়ী ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত পুঁজির অংশ পরস্পরের ব্যবসায় অর্জিত লভ্যাংশ থেকে নিয়মতান্ত্রিক ও শৃংখলিতভাবে প্রত্যাহার করার মাধ্যমে ব্যাংক তার অংশ উত্তোলন করতঃ মালিকানা অপরপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে।

ক্রয়ের নির্দেশ সাপেক্ষে বাইয়ে মুরাবাহা

এ পদ্ধতিতে একজন গ্রাহক তার প্রয়োজনীয় একটি পণ্য ক্রয়ের নিমিত্তে পণ্যের গুণাগুণ, ধরন ইত্যাদি বিবরণী সম্বলিত একটি ক্রয় প্রস্তাব ব্যাংকে দিল, ব্যাংক পণ্যটি ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করতঃ গ্রাহকের নিকট চুক্তি অনুযায়ী মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয় করবে এবং গ্রাহক পণ্যের মূল্য তার সামর্থ্যানুযায়ী কিস্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করবে।[৪৪]

এ প্রক্রিয়াটি শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ, 'যার কাছে যা নেই তা বিক্রি করার' হুকুমের আওতায় পড়ে না। কেননা এ পরিস্থিতিতে ব্যাংক তার মালিকানাভুক্ত নয় এমন কিছু বিক্রয় করছে না। অথবা ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত পণ্যটির বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে না যে, তাকে তার বিরুদ্ধে তার মালিকানাভুক্ত নয় এমন কিছু বিক্রয়ের মত শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। বরং এ প্রক্রিয়াটি মূলত ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি ও মুরাবাহাভিত্তিক বিক্রয় সংক্রান্ত উপাদান দুটির যৌগিক উপস্থিতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এখানে ব্যাংক ক্রয়ের একটি নির্দেশনা পেয়ে থাকে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে পণ্যটি ক্রয় করে। অতঃপর ক্রয়কৃত পণ্যটিকে নির্দেশদাতা গ্রাহকের

---

৪২. বিস্তারিত দেখুন : সামী হাসান হামুদ, তাতবীরুল আ'মাল আল মাছরাফিয়া বিমা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ শরীয়াতুল ইসলামিয়াহ, প্রাগুক্ত।

৪৩. ড. আসছিদ্দিক আদ্দরীর, প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

৪৪. ইসলামী ব্যাংকের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিশ্বকোষ, ১ম খ.।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট উপস্থাপন করে যাতে গ্রাহক তার বিবরণ অনুযায়ী পণ্যটি যাচাইপূর্বক চুক্তি সম্পাদনের দিকে অগ্রসর হয়। আর এ প্রক্রিয়াটি অনিশ্চিত পণ্য বিক্রয় করে মুনাফার্জনের আওতায় পড়ে না। কেননা ব্যাংক ক্রয় করে পণ্যটির মালিকানাস্বত্ব গ্রহণ করেছে যার ফলশ্রুতিতে গ্রাহকের নিকট পণ্য হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন প্রকার ক্ষতি তাকেই বহন করতে হবে।[৪৫]

ঘ. ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু অতিরিক্ত কার্যক্রম

প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

যেখানে প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সরাসরি বিনিয়োগে যেতে পারে না সেখানে ইসলামী ব্যাংক অনেকাংশে গ্রাহকদের প্রদত্ত বিনিয়োগ ক্ষমতা বলে আমানতি টাকার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে। এ ধরনের বিনিয়োগের জন্য প্রাপ্ত টাকা ও প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ক্রেসমূহের মধ্যে সমন্বয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এভাবে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি অনন্য দিক হিসেবে বিবেচিত।

অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়ন

ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রমে সুদী ঋণ অনুপস্থিত থাকায় অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়নের এক বিশেষ ইসলামী বিকল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়ন কলকারখানা বা কোম্পানি স্থাপনের মত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হতে পারে। অথবা বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতায় অব্যাহত ধারার বিনিয়োগও হতে পারে। আবার শ্রমিকের জন্য পুঁজি সরবরাহের প্রয়োজনে নিবেদিত বিনিয়োগও হতে পারে।

যাকাত

ইসলামী ব্যাংকের সমাজ কল্যাণ ধর্মী বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন হিসেবে যাকাত আহরণ ও শরীয়তসম্মত খাতে ব্যয় করার বিষয়টি ইসলামী ব্যাংকের অর্থব্যবস্থাপনার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। যাকাত ইসলামের একটি স্তম্ভ এবং অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় কর্তব্য। যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের মূল লক্ষ্য ইসলামী নীতি আদর্শ বাস্তবায়ন সেহেতু যাকাতের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য পালনে তাকে ভূমিকা রাখতে হবে। মূলত ইসলামী ব্যাংকের অর্থ ব্যবস্থাপনায় ইসলামের এ মৌলিক চিন্তাদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ও এর প্রায়োগিক অনুশীলন ও বাস্তবায়নের আবশ্যকতা প্রশ্নাতীত।

এরই আলোকে ইসলামী ব্যাংক যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে থাকে এবং সংগৃহীত অর্থ যাকাত ফান্ডে জমা করে থাকে। এ ফান্ডটি ইসলামী ব্যাংকে অন্যান্য কার্যক্রম থেকে ভিন্ন একটি পরিচালনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হবে এবং শরীয়তের নির্দেশনানুযায়ী এ থেকে অর্থ ব্যয় করা হবে। যেহেতু যাকাত ইসলামের অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় একটি ইবাদত এবং যেহেতু যাকাত প্রদান সেই স্পৃহা ও অনুভূতির তাড়নায় হওয়া উচিত, সেহেতু ইসলামী ব্যাংক অযাচিতভাবে তার গ্রাহকদের কাছ থেকে তাদের নির্দেশনা ব্যতিরেকে তাদের গচ্ছিত আমানতি অর্থ থেকে যাকাত কর্তন করার অধিকার রাখে না।[৪৬]

---

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. ড. আহমাদ আন নাজ্জার ও সতীর্থ, ১০০ সুয়াল ১০০ জোয়াব হাওলাল বুনুকীল ইসলামিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতামূলক ইসলামী বীমা

ইসলামের সামাজিক সহমর্মিতা ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের আদর্শিক দর্শনের প্রতিফলন হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের অর্থব্যবস্থাপনায় সমাজকল্যাণধর্মী দায়বদ্ধতার কারণে ইসলামের নির্দেশ পন্থায় সম্ভাব্য বিপদাপদ বিষয়ে তার পক্ষ থেকে বীমা কার্যক্রম পরিচালনা বাঞ্ছনীয়। ইসলামী শরীয়ত বিশারদরা প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এটিকে সুদ, ঝুঁকি, প্রবঞ্চনা, জুয়াবাজি ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সহযোগিতামূলক বীমা ব্যবস্থার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায়, এটি যেন এমন এক ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় এমন কিছু লোকের কল্পনা করা যেতে পারে যারা বিশেষ ধরনের ক্ষতির আশংকা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার তাগিদে কিছু নীতির প্রবর্তন করেছে এবং একটি সমবায় গঠনের জন্য নগদ কিছু অর্থ প্রদান করেছে। তাদের মধ্যে যে কেউ আক্রান্ত হলে জমাকৃত টাকা থেকে তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তবে তাদের তহবিলে জমাকৃত টাকা যদি লোকটির ক্ষতিপূরণে যথেষ্ট না হয় তখন তারা পুনরায় অর্থায়ন করবে। তবে এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকলে তা তাদের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়, অথবা ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে রেখে দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলো কোন লাভের অনুসন্ধান করছে না। বরং তারা পরস্পরকে দায়িত্ববোধের ও কল্যাণবোধের স্পৃহায় সহায়তা করছে।[৪৭]

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সহযোগিতামূলক বীমা সংস্থার পক্ষে তার জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত অংশ শরীয়তের নির্দেশানুযায়ী যে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে। অতঃপর বিনিয়োগ লব্ধ অর্থকে বীমা গ্রাহকদের অংশ অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ব্যাংকের এরূপ শরীয়তসম্মত সহযোগিতামূলক বীমা পলিসি শরীয়ত বিশারদ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রচলিত বীমা ব্যবস্থাপনার বিকল্প, যদ্বারা এরূপ অর্থ ব্যবস্থাপনার যৌক্তিক প্রয়োজনকে পূরণ করা হয়েছে।

করজে হাসানা

ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেসব ঋণ প্রদান করে থাকে, সেগুলির প্রকৃত নাম হল করজে হাসানা। করজে হাসানায় অর্থের উৎস হলো যাকাত, স্বেচ্ছাদান, সদকাহ, অনুদান ইত্যাদি লব্ধ অর্থ এবং ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত লাভের অতিরিক্ত অর্থ থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ যা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করজে হাসানা হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে।

যদি একজন করজে হাসানার গ্রাহক কোন এক সমস্যা বা জটিলতার কারণে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত আল কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وان كان ذو عسرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون-

যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি মা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।[৪৮]

---

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৪৮. সূরা বাকারা : ২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সরাসরি অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক যুগ সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত মানব কল্যাণমুখী কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

১. মসজিদ ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প।
২. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।
৩. দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র বৃত্তি প্রকল্প।
৪. মায়ানমার (বার্মিজ) মুহাজিরদের মধ্যে রিলিফ বন্টন।
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে তরিৎ সাহায্য প্রেরণ ও পুনর্বাসন।
৬. বসনিয়া হার্জেগোভিনায় নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য প্রেরণ।
৭. সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় দুর্যোগকালীন মজবুত আশ্রয়স্থল নির্মাণ।
৮. বেসরকারী সেবা সংস্থাসমূহের সহযোগিতা প্রদান।
৯. প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্য প্রেরণ।
১০. দরিদ্র অভিজাত শিক্ষকদের চিকিৎসা সাহায্য দান।
১১. কর্জে হাসানা প্রদান।
১২. পরিবেশ দুষণমুক্তকরণে সহযোগিতা প্রদান।
১৩. বেকারত্ব দূরীকরণে সহযোগিতা প্রদান।
১৪. ইয়াতিম মিসকীন দুঃস্থ ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন।
১৫. দরিদ্র পরিবারে কন্যাদায়গ্রস্তদের বিবাহে সাহায্য প্রদান।
১৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে খাদ্য ঔষধ বিতরণ।

মোটকথা একযুগ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ব্যাপক মানব কল্যাণধর্মী তৎপরতা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ সকল কল্যাণমুখী কর্মতৎপরতা গণজীবনে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, ব্যাংকসমূহের প্রতিষ্ঠাচুক্তিসমূহ গতিময় হওয়া প্রয়োজন। যাতে করে একটি ব্যাংক তার স্ট্র্যাটেজি বা ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োজন অনুযায়ী প্রণয়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা আইনের আওতার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন যাতে না হয়, এরূপ গতিময়তা ব্যাংকের জন্যই ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। ব্যাংকের নেতৃপর্যায়ের কর্মকর্তারা ব্যাংকের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে। সাধারণত একটি ব্যাংকের সাফল্য বিচার করতে হলে সে ব্যাংকের গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকের বাজেট, লাভ, লোকসান বিষয়ক রিপোর্টের (সাধারণত অপ্রকাশিত থাকে) উপর ভিত্তি করে করা হয়। যে কোন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা নীতির পক্ষে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং পরিচালনা কৌশলের অমুখাপেক্ষী হওয়া অসম্ভব। তাই ব্যাংকগুলোকে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগের স্বার্থে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালিত করে একটি সফল ও লাভজনক ব্যাংকে রূপান্তরিত করার প্রতি অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : তিন
প্রাক-ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা

বিভিন্ন নবী-রাসূল (সা.)-এর যুগে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ পদ্ধতি

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন, হারাম করেছেন সুদকে। ব্যবসায় বা অর্থনৈতিক লেনদেনে হালাল পদ্ধতিগুলো পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে আসমানী কিতাব, সহীফাহ্ এবং নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানবজাতিকে অবহিত করা হয়েছে। কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বৈধ, কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ অবৈধ তা রাসূলগণ তাদের স্ব স্ব উম্মাহকে তখনকার প্রেক্ষাপটে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই শরীয়াহ্'র ভিত্তি বা দিক-নির্দেশনা কখনো হয়েছেন সরাসরি নবী-রাসূলগণ আবার কখনো হয়েছে তাদের গ্রন্থসমূহ। তাদের অনুসারীগণ কৃষি এবং ব্যবসায় দ্রব্যাদি বিনিময় করতেন ব্যক্তি বা কোন এলাকার চাহিদার উপর ভিত্তি করে। পশু সম্পদ, মৎস সম্পদ তারা যোগাড় করতো তাদের রুচি ও আগ্রহের মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করে। এ পদ্ধতিতে হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), ইউসুফ (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.)সহ সকল নবী-রাসূলগণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন বিনিয়োগ সঞ্চয় ও ভোগ করেছেন। নবীগণ তাদের উম্মাহকে সরাসরি এই পদ্ধতিতে গাইড করেছেন।

হযরত আদম (আ.)

হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে সৃষ্টি করার পর অর্থনৈতিক শরীয়াহ্'র দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন।আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وقلنا يادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين- فازلهما الشيطن عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع الىحين-

> এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে থাক। কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে সেখান থেকে পদস্খলিত করে। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন তা থেকে তাদেরকে বের করে দিলো এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে এবং লাভ সংগ্রহ করতে হবে।[১]

আল্লাহ তা'আলা ولا تقربا هذه الشجرة বলে সেদিন জান্নাতে আদম ও হাওয়াকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শরীয়াহ্ পালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। শরীয়াহ্'র মানদণ্ডে অকৃতকার্য হয়ে আদম (আ.) ও তার স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.) সেই গাছের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। সেদিন তারা শরীয়াহ্'র পথনির্দেশের আলোকে তাদের চিন্তা, বিশ্বাস, সময় এবং চাহিদাকে বিনিয়োগ করতে পারেননি। যার ফলশ্রুতিতে তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়। قلنا اهبطوا منها جميعا-

> আল্লাহ বলেন, আমি হুকুম করলাম তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও বা জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও।

---

১. সূরা বাকারা : ৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত নূহ (আ.)

হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের লোকেরা (যারা ঈমান গ্রহণ করেনি) তারা মনে করতো, গরীব এবং দুস্থ লোকরাই শুধু নূহ (আ.)কে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা মনে করতো, তারা নিকট শস্যভাণ্ডার রয়েছে যেগুলোর জন্য গরীবরা তার নিকট ঈমান গ্রহণ করতে যেত। সে সময় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল উচ্চবিত্ত লোকদের হাতে। এ উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর নেতারা নিম্নবিত্ত লোকদের ঘৃণার চোখে দেখতো। মুল কারণ ছিল অর্থের প্রাচুর্য্য। কিন্তু ইসলামী অর্থনৈতিক শরীয়াহ্ অর্থনীতি সম্পর্কিত। এই নীতিকে কঠিনভাবে সমালোচনা করে নির্দেশনা প্রদান করে। আল কুরআনে বিষয়টি বিধৃত হয় এভাবে :

فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نرك الا بشرا مثلنا وما نرك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادى الراى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كذبين- قال يقوم ارءيتم ان كنت على بينة من ربى واتنى رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كرهون- ويقوم لا اشئلكم عليه مالا ان اجرى الا على الله وما انا بطار دالذين امنوا انهم ملقوا ربهم ولكنى اركم قوما تجهلون- ويقوم من ينصرنى من الله ان طردتم افلا تذكرون- ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول انى ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما فى انفسهم انى اذا لمن الظلمين-

জবাবে তার জাতির সরদারেরা-যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল তারা বলল, আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর তো কিছু নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের লোকদের মধ্যে যারা হীন-নীচ তারাই না ভেবে না বুঝে তোমার পথ অবলম্বন করেছে। আর আমরা এমন কোন জিনিসই দেখতে পাই না, যাতে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র অগ্রসর। বরং আমরা তো তোমাদের মিথ্যুকই মনে করি।

সে বলল, হে আমার জনগণ, একটু চিন্তা-বিবেচনা করে দেখ, আমি যদি আমার খোদার নিকট থেকে পাওয়া এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, তার পর তিনি আমাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দানে ধন্যও করেছেন, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পেলে না, এমতাবস্থায় আমার কি উপায় আছে, যদ্বারা তোমরা মেনে নিতে না চাইলেও আমরা তোমাদের উপর তা জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে পারি?

হে জাতির লোকেরা, আমি এ কাজে তোমাদের কাছে কোন মাল-সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে। আমার কথা যারা মেনে নিয়েছে, আমি তাদেরকে ধাক্কা দিতে প্রস্তুত নই। তারা নিজেরাই তাদের হুযুরে উপস্থিত হবে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, তোমরা মূর্খজনোচিত কাজ করছ।

আর হে জনগণ! আমি যদি এই লোকদের তাড়িয়ে দেই, তা হলে খোদার পাকড়াও হতে কে আমাকে বাঁচাতে আসবে? তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝতে পারছো না।

আমি তোমাদের এটা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে। না এ কথা বলি যে, আমি গায়েবকে জানি। ফেরেশতা হওয়ার দাবীও আমি করি না। আমি এটাও বলতে পারি না যে, তোমাদের চক্ষু যেসব লোককে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ দেন না। তাদের মনে অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। এ ধরনের কথা যদি আমি বলি, তা হলে আমি তো যালেম হব।[২]

আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারিত হলো তখন তারা উপলব্ধি করলো– অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা ধনী-গরীবের পাশাপাশি ঈমানের ভিত্তি অবশিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবধারিত হয়। এমনকি হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান হয়েও সেদিন মহাপ্লাবনে জলোচ্ছ্বাসে ডুবে মরে ছিল। ال ينوح انه ليس من اهلك-

সে কোন মতেই তোমার পরিবারভুক্ত হয় না।[৩]

---

২. সূরা হুদ : ২৭-৩১।

৩. সূরা হুদ : ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মূসা (আ.)

হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে ইসরাঈল বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও নিজ গোত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফিরআউনের দলে যোগ দিয়েছিল সে সময়ের প্রবল শক্তি ও প্রাচুর্যের অধিকারী কারূন। সে তার সম্পদকে আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত করতো না। শরয়ী বা আইনগত সীমা-পরিসীমার সে কোন তোয়াক্কা করতো না। নিজের খেয়াল-খুশীমত সম্পদ অর্জন, পুঞ্জিভূতকরণ এবং সম্পদের অহমিকা প্রত্যাশা করতো। হযরত মূসা (আ.) তার চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও সে আল্লাহর এই নবীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিধি-বিধানগত সার্বিক বিষয়ে বিরোধিতা করতো। কারূন এতো সম্পদের মালিক ছিল যে, তার ধন-ভাণ্ডারের চাবি বহন করতেই তিনশ খচ্চর ব্যবহার করা হতো। আল কুরআনে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে :

وابتغ فيما اتك الله الدا ر الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين- قال انما اوتيته على علم عندى اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون-

আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা দ্বারা পরকালের ঘর বানানোর চিন্তা কর, অবশ্য দুনিয়া হতেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না; আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

তখন জবাবে সে বলেছিল, এসব কিছুতো আমাকে আমার নিজের জ্ঞানের কারণে দান করা হয়েছে। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে এমন অনেক লোককেই ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়েও অনেক বেশী শক্তি ও জনবলের অধিকারী ছিল? অপরাধীদের নিকট তাদের গুনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় না।[৪]

আল্লাহর দেয়া অর্থ ব্যবহারকারীদের জন্য বিধি-বিধান হচ্ছে এই অর্থের হক আদায় করতে হবে। এই অর্থে সমাজের যে শ্রেণীর লোকের হক রয়েছে তা তাদেরকে পৌছাতে হবে।

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم-

তাদের সম্পদের অভাবী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।

এমনিক করে বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-এর সময় মূসা (আ.)-এর নিকট অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়াদির সমাধান পেতো। যখন তিনি যে সম্পর্কে সমাধান দিতেন অথবা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন সেটা তাদের মনপূত হয়নি বলে অস্বীকার করতো। সূরা বাকারার ৫৫-৫৭ আয়াতে এ ধরনের একটি চিত্রই বর্ণিত হয়েছে :

واذقلمتم يموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصعقة وانتم تنظرون- ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون- وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبت ما رزقنكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون-

স্মরণ কর, তোমরা মূসাকে বলেছিলে যে, খোদাকে নিজ চক্ষে প্রকাশ্যভাবে (তোমার সাথে কথোপকথন করতে) দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তোমার কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। এ সময় দেখতে দেখতেই এক বজ্র এসে তোমাদের উপর পড়লো, তোমরা প্রাণহীন হয়ে গেলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম; এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞ হবে বলে আশা করা গিয়েছিল।

---

৪. কাসাস : ৭৭-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

> আমরা তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করলাম, 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাম খাদ্য তোমাদের জন্য যোগান দিলাম এবং তোমাদের বললাম যে, আমরা তোমাদেরকে যে পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী দিয়েছি তা খাও; তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যা করেছে তা দ্বারা আমাদের উপর যুলুম করা হয়নি; বরং তারা নিজেরা নিজেদের উপর যুলুম করেছে।[৫]

এভাবে এ জাতিকে অর্থনৈতিক অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর দেয়া সীমা-পরিসীমা লংঘন করে তাদের মনগড়া এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর করছে। ফলশ্রুতিতে তারা নিজেরাই নিজেদের আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে। ক্ষতিসাধন করে তাদের অর্থনৈতিক জীবন প্রবাহকে।

হযরত শোয়াইব (আ.)

হযরত শোয়াইব (আ.) আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেন মাদইয়ানবাসীদের ইমানের আহবান জানানোর জন্য। মাদইয়ানবাসীর একটি জাতীয় চরিত্র ছিল যে, তারা দ্রব্য বিনিময়সহ সকল ক্ষেত্রে ওজন ও মাপে কম দিত। পরস্পর পরস্পরের প্রাপ্য ঠিক মতো দিতো না। একে অপরকে ঠকাতো, পথে-ঘাটে পথিকের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতো। রাস্তায় বসে পথচারীদের নিকট থেকে অবৈধভাবে ট্যাক্স বা শুল্কের নামে অর্থ-টাকাকড়ি কেড়ে নিতো। হযরত শোয়াইব (আ.) নবী হিসেবে প্রথমেই তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের আহবান জানান। আর তারপরই তিনি তাদেরকে জাতীয় চরিত্রের মারাত্মক দিকটি সংশোধনের জন্য বিশেষভাবে নজর দেন। তিনি বলেন, 'তোমরা ওজনে কম দিও না এবং প্রাপ্য প্রদানে ঘাটতি করো না।' ব্যাপকভাবে এ নির্দেশে উপরোল্লিখিত জাতীয় চরিত্রের সকল দিকই অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وانى مدين اخاهم شعيبا قال يقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها ذلكم خيرلكم ان كنتم مؤمنين-

> আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি আমরা তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছি। সে বলল, হে জাতির লোকেরা, খোদার দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন খোদা নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের খোদার সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। অতএব ওযন ও পরিমাপ পূর্ণমাত্রায় কর, লোকদের তাদের দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিও না এবং যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন তার সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা বাস্তবিকই মুমিন হয়ে থাক।[৬]

সিরিয়ার বর্তমান 'মোয়ান' নামক স্থানে মাদইয়ান শহর অবস্থিত ছিল। তারা গাছপালার পূজা করতো। তারা কুফর ও শিরকে সদা নিমজ্জিত ছিল।[৭] তাদের মাপে ওজন ও পরিমাণে কম দেয়ার এই ব্যাধি এমন অস্বাভাবিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যার জন্য তারা নিত্যনতুন প্রতারণার কৌশল আবিষ্কার করতো।

মাদইয়ানবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের অপকর্ম থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য, পাশাপাশি একটি গতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি তাদের প্রদান করা হয়।

---

৫. সূরা বাকারা : ৫৫-৫৭।

৬. সূরা আল আ'রাফ : ৮৫।

৭. গবেষণা বোর্ড সম্পা., আল কুরআনে অর্থনীতি, ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯০, পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হুদ ও হযরত সালেহ (আ.)

হযরত হুদ এবং হযরত সালেহ (আ.) আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছিলেন 'আদ' এবং সামুদ জাতির নিকট। আদ এবং সামুদ জাতিদ্বয় একই বংশোদ্ভূত। আদ জাতির পতন হলো নবী 'হুদ' (আ.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর হিদায়াত না মানার ফলে। এরপর 'সামুদ' জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সমৃদ্ধি ও স্থাপত্য কৌশল দান করেন; আর দান করেন সুস্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি এবং দীর্ঘ জীবন। নবী সালেহ (আ.) তাদেরকে আহবান জানান একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে, আর সৎ জীবনযাপন করতে। তাদেরকে আল্লাহ যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার জন্যও আল্লাহর শোকর আদায় করতেও তিনি তাদেরকে আহবান জানালেন। কিন্তু তারা এ আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলো। আল্লাহর প্রেরিত নবীর হিদায়াত না মেনে মু'জিযা দেখাবার দাবী জানালো। সে মু'জিযা প্রদর্শন হলে এর প্রতিও তারা কোন মনোযোগ বা বিবেচনা দেখালো না। আল্লাহর পাঠানো উষ্ট্রীকে তারা হত্যা করলো। নবীকে তারা চ্যালেঞ্জ করলো। সমতলভূমিতে বাসগৃহ নির্মাণ আর পাহাড় কেটে প্রাসাদ ও দূর্গ নির্মাণ এর এই বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তারা মোটেই যথার্থ মূল্যায়ন করলো না। ফলশ্রুতিতে আল্লাহর শাস্তি ও বিপর্যয় ডেকে আনলো। ধ্বংস হলো তারা। আল কুরআনে তাদের এ আচরণের একটি ইঙ্গিতপূর্ণ চিত্র হচ্ছে :

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم فى الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا فى الارض مفسدين-

> স্মরণ করো সে সময়ে কথা, যখন আল্লাহ আ'দ জাতির লোকদের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এবং জীবনে তোমাদের এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, আজ তোমরা তার সমতলভূমির উপর সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছ এবং পর্বতগাত্র খোদাই করে বাড়ী-ঘর বানাচ্ছ। অতএব তাঁর কুদরতের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে গাফিল হয়ো না এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।[৮]

এভাবে হযরত হুদ (আ.) এবং হযরত সালেহ (আ.) তাদের কওমকে অর্থনৈতিক লেনদেনে তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কাঠামোতে শরয়ী বিধান স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান।

হযরত ইউসুফ (আ.)

হযরত ইউসুফ (আ.)ও তাঁর কওমকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াতের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে বন্দী অবস্থায় এক গোলামের সাথে পরিচয় ঘটে। সে সময়কার রাজা একরাতে স্বপ্নে দেখলেন : 'সাতটি মোটাতাজা গাভীকে অপর সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শস্য শীর্ণ আর অন্যগুলো শুষ্ক।' গোলাম মুক্ত হওয়ার পর শুনতে পেল রাজা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কারাগারে বন্দি ইউসুফ (আ.)-এর কথা তার স্মরণ হলো। কারাগারে তাকে যে বিচক্ষণ ও ধী শক্তির অধিকারী মনে হলো তাকে তার পক্ষেই এর ব্যাখ্যা বলা সম্ভব মনে হলো। গোলাম দেরী না করে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট হাজির হয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহর সাহায্যের বলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন :

'তোমরা সাত বছর প্রাণপণে চাষাবাদ করবে। তারপর যা ফলবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, বাকী সব শস্য শীষসহ রেখে দেবে এবং এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এসব দিনের জন্য যা সঞ্চিত রেখেছিলে তা তখন তোমরা খাবে। কিন্তু অল্প পরিমাণ তোমরা বীজের

---

৮. সূরা আ'রাফ : ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য রেখে দেবে। এরপরই আসবে এমন এক বছর যখন মানুষের উপর রহমত বর্ষিত হবে, ফলে তারা রস নিংড়াবে খাদ্য ও তৈল বানানোর জন্য।'

উপরোক্ত ব্যাখ্যা রাজা শুনে সন্তুষ্ট হলেন। ইউসুফ (আ.)-এর কারাগারে বন্দির কারণ যাচাই-বাছাই করে এটা যে তার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে তা মেনে নিয়ে রাজদরবারে তাকে ডেকে পাঠালেন। বাদশাহর ইচ্ছা এবং ইউসুফ (আ.)-এর বিচক্ষণতায় তিনি দেশের ধনভাণ্ডারের রক্ষক নিযুক্ত হলেন। পরবর্তীতে একবছরের মধ্যে ইউসুফ ৯আ.) আল্লাহর ইচ্ছায় পরিকল্পিতভাবে মিশরের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হন।

হযরত ইউসুফ (আ.) রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্মে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এনে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। শরয়ী এই দৃষ্টিভঙ্গি হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরের তার কওমের মাঝে প্রতিষ্ঠা করেন। আল কুরআনে ঘটনাটি এভাবে বিধৃত হয়েছে :

يوسف ايها الصديق افتنا فى سبع بقرت سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلت خضر واخر يبست لعلى ارجع الى الناس لعلهم يعلمون- قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصد تم فذروه فى سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتى من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون- ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه ثغاث الناس وفيه يعصرون-

সে গিয়ে বলল, ইউসুফ, সত্যের মহা প্রতীক। সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী রয়েছে, সেগুলোকে অপর সাতটি ক্ষীণাঙ্গী গাভী খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি শস্যগুচ্ছ সবুজ সতেজ এবং অপর সাতটি শুষ্ক–এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাকে বল। সম্ভবত তুমি সেই লোকদের নিকট ফিরে যাবে আর তারা জানতে পারে।

ইউসুফ বলল, সাতটি বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে তোমরা চাষাবাদ করতে থাকবে। এ সময় যেসব ফসল তোমরা কাটবে তা থেকে অল্প অংশ–যা তোমাদের খোরাকীর জন্য প্রয়োজন তা বের করবে, আর বাকীগুলোকে সেগুলোর গুচ্ছের মধ্যেই রেখে দিবে।

এর পর সাতটি বছর খুব কঠিন আসবে। এ সময়ের জন্য তোমরা যে সব শস্য সঞ্চয় করে রাখবে, তা সবই একালে খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তবে শুধু তাই যা তোমরা সংরক্ষণ করে রেখেছ।

এর পর একটি বছর আবার এমন আসবে, যখন রহমতের বর্ষণ দ্বারা লোকদের ফরিয়াদ শোনা হবে, আর তারা রস নিংড়াবে।[৯]

قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم- وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين-

ইউসুফ বলল, দেশের অর্থভাণ্ডার আমার কাছে সোপর্দ করুন। আমি হিফাযতকারীও এবং আমি জ্ঞানও রাখি।

এভাবে আমরা সে দেশের উপর ইউসুফের প্রতিষ্ঠা লাভ করার পথ সুগম ও প্রশস্ত করে দিলাম। যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের বসবাস স্থান বানাবার তার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিল। বস্তুত আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে যাকেই চাই ধন্য করে দিই। সদাচারী লোকদের কর্মফল আমাদের নিকট কখনোই নষ্ট হয় না।[১০]

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে হযরত ইউসুফ (আ.) এমনি করে সেদেশের অর্থনৈতিক বিধি-বিধানকে শরয়ী দৃষ্টিতে আনয়ন করেন।

---

৯. সূরা ইউসুফ : ৪৬-৪৯।

১০. সূরা ইউসুফ : ৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

এমনি পদ্ধতিতে হযরত ইবরাহীম (আ.), লূত (আ.) ইয়াকুব (আ.), দাউদ (আ.), সোলায়মান (আ.), ঈসা (আ.)সহ সকল নবী-রাসূলের যুগে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং তাদের সমসাময়িক যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রাচীন আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাব হয় আরবে। তাই ইসলামী অর্থনীতিকে ভালভাবে বুঝতে হলে আরবের প্রাচীন অর্থনীতি সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা থাকা চাই।

ইতিহাসের সেই প্রাচীন যুগ হতেই আরব উপদ্বীপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃত। আরব হলো তিন-তিনটি মহাদেশের সঙ্গমস্থল। এ কারণেই ইতিহাসের সেই অজানা যুগ থেকে চীন, ভারত, ইরাক প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ হতে যে সব বাণিজ্য সামগ্রী ইউরোপীয় দেশসমূহে রফতানী হতো, তা ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের উপর দিয়েই বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। হিজাযের মক্কা নগরী সম্পর্কে বলা হয়- এ ছিল প্রাচীন বাণিজ্যপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন।

তাছাড়া, এই মক্কা উপত্যকার উপরই হযরত মূসা (আ.), মহাত্মা বুদ্ধ, কনফিউসিয়াস এবং সক্রেটিসের জন্মের বহু বহু যুগ পূর্বে হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রথম ঘরটি নির্মাণ করেন। এই মক্কা থেকেই ইসলামের শুভ্র কিরণ সর্বপ্রথম ভূ-দিগন্তে বিচ্ছুরিত হয়। এই মক্কার হেরা গুহায়ই অবতীর্ণ হয় কুরআনুল মজীদের প্রথম ঐশী বাণী।

আরব উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন হচ্ছে বিশ্বের আরো দুটি বিরাট ধর্ম-ইহুদি ধর্ম এবং ঈসায়ী ধর্মের জন্মস্থান।

এই ভূখণ্ডেই তাওরাত, যাবুর এবং ইনজীল নাযিল হয়েছিল। এই অঞ্চলের উপরই একদিন বিপুল বিক্রমে রাজত্ব করেছেন হযরত সুলায়মান (আ.) এবং হযরত দাউদ (আ.)।

অতি প্রাচীনকালেই ফিনিসীয় নাবিকরা সুয়েজ থেকে রওয়ানা হয়ে সম্পূর্ণ আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করতো। জিব্রাল্টার উপকূলের অপর পাড়ের দেশ লন্ডনেও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তারা তাদের জাহাজগুলো নোঙ্গর করতো। ইউফ্রেতিস এবং তাইগ্রিস নদীর কিনারে কিনারে সুমেরীয়রা সর্বপ্রথম সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। ওরা ছিল মূলত আরবেরই যাযাবর সম্প্রদায়ের লোক।

আম্মানের সামদ্রিক বন্দর ছিল একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। আজ হতে হাজার বছর পূর্বেও ইয়ামেনের অধিবাসীরা জমিতে পানি সেচের জন্য বড় বড় বাঁধ নির্মাণ এবং জলাশয় সৃষ্টি করেছিল। ইয়ামেনে মুদ্রার প্রচলন ছিল; সাবার রাণী বিলকিস এককালে সেখানে বিপুল বিক্রমে রাজ্য শাসন করতেন।

এ তো গেল প্রাচীন আরব ইতিহাসের একটি দিক। এর অন্য দিক হচ্ছে এই, রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্মকালীন সময়েও হিজাযের অন্যতম শহর তায়েফের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিল যে, সেখানে একদিকে ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে বিরোধ এবং অন্যদিকে ধনী ও গরীব শ্রেণীর পারস্পরিক রেষারেষি এবং সংঘর্ষ একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল।

মক্কার বড় বড় বাণিজ্য কাফেলা উটভর্তি বাণিজ্য বহর নিয়ে সিরিয়া কিংবা ইয়ামেনের দিকে রওয়ানা হতো। কোন কোন কাফেলার পণ্যদ্রব্য বহন করতে দু' দু' হাজার উটের প্রয়োজন দেখা দিত। কুরায়শ বংশীয় মহিলাদেরও ঝোঁক ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে। মক্কার হাশিমী সর্দারেরাও কায়সার ও কিসরার রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কিত

Dhaka University Institutional Repository

শাহী পরওয়ানা সংগ্রহ করতেন। কুরায়শ বণিকদেরকে নাজ্জাশীর রাজদরবারেও নিজেদের পণ্যসামগ্রীর কিছু অংশ উপঢৌকন হিসেবে পেশ করতে দেখা যেত। এ তো গেল দৃশ্যের একদিক; অপর দিক হচ্ছে এই, হিজাযীরা দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের ভয়ে নিজেদের সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করত। তারা কোথাও মেয়ে সন্তানকে বলি দিত আবার কোথাও জীবন্ত পুঁতে ফেলত। মালিক শ্রমিকের উপর এবং প্রভু দাসের উপর চালাত অকথ্য নির্যাতন। পুঁজিপতি এবং সুদখোর মহাজনেরা গরীব শ্রেণীর লোকদের অবাধে শোষণ করত। ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ লেগে থাকত। বছরে মাত্র চারটি মাসেই দেশের খানিকটা শান্তি বিরাজ করত।

রাসূলের আবির্ভাবকালে মদীনা ছিল কিষাণদের একটি ছোট বস্তি। সেখানকার দুটি বড় গোত্র- আওস ও খাযরাজ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে একেবারে পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ইহুদিদের ছিল একচ্ছত্র অধিপত্য। ঠিক এমনি সময়ে, রিসালতের আলোকচ্ছটায় মদীনা ঝলমলিয়ে উঠলো এবং দেখতে দেখতে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে সেই বস্তিই তিন মহাদেশব্যাপী বিস্তৃত একটি বিরাট রাজধানীতে রূপান্তরিত হলো।

হিজাযী আরব, যারা রাতদিন পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকত, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমনের সাথে সাথে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পরস্পরের বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে বিশ্বে একটি বিরাট কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। তাদের প্রতিষ্ঠিত সেই রাষ্ট্র আলেকজানডার, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখের সাম্রাজ্য কিংবা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য অপেক্ষাও ছিল বহুগুণ বড় এবং সেই রাষ্ট্রে মুসলমানরা অতি সুন্দর একটি জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল।

তায়েফের অর্থনৈতিক অবস্থা

জমিদারি প্রথায় বিনিয়োগ কার্যক্রম

তায়েফের উপর বনু আমির গোত্রের আধিপত্য ছিল; কিন্তু তায়েফের আশেপাশে বসবাস করত সাকীফ গোত্র। সাকীফ-এর লোকেরা যখন দেখল যে, সেখানে গাছপালা এবং ফলমূলের আবাদ খুব ভাল হয়, তখন তারা বনু আমির গোত্রকে বললো, এই জমি চাষাবাদের উপযুক্ত নয় বলে তোমরা মনে কর। তোমাদের ধারণা, এই জায়গাটি শুধুমাত্র দুগ্ধবতী পশু চরানোর পক্ষেই উপযুক্ত। কেননা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা এখানে ফসল উৎপাদন না করে শুধু পশু পালন করছ। অথচ, আমরা এমন এক গোত্রের লোক যাদের কাছে গৃহপালিত পশুই নেই। যদি তোমরা চাও যে, এখানে কৃষি কাজ হোক, দুগ্ধবতী পশুও চরানো হোক এবং বিনা পরিশ্রমে তোমরাও লাভবান হও তাহলে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি আমাদের দায়িত্বে দিয়ে দাও। আমরাই হাল চালাবো, গাছপালা লাগাবো, কূপ খনন করবো এবং এসব ব্যাপারে তোমাদের কোন চিন্তা বা পরিশ্রম করতে হবে না। যা করতে হয় আমরাই করবো। অথচ যখন ফল পেকে উঠবে তখন এর অর্ধেকটাই আমরা তোমদের হাতে তুলে দেব এবং শ্রমের বিনিময়ে বাকি অর্ধেকটা আমরা ভোগ করবো। বনু আমির এ কথায় সম্মত হয় এবং নিজেদের জমিগুলো সাকীফ গোত্রের দায়িত্বে দিয়ে দেয়।[১১] মোটকথা, এভাবেই বনু আমির গোত্র জমি বিনিয়োগ করে জমিদার বনে যায় এবং সাকীফ গোত্র কৃষক হয়ে শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল লাভ করতে থাকে।

---

১১. *তারীখুল কামিল, ইবনুল আসীর আল জাযারী,* ১ম খ, পৃ. ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

চামড়া শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ

তায়েফের লোকেরা শুধু কৃষিবাণিজ্যেই নয়, বরং শিল্পকর্মেও দক্ষ ছিল। তায়েফে অনেকগুলো চামড়া সংস্কারের কারখানা (Tannery) ছিল, যার ফলে সেখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়েছিল।[১২] বিখ্যাত ভৌগোলিক আল-হামদানী (মৃত্যু ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ মুতাবিক ৩৩৪ হিজরী) লিখেছেন, তায়েফ হচ্ছে জাহিলিয়া যুগের একটি বিখ্যাত নগরী। ইহাকে বুলদুদ দাববাগ বা চামড়া সংস্কারকদের শহর বলা হতো।[১৩] সমাজের মহাজন শ্রেণীর লোকরা এ ধরনের শিল্পকারখানার মালিকদের মাঝে অর্থ বিনিয়োগ করতো। তারা লাভ করতো বিশাল মুনাফা।

অন্যান্য পেশা ও কর্মে বিনিয়োগ

তায়েফ যখন কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত ছিল তখন তায়েফের বিভিন্ন শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী লোকেরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে সম্পদশালীতে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক বালাযুরী বলেন, তায়েফের কয়েকজন ক্রীতদাস রাসূলুল্লাহর খিদমতে এসে উপস্থিত হয়। এদের একজনের নাম ছিল আল-আরযাক। সে রোমীয় ক্রীতদাস ছিল এবং কর্মকারের কাজ করত।[১৪] এতে বোঝা যায়, তায়েফে কর্মকারেরাও বসবাস করতো।

গায়লান বিন সালমা আস সাকাফীর অনুরোধে শাহ-ই-ইরান দূর্গ নির্মাণের জন্য একজন ইরানী স্থপতিকে তায়েফে প্রেরণ করেছিলেন। সেই স্থপতিই তায়েফের সর্বপ্রথম দূর্গটি নির্মাণ করেন।[১৫]

তায়েফে অন্যান্য পেশাদার লোকের সাথে চিকিৎসকেরাও বসবাস করত। যখন নবী করীম (স.) নবুয়ত ঘোষণা করেন, তখন বনু আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে দাবী করেছিল।[১৬]

তায়েফে হারস বিন কালদাহ নামে আরও আরেকজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত ইরানে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। তিনি সেখানেই প্রথম চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করেন এবং বিভিন্ন রোগ ও সেগুলোর ঔষধ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। এই চিকিৎসক রাসূলুল্লাহর যুগ, খিলাফতে রাশেদার যুগ এবং এরপরেও জীবিত ছিলেন। রোগের চিকিৎসা করানোর জন্য তার বাড়ীতে প্রচুর লোক সমাগম হতো।[১৭]

তায়েফে আঙুর ফলের প্রাচুর্য ছিল। তাই সেখানে নিয়মিত মদ্যশালারও পত্তন হয়। এও জানা যায়, আজকালকার পানশালাগুলোর মতো তখনকার পানশালাগুলোতেও ভোগ-বিলাসী গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রমোদবালা সরবরাহ করা হতো। আবু সুফিয়ান বিন হরব জাহিলিয়া যুগে তায়েফে গিয়ে আবু মরিয়ম সালোলী নামক একজন মদ্য ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করলে তার ভোগের জন্য সামিয়া

---

১২. *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম*, ৪র্থ খ.।

১৩. *কিতাবু সিফাতি জাযিরাতুল আবর*, আল-হামদানী, পৃ. ১২০।

১৪. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরী, পৃ. ৫৬।

১৫. *কিতাবুল আগানী*, ২য় খ., পৃ. ৪০।

১৬. *তারীখে তাবারী*, পৃ. ১১৪৬।

১৭. *উয়ুনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিকা ইবনে আবি সাব'আ*, ১ম খ., পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে পেশ করা হয়। শেষ পর্যন্ত ঐ স্ত্রীলোকটি আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে গর্ভধারণ করে।[১৮]

সূদী ব্যবসায় বিনিয়োগ

ঐতিহাসিক বালাযুরীর মতে, তায়েফের লোক ছিল অতিমাত্রায় সূদখোর।[১৯] সূদখোরীই ছিল সেখানকার কোন কোন লোকের একমাত্র পেশা। তাদের এই সূদী ব্যবসা শুধু তায়েফ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, মক্কাবাসীদেরকেও তারা সূদী ঋণ দিত। তারা মূলধনের সূদ নগদ অর্থে অথবা অন্য কোন বস্তুর মাধ্যমে আয় করতো। তফসীরে তাবারীতে আছে, সাকীফ সম্প্রদায়ের লোকেরা কুরায়শের একটি শাখাগোত্র বনু মুগীরাকে ঋণ দিত। ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হলে বনু মুগীরার লোকেরা বলত, আমরা সূদের পরিমাণ আরো কিছু বাড়িয়ে দেব, শুধু তোমরা আমাদের আরো কিছু সময় দাও। এ পদ্ধতিতে তারা সুদভিত্তিক বিনিয়োগ করতো বিধায় লাভ আদায় করতো অনেক সময় ৪/৫ গুণ বেশী। যেমন :

প্রথম বছর ১০০ দিরহাম করার কথা থাকলে, দ্বিতীয় বছরে ২০০ দিরহাম আদায় করা হতো। আর দ্বিতীয় বছরও ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে তৃতীয় বছর ঋণ গ্রহণকারীকে দিতে হতো ৪০০ দিরহাম। মোট কথা, সময় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে প্রত্যেক বছরই সূদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকতো।

তায়েফের মহাজন প্রথায় বিনিয়োগ

সাকীফ সম্প্রদায়ের চার সহোদর ভ্রাতা-মাসউদ, আবদে ইয়ালীল, হাবীব এবং রবীয়া সূদী বিনিয়োগের মাধ্যমে মহাজন হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এদের পিতার নাম ছিল আমর বিন উমায়র আস সাকাফী। এই সাকাফী ভ্রাতারাই বনু সুগীরা সম্প্রদায়কে ঋণ দিত।[২০] এদের সূদী কারবারের একটি মোকদ্দমা এতই দীর্ঘ দিন চলতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত এটাকে উপলক্ষ করে ওয়া যারু মা বাক্বিয়া মিনার রিবা (এবং বাকী বকেয় সূদ ছেড়ে দাও) আয়াত নাযিল হয়। বিস্তারিত ঘটনা এই যে, উমায়র আস সাকাফীর চার পুত্র মাসউদ, আবদে ইয়ালীল, হাবীব এবং রবীয়া বনু মুগীরা সম্পদ্রায়ের কাছ থেকে সুদ আদায় করত। যখন রাসূলে করীম (স.) তায়েফে যান তখন এই চার ভাইও ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে বনু মুগীরার কাছে তারা সূদের অর্থ দাবী করলে বনু মুগীরা পরিষ্কার উত্তর দেয়, ইসলামে সূদের কোনো কারবার নেই, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য এটাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত, সাকীফ ভ্রাতারা এই মোকদ্দমাটি উত্তাব ইবনে উসায়েদ (রা.)-এর কাছে পেশ করে। তিনি রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মক্কার বিচারক এবং শাসনকর্তা ছিলেন। উত্তাব (রা.) উভয় পক্ষের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে তা রাসূলুল্লাহর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। সূদের অংকটি ছিল খুব বৃহৎ এবং এরই উপর কুরআনের আয়াত- এবং বাকী বকেয়া সূদ ছেড়ে দাও' নাযিল হয়। কুরআনের হুকুম শুনে সূদী মহাজনদের অন্তরে এমনি বিপ্লব সৃষ্টি হয় যে, তারা আর কোন আপত্তি উত্থাপন না করেই সূদের বাকী অর্থ আদায় করা থেকে বিরত থাকে। তায়েফের অধিবাসীরা অত্যাধিক সুদখোর ছিল বলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সাথে চুক্তি করেন। তাতে সুদ গ্রহণ না করার

---

১৮. *তারিখুল কামিল*, ইবনুল আসীর, ৩য় খ., কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেন।

১৯. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরী, পৃ. ৫৬।

২০. *তাফসীরে তাবারী*, ৪র্থ খ., পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

কথাও লিপিবদ্ধ ছিল। বিত্তহীনদেরকে সুদখোরদের কবল থেকে রেহাই দেয়ার উদ্দেশ্যেই রাসূল (সা.) এরূপ করেছিলেন। উক্ত চুক্তিতে সুদের কথাটি কেন উল্লেখ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে বালাযুরী বলেন :

> সুদ ও মদ্যপানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ঐ সমস্ত লোকেরা যারপরনাই সুদখোর ছিল।[২১] বালাযুরীর ওস্তাদ আবু উবায়দ কাসিম তার কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে চুক্তিপত্রের মূলধারাগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুদ সম্পর্কে ঐ চুক্তিপত্রে বলা হয়েছিল : মানুষের উপর এদের যে ঋণ পাওনা আছে তার শুধু মূলধনটাই এরা (বনু সাকীফ) পাবে।[২২]

মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থা

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ

মক্কার আশেপাশে জমি ছিল চাষাবাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বন-জঙ্গল এবং খনি-সম্পদও না থাকায় সেখানে সব সময়ই কাঁচামালের অভাব লেগে থাকত। ঐ একই কারণে সেখানকার শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হয় নি। যে দু'একটি শিল্প সেখানে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে 'দবাগত' (চামড়া তৈরী) শিল্প ছিল প্রধান। কেননা উট এবং বকরীর চামড়া সেখানে অনায়াসে পাওয়া যেত। মক্কার বণিকরা বিভিন্ন দেশের রাজ-দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদের এই শিল্পজাত দ্রব্যকেই সেখানে উপঢৌকনস্বরূপ পেশ করত। ইতিহাসে আমর বিন আসের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জাহিলিয়া যুগে আমর বিন আস কুরায়শের দূতরূপে আবিসিনিয়ায় গমন করেন। তিনি সেখানকার বাদশার সামনে যে সমস্ত উপঢৌকন পেশ করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে এই চামড়া ছিল অন্যতম। তিনি বলেন, আমি বললাম তোমরা (কুরায়শ) নাজ্জাশীর জন্যে উপঢৌকন সংগ্রহ কর। যেহেতু তিনি অনেকগুলো চামড়া খুব পছন্দকরেন, তাই আমরা তাকে দান করার জন্য অনেকগুলো চামড়া সংগ্রহ করলাম। অতপর আমরা মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হলাম। ... আমি নাজ্জাশীর সামনে গিয়ে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে সিজদা করলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, প্রিয় বন্ধু, তোমরা দেশ থেকে আমার জন্য কি কোন উপঢৌকন নিয়ে এসেছ? আমি এই চামড়াগুলো তার সামনে পেশ করলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে সেগুলো গ্রহণ করলেন।[২৩]

মক্কার দু'এক জায়গায় কোনো না কোনো সময়ে যে সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছিল, ইতিহাসে এবং হাদীসগ্রন্থে সেগুলোরও উল্লেখ আছে। যেমন রাসূলুল্লাহর ভৃত্য রাফে বলেন, আমি যমযম কূপের নিকটস্থ ঘরে বসে পেয়ালা তৈরী করতাম।[২৪]

আরবী কাব্যের যত্রতত্র তরবারি, পোশাক প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনকার যুগের বিভিন্ন কবির উক্তি দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, মক্কায় ইয়ামন থেকে পোশাক আমদানী করা হতো এবং তাকে বলা হতো আদনী (ইয়ামনী) পোশাক। এভাবে সমগ্র আরব দেশে পাক-ভারতীয় তরবারিরও খুব খ্যাতি ছিল। তুরফাহ নামক জাহিলিয়া যুগের একজন বিখ্যাত কবি বলেন, ওয়া জুলমু যাভিল কুরবা আশাদ্দু মাফাযাতান, আলাল মর-ই মিন ওয়াকয়েল হুসামিল মুহাম্মদী। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির উপর তার আত্মীয়-স্বজনদের অত্যাচার হিন্দী তলওয়ারের আঘাতের চাইতেও অধিক যন্ত্রণাদায়ক। এভাবে তারা

---

২১. *তাফসীরে তাবারী*, ৪র্থ খ., পৃ. ৫৫।

২২. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরী, পৃ. ৫৬।

২৩. *তারীখে তাবারী*, পৃ. ১৬০২।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

চামড়া শিল্প, অস্ত্র তৈরি, পোশাক শিল্পে নিজেরা অর্থ বিনিয়োগ করতো। কখনো কখনো অন্যের মাধ্যমে ভাগাভাগির মাধ্যমে বিনিয়োগ করতো।

বাণিজ্যে বিনিয়োগ

মক্কায় কোন চাষাবাদ হতো না। খোদ আল্লাহ তা'আলাই এটাকে ওয়াদী গায়রী যি যারইন (খেতবিহীন উপত্যকা) নামে অভিহিত করেছেন। এ কারণে মক্কায় সম্পদশালী লোকেরা বছরে দু'বার বাণিজ্য-সফর করত এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসত। এই সমস্ত বাণিজ্য সফরে তাদের মুনাফাও হত প্রচুর। কেননা বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশারা মক্কাবাসীদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। বায়তুল্লার প্রতিবেশী হরমের অধিবাসী এবং কাবার মুতাওয়াল্লী হওয়ার দরুন সকলেই তাদেরকে সমীহ করে চলত। এমন কি কোন কোন বাদশা মক্কাবাসীদেরকে আহলুল্লাহ (আল্লাহর পরিজন) বলে সম্বোধন করতেন।[২৫] মক্কাবাসীর এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাণিজ্য কাফেলা এসে মক্কায় তাদের অর্থ সম্পদ বিনিয়োগ করে লাভবান হতো।

হাশিম-এর বাণিজ্য ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে বিনিয়োগ

হাশিমই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি কুরায়শদের জন্য প্রতি বছর শীত ও গ্রীষ্মে দুটি সফর করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। কুরায়শ সম্প্রদায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষে পতিত হলে হাশিম ফিলিস্তিনে গমন করেন এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ আটা নিয়ে আসেন। তিনি প্রথমে এই আটা দ্বারা রুটি তৈরী করেন। অতপর অনেকগুলো পশু জবাই করে সেগুলির মাংস দ্বারা কোরমা বানিয়ে ঐ কেরামার ঝোলের মধ্যে রুটিগুলো টুকরা টুকরা ফেলে ছরীদ (মাংস ও রুটির সমন্বয়ে যে খাবার তৈরী হয়) তৈরী করেন। তিনি এভাবে তার সম্প্রদায়ের লোককে আহার করান।[২৬] এও বলা হয় যে, এই বদান্যতার ফলেই তিনি হাশিম (যে রুটি টুকরা টুকরা করে) নামে আখ্যায়িত হন। ধীরে ধীরে মক্কায় বাণিজ্য সফরের নিয়ম প্রবর্তিত হয় এবং এর মাধ্যমে কুরায়শদের অবস্থা সচ্ছল হয়ে উঠে। এ ধরনের বিনিয়োগ সামর্থ্য অন্যদের মাঝেও বিস্তার লাভ করতে থাকে।

অন্যান্য পেশায় বিনিয়োগ

ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া পশুপালনও ছিল মক্কাবাসীদের একটি সাধারণ পেশা। তারা উট এবং বকরী পালন করত। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর বাল্যজীবনে বকরী চরাতেন। রাসূলুল্লাহ্র পত্রবাহক, সিরিয়া অধিপতি কায়সারের কাছে রাসূলুল্লাহ্ যে পরিচয় প্রদান করেন তা হলো : তিনি একজন আরব, উট বকরী চরান এবং এটাই হচ্ছে তাঁর দেশের সাধারণ পেশা।[২৭] আবূ জেহেলের কয়েকটি 'ষাঁড় উট' ছিল যেগুলোকে বংশ-বিস্তার এবং যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হত।[২৮]

মুসলিম বিন কুতায়বা তাঁর 'কিতাবুল মাআরিফ' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে মক্কা এবং অন্যান্য স্থানের ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন। তিনি সেখানে বিখ্যাত সাহাবীদের পেশার কথাও উল্লেখ

---

২৫. *তাফসীরে রাযী*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৬৩০।

২৬. *তারীখে তাবারী*. পৃ. ১০৮৯।

২৭. *তারীখে তাবারী*, পৃ. ১৫৬২।

২৮. প্রাগুক্ত, প্র. ১৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তখনকার মক্কায় যে সমস্ত পেশা প্রচলিত ছিল সেগুলো হলো কাপড়, খাদ্যশস্য, সুগন্ধি, মদ্য, তিল চামড়া, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বিক্রি এবং কসাইগিরি, দরজিগিরি, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, তীর নির্মাণ, উট ও ঘোড়ার রোগের চিকিৎসা এবং জ্যোতিষীর কাজ।

ইবনে কুতায়বা এই সঙ্গে বিখ্যাত শহরবাসীদের পেশার কথাও একে একে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, আবু তালিব ছিলেন সুগন্ধি বিক্রেতা। অবশ্য তিনি কোন কোন সময় গমও বিক্রি করতেন। আবূ বকর এবং উসমান ছিলেন কাপড় বিক্রেতা। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তীর নির্মাণ করতেন। যুবায়রের পিতা আওয়ামের পেশা ছিল দরজিগিরি। যুবায়র কসাইগির করতেন। আমর বিন আল-আ'সও ছিলেন কসাই, উসমান বিন তালহা, যিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাতে কা'বার চাবি ন্যস্ত করেছিলেন, তিনিও দরজির কাজ করতেন। আবূ সুফিয়ান বিন হরব তেল এবং চামড়া বিক্রি করতেন। আবূ জেহেলের ভাই আ'স বিন হিশাম ছিলেন কামার। আ'মির বিন কুয়ায়েয কসাই এবং ওলীদ বিন মুগীরা কামার ছিলেন। উ'কবা বিন আবি মু'য়ী'ত ছিলেন মদ্য বিক্রেতা, আবদুল্লাহ বিন জাদআ'ন চতুষ্পদ জন্তু খরিদ করে পারন করতেন এবং সেগুলোর বাচ্চা বিক্রি করতেন। আমর বিন আ'সের পিতা আস বিন ওয়ায়েল ঘোড়া এবং উটের চিকিৎসা করতেন।[২৯] আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব ইয়ামন থেকে সুগন্ধি আমদানী করে হজ্জের মওসুমে তা মক্কায় বিক্রি করতেন।[৩০] হযরত খাব্বাব বলেন, আমি কামারের কাজ করতাম এবং আস বিন ওয়ায়েলকে আমি একটি তরবারি বানিয়ে দিয়েছিলাম।[৩১] মূলতঃ তারা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, অর্থ বিনিয়োগ করতো।

দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিয়োগ

প্রাচীন গ্রীক, মিসর, রোম এবং পাক-ভারতের মত জাহিলিয়া যুগের আরবেও দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। কুরাইশরা অর্ধেক দাসদাসীর মালিক ছিল। ঐ সমস্ত দাসদাসীকে অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। ইসলামের সাম্য নীতি লক্ষ্য করে ঐ সমস্ত দাসদাসীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করত তখন কুরাইশরা তাদের উপর চালাত অযথা জুলুম-নির্যাতন।

হযরত সালমান ফারসী বলেন, আমি 'রাম হরমুয' নগরীর অধিবাসী ছিলাম। লোকেরা জুলুমের বশবর্তী হয়ে আমাকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। অতঃপর আমি এক এক করে দশজন মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছি।[৩২] এভাবে তারা দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় করতো।

সূদী ব্যবসায় বিনিয়োগ

সিরিয়ার দিকে বাণিজ্য কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় মক্কার দীনারের চাহিদা বেড়ে যেত। মক্কার বণিকরা আচার-ব্যবহারে বর্তমান যুগের সুদখোরদের চাইতে অভিন্ন ছিল না। তারা প্রথম নগদ মুদ্রার কারবার করত। অতঃপর সুযোগ বুঝে ব্যবসা-বাণিজ্যেও নিজেদের পুঁজি খাটাতো। এভাবে তারা বড়

২৯. *কিতাবুল মাআ'রিয়া,* ইবনে কুতায়বা, পৃ. ১৯৩।

৩০. *তারীখে তাবারী,* পৃ. ১১৬২।

৩১. বুখারী।

৩২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বড় বাণিজ্য কাফেরার বণিকদের অর্থ সরবরাহ করত। এ ছাড়াও যারা নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করতে চাইত তাদেরকে এই সূদী মহাজনরা অর্থ দিত।[৩৩]

মক্কা নগরী ছিল হুন্ডিঘর অর্থাৎ ব্যাংকিং কেন্দ্র। সেখানে এই ব্যবসা শুরু হওয়ার পর সে অনুযায়ী নিয়মনীতিও প্রবর্তিত হয়। কোন কোন সময় সেখানে জঘন্যতম সূদী কারবার হতে থাকে। এমন কি, দীনারের বদলে দীনার, দিরহামের বদলে দিরহাম অর্থাৎ নিয়োগকৃত অর্থের শতকরা শত ভাগ সূদ নেওয়ার রীতিও প্রবর্তিত হয়। কুরআন যখন এই ধরনের ব্যবসাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে, তখন কুরাইশরা এই বলে আপত্তি উত্থাপন করে যে, এটা তো নিছক ব্যবসা ছাড়া কিছু নয়- যাতে মূলধনকে কেরায়ার (ভাড়ার) উপর খাটানো হয়।[৩৪]

মক্কার সূদী মহাজনদের বিনিয়োগ

জাহিলিয়া যুগে মক্কার অনেক লোকই সূদী কারবার করত। তন্মধ্যে হযরত আব্বাস, হযরত উসমান এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন ব্যাপক পর্যায়ের সূদী কারবারী। হযরত আব্বাসের প্রচুর অর্থ মানুষের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।[৩৫] এ কারণেই সূদী কারবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর বিদায় হজ্জের বিখ্যাত ভাষণে পরিস্কার ভাষায় বলেছিলেন ... আল্লাহ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে, সূদ সর্বতোভাবে বাতিল এবং বর্জনীয়। আর আমি সর্বপ্রথম আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সূদকে বাতিল বলে ঘোষণা করছি।[৩৬]

জাহিলিয়া যুগে হযরত আব্বাস এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ যে পদ্ধতিতে সূদী কারবার করতেন তা পর্যালোচান করলে মনে হয়ে যে, তা আজকালকার কোম্পানী কিংবা সমবায় পদ্ধতির (Co-operative system) মতই ছিল। তাদের এই কারবার শুধু মক্কা নগরীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে তায়েফবাসীরাও সূদী ঋণ গ্রহণ করত বলে জানা যায়। জাহিলিয়া যুগে হযরত আব্বাস এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ পরস্পর সমবায়ের ভিত্তিতে সূদী কারবার করতেন এবং সাকীফ সম্প্রদায়ের বনু আমর বিন উমর গোত্রকেও তাঁরা সূদী ঋণ দিতেন। ইসলামের আবির্ভাবের পরও মানুষর নিকট তাদের বিরাট পরিমাণ সূদ পাওনা ছিল।[৩৭] কিন্তু সূদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় তাদের সমস্ত পাওনা বাতিল হয়ে যায়।

নৌযান ব্যবহারে বিনিয়োগ

জেদ্দা বন্দর থেকে আবিসিনিয়া পযর্ন্ত নৌযানের ভাড়া ছিল অর্ধ দীনার। যে সমস্ত মুহাজির জেদ্দা থেকে আবিসিনিয়া গিয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক তাবারী লিখেছেন, দুটি বাণিজ্য জাহাজ বন্দরে ভিড়ল এবং তাঁদেরকে অর্ধ দীনার ভাড়ায় আবিসিনিয়া নিয়ে গেল।[৩৮] এভাবেও পুঁজিপতিরা নৌযানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে অর্থসম্পদ উপার্জন করতো।

---

৩৩. *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম*, ৩য় খণ্ড।

৩৪. প্রাগুক্ত।

৩৫. *তারীখে তাবারী*, পৃ. ১৭৫৩।

৩৬. *তারীখে তাবারী*, পৃ. ১৭৫৩।

৩৭. *তাফসীরে খাযীন*, ১ম খ., পৃ. ২০৩; *তাফসীরে তাবারী*, ৩য় খ.।

৩৮. *তারীখে তাবারী*, পৃ. ১১৮২; ইবনে সা'দ, ১ম খ., পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আরবের মেলা ও বাজার-এ বিনিয়োগ

আরবের ইতিহাসে সেখানকার মেলাগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সারা বছর সেখানকার বিভিন্ন স্থানে পর্যায়ক্রমে হাট-বাজার বসত এবং আরবের বণিক ব্যবসায়ীরা সেগুলোতে গিয়ে জড়ো হত। যে কোন ধরনের লোকই হাট-বাজারে যেতে পারত। সেখানে মানুষের জানমালের পুরাপুরি নিরাপত্তা ছিল।[৩৯] সিরিয়া, হিজাজ এবং ইরাকের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'দু'মাতুল জনদল' নামক স্থানে প্রতি বছর পহেলা রবিউল আউয়াল মেলা বসত এবং তা একমাস ধরে চলত। হিজর নামক স্থানে 'মশকর' নামক হাটটি বসত জমাদিউল আউয়াল মাসে। দুমাতুল জনদলের মত সেখানকার স্থানীয় শাসকদেরকেও শতকরা দশ ভাগ বাজার- কর দিতে হত। ইরানের বণিকরাও তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে সেখানে আসত। অতঃপর সেখান থেকে পহেলা রজব রওয়ানা হয়ে ২০ দিন পর তারা আম্মানের 'সেহার' শহরে মেলায় গিয়ে পৌছত। সেহারের মেলা পাঁচ দিন পর্যন্ত চলত এবং তার 'উশর' (এক-দশমাংশ) কর জুলান্দাকে দেওয়া হত। এভাবে বিভিন্ন রকম মেলা আয়োজনে একশ্রেণীর সরদাররা অর্থ উপার্জনে বিনিয়োগ করতো।

যুদ্ধের ময়দানে সরদাররা অস্ত্র বিনিয়োগ করতো

আরবের গোত্র সরদারদের কোন নির্দিষ্ট আয়-আমদানী ছিল না। অবশ্য গনীমতের মালের একটি বড় অংশ তাদেরকে দেয়া হত। বাকি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিত। জাহিলিয়া যুগের কবি আবদুল্লাহ ইবনে গানামাহ তার গোত্রের সরদারকে সম্বোধন করে বলছেন :

লাকাল মিরবাউ মিনহা ওয়াস সাফায়া

ও হুকমুকা ওননাশিতাতু ওল ফুযুলু।

অর্থাৎ হে সরদার, তোমার জন্য রয়েছে গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ, নির্বাচিত বস্তু (গনীমতের মাল থেকে সরদার তার পছন্দসই যে নির্দিষ্ট জিনিসটি বেছে নিতেন) নাশিতাহ (যে শত্রু সম্পত্তি, যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যোদ্ধারা করায়াত্ত করে নিত) এবং ফুযুল (যোদ্ধাদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টিত হওয়ার পর যে ভগ্নাংশটি বাকি থেকে যেত)। আর তোমার হুকুম হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মত।

মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থা

মদীনা ছিল বিশেষ করে কিষাণদেরই শহর। মদীনায় হিজরতের পর মুহাজিররা আবার ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে এবং আনসাররা তাদের ক্ষেতকৃষি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আবু হুরায়রা বলেন : 'আমার মুহাজির ভাইয়েরা হাটবাজারে বেচাকেনায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা তাদের চাষাবাদ ও বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকত।[৪০]

মদীনাবাসীরা কৃষিকর্মে পারদর্শী ছিল। তারা খেজুর গাছে 'তাবীর' করাও (পুং কেশর, স্ত্রী কেশরের মধ্যে রাখা) জানত। হযরত রাফে' বিন খাদীজ বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় এসে দেখলেন যে,

---

৩৯. *তারীখে ইয়াকুবী*, ১ম খ., পৃ. ৩১৩।

৪০. বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানকার লোকেরা খেজুর গাছে 'তাবীর' করছে...।[৪১] মদীনার ইহুদীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে শিল্পকর্মও করত।

জমি বিনিয়োগে অর্থ উপার্জন

মদীনায় জমির কর আদায়ের যেসব পন্থা প্রচলিত ছিল, সেগুলো সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থসমূহের কিতাবুল মুযারিয়া'তে (চাষাবাদ অধ্যায়) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে এবং ইমাম বুখারী বিশেষভাবে হযরত রাফে' বিন খাদীজের রিওয়ায়াতগুলো এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা মদীনায় কর আদায়ের যেসব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তিনি সেগুলো সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখতেন। এর প্রধান কারণ, যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, 'মদীনায় সবচেয়ে বেশী কৃষিক্ষেত তাদের সেখানেই ছিল।'

ইসলামের আবির্ভাবের সময় মদীনায় কর আদায়ের তিন-চারটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যথা :

১. কিষাণ জমিদারের কাছ থেকে কিছু জমি নিত এবং সেগুলোর কর হিসেবে জমিদারের কিছু জমি আবাদ করে দিত। ঐ জমিতে যা ফলত, জমিদারই তার অধিকারী হত। রাফে' বিন খাদীজ বলেন : 'মদীনায় আমাদের অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী কৃষিক্ষেত ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের জমি বর্গা দিত এবং বলত, এই জমিখণ্ড আমার এবং ওটা তোমার। অতঃপর কখনো এই টুকরোর মধ্যে ফসল ফলত এবং কখনো ঐ টুকরোর মধ্যে। অতএব নবী করীম (সা.) এটাকে নিষিদ্ধ করে দেন।[৪২]

২. কখনো শুষ্ক জমিখণ্ড কিষাণের জন্য নির্দিষ্ট হত আর উর্বর খণ্ড জমিদারের ভাগে পড়ত। রাফে' বিন খাদীজ থেকে বর্ণিত আছে, লোকেরা নবী করীম (সা.)-এর যুগে নদীতট এবং নালার পার্শ্ববর্তী জমির উৎপাদনের বিনিময়ে এবং কখনো উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে জমি বর্গায় খাটাত। কোন কোন সময় একটি নষ্ট হত এবং অন্যটি বেঁচে যেত। ফলে কোন কোন ব্যক্তি কোন করই পেত না। শুধুমাত্র ঐ ফসল ছাড়া যা ক্ষতি থেকে রক্ষা পেত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু যদি কোন নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ে বর্গা দেয়া হয় তাহলে তাতে বাধা নেই।[৪৩]

৩. উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমিদার নিয়ে নিত এবং বাকী অংশ কিষাণ পেত। হযরত জাবির বলেন : 'লোকেরা উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ও অর্ধাংশের উপর কৃষিকাজ করত।'[৪৪]

৪. কিষাণ বর্গা হিসেবে কখনো উৎপাদনের কিছু অংশ দিয়ে দিত, আবার কখনো জমির বদলে অন্য কোন প্রকারের ফসল, যেমন খেজুর ইত্যাদি নিজের ঘর তেকেই দিয়ে দিত। রাফে বিন খাদীজ তাঁর চাচা হযরত যুহায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (স.) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি তোমার কৃষিক্ষেতগুলো কী কর? আমি বললাম, আমরা

---

৪১. মুসলিম।

৪২. বুখারী।

৪৩. মুসলিম।

৪৪. বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলো কখনো উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ, আবার কখনো খেজুরের কয়েকটি ওসকের পরিবর্তে বর্গা দেই। তিনি বললেন, এরূপ করো না।[৪৫]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কেরায়া বাবদ অর্থ কিংবা সোনারূপ আদায় করার রীতি তখন মদীনায় প্রচলিত ছিল না। হযরত রাফে বিন খাদীজ বলেন, মদীনায় সবচেয়ে বেশী কৃষিক্ষেত আমাদের এখানেই ছিল। আমরা বর্গার উপর জমি নিতাম এবং ঐ জমির একটি অংশ জমির মালিককে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত, যাতে সে ঐ অংশের উৎপাদন বর্গা হিসাবে পায়। কিন্তু কোন কোন সময় ঐ অংশের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যেত এবং বাকি অংশ রক্ষা পেত। আবার কোন কোন সময় ক্ষেতের বাকি অংশ নষ্ট হয়ে যেত, কিন্তু মালিকের এ নির্দিষ্ট অংশটি রক্ষা পেত। মোটকথা, বর্গার উপর সোনারূপা আদায় করার নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল না।[৪৬]

মদীনার কৃষিক্ষেত গুলোতে বৃষ্টি এবং কুয়ার পানি ছাড়াও নদী থেকে পানি দেওয়া হত। হাদীস গ্রন্থাদিতে প্রায়ই এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৭]

শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ

মদীনায় কাপড় তৈরী, তরবারি নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। সহল বিন সাদ বলেন, একজন স্ত্রীলোক পাড়বিশিষ্ট একটি চাঁদর রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি নিজ হাতে এটা বুনেছি।[৪৮]

হযরত সহল বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) মুহাজিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির কাছে এই বলে পাঠালেন যে, তুমি তোমার দাসকে বল, সে যেন আমাদের জন্য মিম্বরের একটি সিঁড়ি বানিয়ে দেয়।[৪৯] এ ব্যক্তি তার দাসকে বলে দিল। সে ঝাউগাছ কেটে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য একটি মিম্বর বানিয়ে দিল।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেন, জনৈকা আনসারী স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস বানিয়ে দেব, যার উপর আপনি বসতে পারেন? কেননা আমার একটি দাস ছুতারের কাজ জানে। রাসূলুল্লাহ (স.) উত্তর দিলেন, যেমন তোমার খুশী।[৫০] এভাবে শিল্পে বিনিয়োগ করে তারা লাভবান হতো।

বিভিন্ন বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনিয়োগ

মদীনায় 'কায়নুকা' নামক একটি বাজার ছিল, যেখানে জিনিসপত্র বেচাকেনা হত। আবদুর রহমান বিন আউফ মদীনায় হিজরত করার পর সা'দ বিন রবী আনসারীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের বাজার কোথায়? তিনি উত্তরে তাকে কায়নুকা নামক বাজারের কথা বলেছিলে। অতঃপর আবদুর রহমান যখন বাজার থেকে ফিরলেন তখন তাঁর সাথে কিছু পনির এবং ঘি ছিল...[৫১] আবদুর রহমান

---

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য বুখারী এবং তাফসীরে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪ দ্রষ্টব্য।

৪৮. বুখারী।

৪৯. বুখারী।

৫০. বুখারী।

৫১. বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

বিন আউফ বলেন, যখন আমরা মদীনায় এলাম তখন আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এখানে কি এমন কোন বাজার আছে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়? তারা বললো, হ্যাঁ, কায়নুকা নামক একটি বাজার আছে।[৫২] রাসূলুল্লাহ (স.) বনু কায়নুকার বাজারে গেলেন।[৫৩]

শস্য পণ্য বিনিময় পদ্ধতিতে বিনিয়োগ

যেহেতু মদীনা ছিল একটি কৃষি শহর; তাই সেখানে স্বাভাবিকভাবেই গৃহপালিত পশু, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কৃষিপণ্য বেচাকেনা হত। তখনকার যুগে মদীনায় বেচাকেনার যে সমস্ত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি দুটি সবিশেষ উল্লেখযোগ :

১. বায়য়ে' মুহাকালা : 'শস্যছড়া' পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই লোকেরা ক্ষেতের শস্য খরিদ করে তা নিজের দখলে নিয়ে নিত, যাতে পরবর্তী সময়ে এগুলোকে যথেচ্ছ মূল্যে বিক্রি করা যায়।

২. বায়য়ে' মুযাবানা : গাছ থেকে সংগৃহীত কিছু খেজুরের বদলে গাছের খেজুর ক্রয় করে নেওয়া।

যখন রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় হিজরত করেন তখন সেখানকার লোকেরা মাপ-ওজনে কমবেশী করত। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় হিজরত করেন তখন সেখানকার লোকেরা মাপ-ওজনে অত্যন্ত অবিশ্বস্ত ছিল।[৫৪] পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে : তারা যখন লোকের নিকট থেকে মেপে নেয় তখন পুরাপুরিই নেয়, আর যখন ওদেরকে মেপে দেয় তখন কম দেয়।

আবূ জুহায়না নামক একজন বণিক মাপ-ওজনে হেরফের করার ব্যাপারে সমস্ত বস্তিতে কুখ্যাত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন আবূ জুহায়নার কাছে দু'টি 'পয়মানা' (পরিমাপক) ছিল। যখন সে কিছু কিনত তখন একটি দ্বারা মেপে নিত। আর যখন কিছু বিক্রি করত অন্যটি দ্বারা মেপে দিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মক্কাবাসীরা জিনিসপত্রকে তেলে (ওজন করে) এবং মদীনাবাসীরা মেপে বিক্রি করত।[৫৫]

দুগ্ধবতী জন্তুকে 'মুসাররাত' বানিয়ে বিক্রি করার নিয়ম মদীনাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ দুগ্ধবতী জন্তুর উলানের মধ্যে এক দু'দিন দুধ জমিয়ে রাখা হত, যাতে ক্রেতা ঐ জন্তুকে অত্যন্ত দুগ্ধবতী বলে মনে করে। বর্তমানকালেও বাংলা-পাক-ভারতের গোয়ালার এ ধরণের শঠতার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

সূদী ব্যবসায় বিনিয়োগ

ইহুদী পুঁজিপতিরা মদীনায় বসবাস করত এবং সেখানকার চাষীদেরকে সূদী ঋণ দিত। মদীনায় সূদের প্রচল ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। সা'দ বিন উবাদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি যখন মদীনায়

---

৫২. বুখারী।

৫৩. বুখারী।

৫৪. *তাফসীরে তাবারী*, ৩০শ খ., পৃ. ৪৯।

৫৫. *তাফসীরে খাযিন*, ৪র্থ খ., পৃ. ৩৫৯; *কাশ্‌শাফ*, যামাখশারী।

Dhaka University Institutional Repository

গেলাম তখন আবদুল্লাহ বিন সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। ... তিনি বললেন, তোমরা এখন এমন এক দেশে বসবাস করছ যেখানে সূদের প্রচলন রয়েছে।[৫৬]

মক্কা এবং তায়েফের মত মদীনায়ও একই পদ্ধতির সূদী ব্যবসা প্রচলিত ছিল। জাহিলিয়া যুগে সূদী ব্যবসা এভাবে হত যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করত। সে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হত তখন ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে বলত, হয় আমার ঋণ পরিশোধ কর, না হয় সুদ দাও। তখন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করে দিলে তা ভালই, অন্যথায় ঋণদাতা তার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করত এবং ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিত।[৫৭]

ইমাম মালিক (মৃত্যু ১৯৮ হিজরী) সূদের বিবরণীতে প্রধানত মদীনা এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত সূদ প্রথাসমূহের উল্লেখ করতেন। এতে মনে হয়, ঋণ পরিশোধের উপরোক্ত পদ্ধতিটি মদীনায়ই প্রচলিত ছিল।

মদীনায় মহিলাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম

মদীনার পুরুষদের মত স্ত্রীলোকেরাও অর্তনৈতিক অসচ্ছলতার মধ্য ছিল। তাদেরকে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করতে হত। চাক্কী ঘোরানের দরুন হযরত ফাতিমা (রা.) এর হাতের চামড়া খসে পড়েছিল।[৫৮] হযরত আলী (রা.) বলেন ফাতিমা (গম ইত্যাদি পেষার) চাক্কী ঘুরাতেন, এমন কি (ঘুরাতে ঘুরাতে) তার হাদের মধ্যে দাগ পড়ে গিয়েছিল। (কূয়া থেকে) মশকে (পাত্র) পানি ভরতেন, এমনকি তার বক্ষের মধ্যে দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঝাড়ু দিতেন, এমন কি তার কাপড় ধূলি ধূসরিত হয়ে যেত। খাবার রান্না করতেন, এমনকি তার কাপড়-চোপড় মলিন হয়ে যেত।[৫৯]

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকা বলেন, যখন মুবায়র আমাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর কাছে না ছিল মাল-সম্পদ, না ছিল জমি, না ছিল দাসদাসী; (শুধু) পানি তোলার উট, ঘোড়া প্রভৃতি ছাড়া তার কাছে কিছুই ছিল না। আমি নিজেই যুবায়রের ঘোড়াগুলো চরাতাম এবং সেগুলোকে পানি খাওয়াতভস। আমি নিজেই (কুয়া থেকে) পানি উঠাতাম এবং আটাও পেতাম। আমি রুটি ভাজতে জানতাম না; আমার প্রতিবেশী আনসারী মহিলারাই আমার রুটিগুলো ভেজে দিত। ওরা অত্যন্ত পূণ্যবতী মহিলা ছিল।

আমি নিজেই যুবায়রের সে জমি থেকে -যা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দান করেছিলেন, খেঁজুরের আটিগুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসতাম; সে জমি আমাদের ঘর থেকে দু'মাইল দূরে ছিল।

একদিন আমি মাথার উপর আঁটিগুলো নিয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আমার দেখা হয়। তাঁর সাথে কয়েকজন সাহাবীও ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তাঁর পিছনে বসবার জন্য উটকে 'আখ্ আখ্ (উট বসানোর সাংকেতিক শব্দ) বললেন। পুরুষদের মধ্যে চলতে আমি লজ্জাবোধ করলাম। তা'ছাড়া যুবায়রের আত্মমর্যাদাবোধের কথাও আমার মনে পড়লো। বড় আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন তিনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) টের পেলেন যে, আসমা লজ্জাবোধ করছে। তাই তিন চলে গেলেন।

---

৫৬. বুখারী।

৫৭. মুয়াত্তা, ইমাম মালিক।

৫৮. বুখারী।

৫৯. আবু দাউদ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি যুবায়রের কাছে এসে বললাম, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আমার দেখা হয়েছিল আমার মাথার উপর আঁটির বোঝা ছিল। তাঁর সাথে কয়েকজ সাহাবীও ছিলেন তিনি আমাকে বসবার জন্য তাঁর উট থামিয়েছিলেন। আমি এতে লজ্জাবোধ করলাম। তোমার গায়রতের কথা তো আমি জানি। যুবায়র বললেন, আল্লাহ্‌র কসমং! তোমাকে মাথায় আঁটি নিয়ে আসতে দেখাটা তাঁর রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সওয়ার হওয়ার চাইতে আমার কাছে অনেক বেশী খারাপ ঠেকছে। অতঃপর ঘোড়াকে দেখাশোনা করার জন্য আবূ বকর (রা.) একটি ভৃত্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি (আমার পিতা আবূ বকর) আমাকে ঘোড়া দেখাশোনার কাজ থেকে রেহাই দিলেন।[৬০]

তখনকার মহিলাদের আহার্য, পোশাক সবই ছিল সাধারণ। আয়মন বলেন, আমি (একবার) হযরত আয়েশা (রা.) এর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর দেহে তখন পাঁচ দিরহাম মূল্যের একটি ক্বতরের জামা (এক জাতীয় সাধারণ কাপড়) ছিল। তিনি বলেন, আমার দাসীর দিকে (একটু) চোখ তুলে তাকাও। দেখ, সে ঘরের মধ্যে এটা (জামা) পরতে অস্বীকার করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুদে আমার কাছে এই ধরনের একটি জামা ছিল এবং তখন মদীনায় কোন স্ত্রীলোককে সজ্জিত করতে হলে আমার কাছ থেকে এই জামাটিই চেয়ে নিয়ে যাওয়া হত।[৬১]

প্রাচীনকালে পণ্য বিনিময় পদ্ধতি

কিন্তু প্রথম দিক দিয়ে মানুষের জন্যে অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক আদান-প্রদান কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা একটি বিশেষ জিজ্ঞাসা। তবে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে শুধু এতটুকুই বলা যেতে পারে যে সেই প্রাথমিক মানব সমাজ ছিল ত্যন্ত সাদাসিধা ও জটিলতামুক্ত। জীবনোপকরণসমূহ তাদের মধ্যে খুব সহজভাবেই পারস্পরিক বিনিময় হয়ে যেত। সেকালে মুদ্রার অবস্থিতি ও মাধ্যম হিসাবে তার ব্যবহার হওয়া অকল্পনীয়। তাই নিজের নিকট রক্ষিত জিনিস দিয়ে অপর একজনের নিকট থেকে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে নেয়া-এক কথায় যাকে বলা যায় পণ্য বিনিময় (exchange of commodit) তা-ই ছিল নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্তির একমাত্র পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতেই সমাজের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করত। কিন্তু বর্তমানে সে পদ্ধতি অতীতের কাহিনীতে পরিণত। অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের সমাজ কাঠামোর যেমন বির্তন ঘটেছে, জীবনোপকরণ সংগ্রহের পদ্ধতিতেও তেমনি বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রটি বর্তমানে যেমন ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি হয়েছে অত্যন্ত জটিলও। পূর্বের ব্যক্তিগত পর্যায়ের আদান-প্রদান অত্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাট ছিল বলা যায়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মানুষ তার সামষ্টিক জীবনে ক্রমাগতভাবে দুটি অভিজ্ঞাতার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম অবস্থার প্রতীকি ঘটনা হচ্ছে, এক ব্যক্তির নিকট প্রচুর ফল ছিল আর অপর ব্যক্তির নিকট ছিল প্রচুত হরিণের গোশত। অথচ উভয়েরই অপরজনের নিকট রক্ষিত দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল। ফলে উভয়ই পাস্পরিক দ্রব্য বিনিময়ে প্রস্তুত হলো। কি পরিমাণ হরিণের গোশত কি পরিমাণ ফলে সমান হতে পারে-এ সমস্যার সমাধানের জন্যে উভয় যে পরিমাণ নির্ধারণে স্বতঃস্ফুর্তভাবে রাজী হবে, তা-ই উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে তারা দু জনই একমত হলো। পাস্পরিক আদান-প্রদান, লেনদেন ও পণ্য বিনিময়ের এই ছিল সূচনা।

---

৬০. বুখারী।

৬১. বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অভিজ্ঞাতাটি ছিল এরূপ যে, এক ব্যক্তির নিকট ছিল অপরিমেয় ফল, কিন্তু অপর ব্যক্তি সেদিন শুধু খাওয়ার জন্যেও কিছু পায়নি। প্রচুর ফলের মালিক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কিছু ফল দিতে এই শর্তে রাজী হলো যে, আপাতত সে কিছু ফল নিয়ে স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করবে, কিন্তু পরে যখন সে জঙ্গল থেকে ফল পেয়ে যাবে তখন সে তা তাকে ফিরিয়ে দেবে। এই ধরনের লেন-দেনকে বলা হলো ঋণ বা করজ। এতে দুই পণ্যের বিনিময় ছিল না; জিনিস ছিল একটিই এবং ছিল একজনের নিকট, যা কিছুদিনের জন্যে অন্যজনকে ধার বাবদ দেয়া হচ্ছিল। এজন্যে ঠিক করা হয়েছিল যে, ঋণ বাবদ লব্ধ জিনিসের বদলে হ্রাস-বৃদ্ধি বা লাভ-ক্ষতি ছাড়াই সেই পরিমাণ ও সেই ধরনের জিনিসই ফেরত দিতে হবে যা ঋণ বাবদ-গ্রহণ করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : চার
বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদে বিনিয়োগ ব্যবস্থা

বর্তমান পৃথিবীতে চার প্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যথা :

১. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা।

২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা।

৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

মানব জীবন প্রবাহে প্রতিনিয়তই ৪টি প্রশ্ন এসে উঁকি দেয়। সকল অর্থনৈতিক মতাদর্শেই সেই ৪টি জটিল প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য সমাধানের পন্থা বিভিন্ন মতাদর্শে বিভিন্ন ভাবে নিরুপণ করেছে। সেই ৪টি বিষয় সংক্ষেপে এরূপ :

১. অভাবকে চিহ্নিতকরণ : মানুষের অসংখ্য চাহিদার মাঝে কোনগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করা হবে তা চিহ্নিত করাকে বলা হয় অভাবের চিহ্নিতকরণ। তবে এই চিহ্নিতকরণ কিভাবে করা হবে এবং কিসের ভিত্তিতে তা করা হবে সেটিই মূলতঃ এক্ষেত্রে মৌলিক সমস্যা। এ প্রশ্নটি যেমন ব্যক্তির বেলায় রয়েছে, তা রাষ্ট্রের বেলায়ও রয়েছে।

২. উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহার ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া : অর্থাৎ প্রকৃতিলব্ধ কিংবা মনুষ্য সৃষ্ট উৎপাদন-উপকরণসমূহ; যেমন-ভূমি, শ্রম ও পুঁজি কোথায় কি পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে, কোন উৎপাদনশীল খাতে তা বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিনিয়োগের প্রক্রিয়া কি হবে এটিও মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের একটি বড় প্রশ্ন।

৩. উৎপাদিত পণ্য ও লভ্যাংশ ভোগ বণ্টনের প্রক্রিয়া : অর্থাৎ অভাব নির্বাচনের পর উৎপাদন-উপকরণ ব্যবহার করে যে পণ্য উৎপাদিত হবে তা সমাজের মানুষের কাছে কিভাবে বণ্টন করা হবে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে যে লভ্যাংশ অর্জিত হবে তা সমাজের মানুষের মাঝে কিভাবে বণ্টিত হবে, কে তা ভোগ করবে এবং কোন নীতির আওতায় তা ভোগ করবে, এটিও মানব জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের অন্যতম জটিল সমস্যা ও প্রশ্ন বটে।

৪. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনের প্রক্রিয়া : অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা থেকে আরও উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে? কোন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন শিল্প ও পণ্যের উৎপাদন করলে অধিক হারে লাভবান হওয়া যাবে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন। সকল অর্থনৈতিক মতাদর্শে এ প্রশ্নগুলোর সমাধান করার নিমিত্তে প্রয়াস চালানো হয়েছে।[১]

---

১. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন,* ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স, ২য় সং, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদীরা বলেন অর্থ ব্যবস্থাকে সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত করতে হলে এবং উপরোক্ত সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। তাহলে মানুষ অধিক মুনাফা ও প্রাচুর্য লাভের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করতে অনুপ্রাণিত হবে। যদি এটা করা হয় তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরোক্ত চারটি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং অর্থনীতিতে একটি সুশৃঙ্খল ও গতিশীল পরিস্থিতি ফিরে আসবে।

তাদের মতে ব্যক্তি মালিকানার অবাধ অধিকার দেওয়া হলে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় সব কিছুই আপনা আপনি হতে থাকবে। রাষ্ট্রের কোন পরিকল্পনা বা উদ্যোগের প্রয়োজন হবে না। কেননা উদ্যোক্তারা বাজারে যে বস্তুর চাহিদা দেখাবে তাই তারা উৎপাদন করতে প্রয়াসী হবে। কারণ তাদের লাভ প্রয়োজন। সে জন্য উৎপাদনের যে উপকরণ যে পরিমাণ ব্যবহার করলে এবং যে পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে লাভ বেশি হবে তাই তারা ব্যবহার করবে। উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা যেখানে বেশী হবে সেখানেই তারা সরবরাহ করবে। আর উৎপাদিত পণ্যের আধিক্য সৃষ্টি হলে আপনা আপনিই তার বাজারদর কমে আসবে। যে পণ্যের চাহিদা থাকবে না সে পণ্য কেউ উৎপাদন করতে প্রয়াসী হবে না। আর লাভ ও মুনাফা বণ্টনের কাজটিও একই প্রক্রিয়ায় আঞ্জাম পাবে এবং একই প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক সমৃদ্ধিও অর্জিত হবে।

পুঁজিবাদীরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতিও চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। কেননা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অধিক দামে পণ্য বিক্রি করার সুযোগ করা প্রয়োজন। আর প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হলে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির প্রয়োজন। আবার নতুন নতুন পণ্য বাজারজাত করতে পারলেও অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

অতএব উদ্যোক্তারা অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় পণ্যের গুণগতমান বাড়াতে সচেষ্ট হবেন। এ জন্য নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন উপকরণ ও মেশিনারী উৎপাদিত হবে। ফলে উৎপাদিত পণ্য ও উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ক্রমে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে।

সার কথা, পুঁজিবাদীদের মূল বক্তব্য হল 'অবাধ ব্যক্তিমালিকানা' অর্থাৎ যদি ব্যক্তি উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ, উৎপাদনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ, বাজারজাতকরণ এবং লভ্যাংশ ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ মালিকানা লাভ করে এবং সে তার ইচ্ছামত সব কিছু করতে পারে আর রাষ্ট্র যদি এ সকল ক্ষেত্রে কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার আওতায় সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও সমাজের প্রয়োজন পূরণের সুশৃংখল ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সাথে সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতিও তরান্বিত হবে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়টিও এই চাহিদা ও যোগান বিধির আওতায় উদ্যোক্তার দায়িত্ব হয়ে যাবে। কেননা অধিক মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনেই উদ্যোক্তাকে সবকিছু সম্পর্কে সঠিক জরিপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কেননা এ দুটি বিষয় মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন বুঝে সে নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাই রাখে না। বলতে গেলে মানুষের ভাল মন্দের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সে অন্ধ। সুতরাং চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা দ্বারা অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা খুবই দুরুহ ব্যাপার হবে। আর হলেও তার জন্য বহু অর্থনৈতিক খেশারত দিতে হবে এবং বহু জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে। কারণ চাহিদা ও যোগান কোন বৈদ্যুতিক সুইচ নয়, টিপলেই চাহিদা সৃষ্টি হবে আর বন্ধ করলেই চাহিদা ফুরিয়ে যাবে। স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় চাহিদা ও যোগান ভারসাম্য পূর্ণ হয়ে উঠতে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। ইত্যবসরে অনেক সম্পদের অপচয় হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। যেমন ঃ এক জায়গায় কোন এক পণ্যের চাহিদা দেখে অনেকেই সে পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ উৎপাদনের উপকরণ বিনিয়োগ করে উৎপাদনের কাজ শুরু করল। কিন্তু কতিপয় উদ্যোক্তা আগে পণ্য সরবরাহ করে বাজারের চাহিদা পূরণ করে ফেলল। ফলে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ার কারণে তা গুদামজাত করে রাখা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। অথচ এই পণ্য উৎপাদন করতে যেয়ে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হল তা দিয়ে অন্য একটি প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করা যেত। কিন্তু যেহেতু উপকরণ এখানে আবদ্ধ হয়ে রইল; তাই এর দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হল না।

সুতরাং সমাজের চাহিদা অনুপাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য উৎপাদনের উপকরণ কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বরং যাবতীয় উৎপাদনের উপকরণ রাখতে হবে রাষ্ট্রের দায়িত্বে। রাষ্ট্রই নাগরিকদের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করবে। সমাজের চাহিদাসমূহ গুরুত্বের বিবেচনায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করতঃ সে নিরিখে উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে কোথায় কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করবে। উৎপাদনের প্রক্রিয়া কি হবে তা নির্ধারণ করে রাষ্ট্র একটি পরিকল্পনা তৈরি করবে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মহল এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। অতঃপর যাবতীয় কাজ-কর্ম ও উৎপাদন সেই পরিকল্পনা মাফিক আঞ্জাম দেওয়া হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রই চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করবে, উপকরণ যোগান দিবে, শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা হবে, পণ্যের দাম রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে, এমন কি ভোক্তাদের ভোগের পরিমাণও রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দিবে। আর যেহেতু উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে সুতরাং নাগরিকদের হাতে শ্রম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। রাষ্ট্র নাগরিকদের যোগ্যতা ও শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান করবে। এ ব্যবস্থায় দেশের সকল নাগরিক সমান হারে সম্পদ ভোগ করতে পারবে। এতে করে সকল মানুষ মানুষ হিসাবে যেমন সমান; তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমান হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ার কারণে অসহায় মানুষের যে দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে হয়, এ ব্যবস্থায় তা আর থাকবে না। খেলে সবাই খাবে, না খেলে কেউ নয়। তাছাড়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ যেমন বিভিন্নমুখী দুর্নীতি ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে; তাও এ ব্যবস্থায় থাকবে না। কেননা এ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র উৎপাদন খরচে দ্রব্য বাজারজাত করা হবে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের ন্যায়ের সাথে অতিরিক্ত ব্যয় যেমন-ভূমির ভাড়া, ব্যাংকের সুদ, উদ্যোক্তার লাভ ইত্যাদি সংযোজন করে দ্রব্যের যে Surplus Value বা অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে বাজারজাত করা হয় এই ব্যবস্থায় তারও প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া পণ্য ক্রয় করতে যেয়ে দরদাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে যে প্রতারণা ও হয়রানীর শিকার হতে হয়; এ ব্যবস্থায় তাও থাকবে না। কারণ উৎপাদন ব্যয়ের সমপরিমাণ মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে। আর যেহেতু এ ব্যবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

পণ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকছে না; তাই তাদ্বারা কোন ধরনের ভেজাল, প্রতারণা, মাপে কম দেওয়া, দর-দামের ক্ষেত্রে অধিক মূল্য হাকার মত কোন অবাঞ্চিত ঘটনা ঘটানোর আশঙ্কাও থাকবে না। সুতরাং এ ব্যবস্থায় মানুষ নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে সুস্থ্য পরিবেশে সমতা রক্ষা করে জীবনযাপন করতে পারবে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা

মিশ্র অর্থনীতিবিদরা বলেন যে, যেহেতু স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা একটি স্বাভাবিক বিষয় তাই এটিকে অকার্যকর করে দেওয়া যায় না। আবার অবাধ মালিকানা লাভ করলে ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করে ফেলে এবং ব্যবসায়ী সমিতি গঠন করে আপসে শলাপরামর্শ করে দ্রব্যের মূল্য চড়িয়ে দেয়। এজন্য সকল ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া কিছু কিছু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান-যা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে উদ্যোক্তাদেরকে পুঁজির বৃহদাংশ উচ্চ সুদে ঋণ করে যোগান দিতে হয় এ ধরনের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং জরুরী নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পের উৎপাদনের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা এই সব নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরী পণ্যে সংকট সৃষ্টি করেই ব্যবসায়ীরা মোটা অংকের মুনাফা হাতিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তাই যদি বেসরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার থাকে তাহলে মানুষ সর্বোচ্চ হারে তার মেধা ও শ্রমকে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যয় করতে উৎসাহিত হবে এবং উৎপাদন ত্বরান্বিত হবে। আবার সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবং বৃহৎ ও জরুরী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে জনগণকে প্রতারিত করার এবং যথেচ্ছা মূল্য নির্ধারণ ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে জনগণকে হয়রানী ও ক্ষতিগ্রস্থ করার সুযোগ থাকবে না। এদের সার কথা হল নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা প্রদান করা হবে তবে তা সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে সকল সমস্যা ও প্রশ্নের নিরসন সহজ হবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতি মনে করে মানুষের উপরোল্লিখিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ব্যক্তি মালিকানাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। কেননা ব্যক্তি মালিকানা মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার একটি। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ যা নিজের মনে করে তার প্রতি যত্নবান হয়, সংরক্ষণ করে এবং তাতে প্রবৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। তাছাড়া যা নিজের মনে করে তার জন্য অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করতে ও শ্রম দিতে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সম্মত হয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে মানুষ এমন শ্রম দেয় ও কষ্ট করে যা স্বাভাবিক অবস্থায় সাধ্যাতীত মনে হয়। কিন্তু যা সে নিজের মনে করে না, তার জন্য স্বাভাবিক পর্যায়ের শ্রম দিতে বা কষ্ট করতেও সম্মত হয় না। অতিরিক্ত শ্রম দেওয়া বা কষ্ট স্বীকার করার তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের মেধা ও শ্রমকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগাবার স্বার্থেই ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কুরআনে কারীমে যদিও এ সম্পর্কে পারিভাষিক কোন শব্দ পাওয়া যায় না (কেননা পরিভাষা গুলো পরে তৈরি) কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا۔

Dhaka University Institutional Repository

আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবনোপকরণকে তাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি এবং কতিপয়ের উপর কতিপয়কে প্রাধান্য দিয়েছি যাতে করে একজন আরেক জনকে কাজে লাগাতে পারে।[২]

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللناساء نصيب مما اكتسبن-

পুরুষরা যা উপার্জন করবে তাতে তাদের অধিকার থাকবে আর রমণীরা যা উপার্জন করবে তাতে তাদের অধিকার থাকবে।[৩]

ومما رزقنا هم ينفقون- 'আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে'।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের ভাষ্য থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে এই ব্যক্তি মালিকানা যাতে অর্থনৈতিক আবর্তনে কোন জটিলতা সৃষ্টি না করে, সম্পদ ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে যায় এবং ব্যক্তির সঞ্চয় যাতে সমষ্টি জীবনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে না পারে এ জন্য ইসলাম আয় উপার্জন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের বিধান দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে। সম্পদ গুদামজাত করা নিষিদ্ধ হওয়া, সুদী কারবার ও লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়া, জুয়া, হাউজী, লটারী নিষিদ্ধ হওয়া, পণ্যহীন বেচাকেনা অবৈধ হওয়া, এক কথায় সকল প্রকার ফাসিদ ও বাতিল বেচা-কেনাকে এজন্যই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায় প্রতারণা ও ধোঁকার যাবতীয় পন্থা ও প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এ সকল পন্থা অবলম্বন করেই পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে।

অর্থাৎ ইসলাম একদিকে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তিকে পুঁজি, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে-যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয়। আবার পদ্ধতিগত বৈধতা ও অবৈধতার সাথে হালাল হারামের বিধানকে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে সেই অধিকারকে সীমিত করে দিয়েছে।

চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধানকেও ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার আওতায় অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলাম বন্দি করতে চায়নি। কেননা এতে ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের প্রশ্ন থাকে না বিধায় ব্যক্তির মেধা ও শ্রম সেই পর্যায়ে কাজ করে না; ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলে তা কাজ করে। এজন্য ইসলাম অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করে। যেমন-ইরশাদ হয়েছে :

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا-

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জীবনোপকরণ বন্টনের বিষয়টি নিজ দায়িত্বে রেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহর হাতে। তিনি হয়ত কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় তা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে, সেই প্রাকৃতিক শক্তি বা নিয়ম হল চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি। একটি হাদীসে এ বিষয়টি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, গ্রাম থেকে আগত পণ্যের মালিকের পক্ষ হয়ে কোন শহরে নাগরিক তা বিক্রি করে দিবে না। লোকদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও (তারা ক্রয় বিক্রয় করুক)। আল্লাহ কতিপয়ের মাধ্যমে কতিপয়ের আহার্যের যোগান দিয়ে থাকেন। অন্য হাদীসে হযরত আলী (রা.) বলেন :

قيل يا رسول الله قوم لنا السعر قال ان علاء السعرو رخصه بيد الله- اخرجه البزار-

---

২. সূরা যুখরুফ : ৩২

৩. সূরা আন নিসা : ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (সা.)-কে বলা হল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে তিনি বললেন, দ্রব্যমূল্য বাড়া-কমা আল্লাহর হাতে। -(বায্যার)

এই হাদীসে দ্রব্য মূল্য বাড়া ও কমার বিষয়টি আল্লাহর হাতে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে দরদাম নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ করেন এর অর্থ আল্লাহ এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছেন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরদাম নির্ধারণ করে। সেই বিধিটি চাহিদা ও যোগান বিধি হওয়ায় কোন অসুবিধা নেই।

সুতরাং বুঝাই যায় যে, ইসলাম অর্থনীতিতে বাজারদর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিটি মেনে নিয়েছে, এবং এটিকে খোদায়ী ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছে। তাই চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিতে হস্তক্ষেপ করাকে ইসলাম জুলুম বলে মনে করে। অর্থাৎ এ বিধিকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না দিলে তা অন্যায় হবে এবং এর পরিণতিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। এ কারণেই রাসূল (সা.) কে যখন সাহাবীগণ দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার কথা বললেন তখন তিনি তা করতে সম্মত হননি বরং তিনি এই জুলুমাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

ইমাম আবূ দাউদ হযরত আনাস (রা.) থেকে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন :

قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو القابض الباسط الرازق واني لا رجوا ان القى الله وليس احد منكم يطالبنى بظلمة فى دم ولا مال-

> লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্য মূল্য খুব বেড়ে গেছে, অতএব আপনি দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন, আল্লাহই বৃদ্ধি করেন, কমান এবং রিযিক দান করেন। আমি আল্লাহর সাথে এভাবে মিলিত হতে চাই যাতে তোমাদের কেউ জান-মাল সংক্রান্ত কোন জুলুমের দাবী আমার কাছে জানাতে না পারে।[৪]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একই ধরনের হাদীস সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ হযরত আবূ সাঈদ খূদরী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

হযরত জাবের থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে আল্লাহর বাজার দর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিই হবে তার ইঙ্গিত রয়েছে। সেই হাদীসেরই শব্দগুলো নিম্নরূপ-

قال رسول الله (ص) لا بيع الحاضر لباد- دعو الناس يرزق الله بعضهم ببعض-

এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, লোকদেরকে স্বাভাবিক অবস্থার পর ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বাজার দরের উপর হস্তক্ষেপ করো না) আল্লাহ্ তাআলা কতিপয়ের দ্বারা কতিপয়ের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ ক্রেতা দ্বারা বিক্রেতা এবং বিক্রেতা দ্বারা ক্রেতার রিযকের ব্যবস্থা করেন। এটিই চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির সুস্পষ্ট আভাস। তবে সবকিছুকেই এই স্বাভাবিক নিয়মের আওতায় পুঁজিপতিদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না যে, তারা যা ইচ্ছা তাই করবেন। কেননা এই অবাধ স্বাধীনতা দ্বারাই মূলতঃ পুঁজিবাদ জন্ম নেয়। এবং সম্পদ গুটিকতক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থা উপর এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু যদি তাদেরকে উৎপাদিত পণ্য স্বাধীনভাবে বাজারজাত করার অধিকার না দেওয়া হয় তাহলে উৎপাদনে স্বতৎস্ফূর্ততা বিনষ্ট হবে এবং শ্রম ও মেধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না।

---

৪. তিরমিযী ইবনে মাযাহ, দারেমী, মুসনাদে আহমদ।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে ইসলাম চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিটি মেনে নিয়ে উদ্যোক্তাদেরকে স্বাধীনভাবে পণ্য বাজারজাত করার অধিকার দিয়ে দিয়েছে। তবে তাদের এই স্বাধীনতা যেন সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে না পারে এবং সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে না পারে, সেজন্য তাদের কাজ-কর্মকে কতিপয় সুনির্ধারিত শর্ত ও বিধির আওতায় আবদ্ধ করে দিয়েছে। এই সব বিধি-বিধানের মাঝে সুদী লেনদেন, জুয়া, পণ্যবিহীন বেচাকেনা, অনুমানের ভিত্তিতে বেচাকেনা অবৈধ হওয়া অন্যতম। কেননা এই প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমেই মূলতঃ সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে গুটি কতক ধনীর হাতে। ইতিহাস সাক্ষ্যী যে পুঁজিপতিদের সকল তৎপরতা এহেন কর্মকাণ্ডের উপরই নির্ভরশীল। এবং এ পন্থায়ই তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। তারা সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থার উপর দখলদারিত্ব সৃষ্টি করে রাখে। এমন কি তারা চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিকেও অচল করে দেয়।

অপরপক্ষে ইসলাম লেনদেন ও আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে বহু প্রকার লেনদেনকে ফাসেদ কিংবা বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। ঐসব লেনদেনকে ফাসেদ বা বাতিল বলার কারণ এটিই যে এ ধরনের লেনদেন বাজারের স্বাভাবিক বিধিকে অকেজো করে দেয় এবং বাজার দরের ওপর গুটি কতক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও দখলদারিত্ব সৃষ্টি করে। যেমন-মালামাল গুদামজাত করে রাখা, শহরে প্রবেশ করার পূর্বেই পণ্য আমদানীকারকদের থেকে পণ্য ক্রয় করে নেওয়া, গ্রামীণ পণ্যের মালিকদের পক্ষ হয়ে শহুরে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বিক্রি করে দেওয়ার প্রথাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা এতে বাজার দরের উপর এক ধরনের দখলদারিত্ব সৃষ্টি হয়।

একই কারণে ইসলাম ব্যবসায়ীদের সমিতি গঠন করাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। যেমন : হিদায় গ্রন্থের كتاب الفئ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে :

فقد صرح الفقهاء بانه لا يترك التجار يشتركون فيما بينهم- لتحكم الاسعار-

ফিকাহবিদরা সুস্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, ব্যবসায়ীদেরকে দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার দেওয়া যায় না। তাছাড়া ফিকাহবিদরা একথাও উল্লেখ করেছেন যে, ব্যবসায়ীদের অবৈধ হস্ত ক্ষেপের ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ইসলামী সরকারের রয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার দাম ব্যবস্থার উপর হস্ত ক্ষেপ করতে পারবে।

এছাড়াও সম্পদ যাতে ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে সে জন্য ইসলাম যাকাত, ফিৎরা, সাদাকাহ, কুরবানী, কাফ্ফারা, অধিনস্তদের ভরণ-পোষণ উত্তরাধিকার আইনসহ বিভিন্ন ধরনের বিধান জারী করেছে। এ সকল ব্যবস্থার মাঝেও সম্পদ আবর্তনের একটি বিষয় অতি সুক্ষ্মভাবে কাজ করে। কাজেই স্বাধীনভাবে উপার্জন করলেও সম্পদ ব্যয় করে দিতেই হয়। ফলে সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার অবকাশ থাকে না। তারপরও যদিকারো হাতে সম্পদ সঞ্চিত থাকে; তার উপর ইসলাম কতিপয় নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। যেমন- দান-খয়রাতের প্রতি ধনীদেরকে সাংঘাতিকভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে বরং দান-খয়রাতকে তাকওয়াওয়ালা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

ذالك الكتاب لا ريب فيه هذا للمتقين- الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلواة ومما رزقناهم ينفقون-

এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এতে তারওয়ার অনুসন্ধিৎসুদের জন্য হেদায়াত রয়েছে-যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং জীবনোপকরণ হিসাবে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

দানের পারলৌকিক প্রতিদানের সুস্পষ্ট আভাস ঘোষণা করা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من- واحسن كما احسن الله اليك-

আল্লাহ্ যা তোমাকে দান করেছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশের কথা ভুলে যেয়ো না। আর পরোপকার কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি ইহ্সান করেছেন।[৫]

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع منابل فى كل سنبلة منه حبة والله يضعف لمن يشاء-

যারা তাদের মাল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাদের এ দানের উপমা হল একটি শষ্য দানার মত যা থেকে সাতটি শীষ গজায়, প্রতিটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আরো বহুগুণ বর্ধিত প্রদান করেন।[৬]

আবার দান না করে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

والذين يكنزن الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم-

আর যারা সোনা রূপা (অর্থ সম্পদ) জমিয়ে রাখে এবং সেগুলো আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।[৭]

হাদীসে নবী কারীম (সা.) কৃপণতার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করতে যেয়ে ইরশাদ করেছেন :

البخيل لا يدخل الجنة-

কৃপণ ব্যক্তি কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

পড়শী ও প্রতিবেশীর প্রতি অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন :

إيما أهل عرصة ظل فيهم إمرؤ من المسلمين طويا (يعنى جائعا) فقد برئت ذمة الله منهم -

যে জনপদে কোন মুসলান অভুক্ত থাকে তাদের থেকে আল্লাহ্র দায়-দায়িত্ব উঠে যায়।

অন্য এক হাদীসে তিনি পড়শীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খাওয়াকে ঈমানের পরিপন্থী কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

ليس بمؤمن من شبع وجاره جائع-

যে ব্যক্তি মুমিন নয় যে ব্যক্তি পেট পুরে আহার করে অথচ তার পড়শী অনাহারী থাকে।

আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে :

كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم-

যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে পড়ে।[৮]

বলা যায় যে, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃত দেওয়ার পর যাতে পুঁজিবাদের অশুভ অবস্থার সৃষ্টি না হয় সে জন্য তিন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

---

৫. সূরা কাসাস : ৭৭।

৬. সূরা বাকারা : ২৬১।

৭. সূরা আত্ তওবা : ৩৪।

৮. সূরা আল হাশর : ৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. দ্বীনী প্রতিরোধ : অর্থাৎ ব্যক্তি অবাধ মালিকানার অধিকার লাভ করার পরও তাকে শরী'অতের সীমারেখার মধ্যে থেকেই আয়-উপার্জন করতে হবে-এই ঘোষণা ইসলাম দিয়ে রেখেছে। ফলতঃ ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে ব্যক্তিকে সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা ও সকল প্রকার হারাম লেনদেন পরিহার করে চলতে হয়, অথচ ঐসব লেনদেনের মাধ্যমেই ব্যক্তি রাতারাতি পুঁজিপতি বনে যায়।

২. রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ : ইসলাম স্বাভাবিক অবস্থায় বাজার ব্যবস্থার উপর যদিও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয় না কিন্তু যদি কেউ বাজার ব্যবস্থার উপর দখলদারিত্ব সৃষ্টি করতে চায় কিংবা যদি স্বাভাবিক বাজার দরে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চায়; তাহলে সে ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার ইসলাম রাষ্ট্রকে দিয়েছে।

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এর সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

من دخل فى شيئ من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقذفه فى معظم من النار ورأسه اسفله- اخرجه وبيهقى واحمد-

যে ব্যক্তি মুসলমানদের বাজারদর চড়িয়ে দেওয়ার মানসে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করবে, তাকে মাথা নিচ দিকে দিয়ে কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করার অধিকার আল্লাহ্র রয়েছে।

একবার হযরত হাতিব ইব্ন আবী বালতা (রা.) স্বাভাবিক বাজার দরের চাইতে কম দামে কোন দ্রব্য বিক্রি করছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে বললেন :

اما ان تزيد فى السعر واما ترفع من سوقنا- اخرجه مالك وعبد ابن حميد والبيهقى-

হয়ত তুমি তোমার দ্রব্যের দাম বাড়াবে, না হয় তুমি আমাদের বাজার থেকে উঠে যাবে।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে দাম ব্যবস্থায় কোন প্রজার জটিলতা দেখা দিলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে।

৩. নৈতিক প্রতিরোধ : অর্থাৎ ইসলাম মানুষের মাঝে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সদাচারের অনুভূতি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে এবং নিজে ত্যাগ স্বীকার করে অন্যের উপকার করার চেতনা সৃষ্টি করেছে। ইরশাদ হয়েছে :

يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة-

দানশীলতায় অগ্রগামী হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছে, দুনিয়ার লোভ লালসা ভোগ বিলাস থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছে, কৃপণতাকে জঘন্য মনোবৃত্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। সর্বোপরি ইসলাম মানুষকে এমন একটি চেতনার উপর গড়ে তুলতে চেয়েছে-যাতে সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে মানুষের জীবনের মৌলিক লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত রক্ষা হয়নি বরং তাক্ওয়ার ভিত্তিতে জীবন গড়ে তুলে পরকালের সফলতা অর্জনকে জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মতবাদসমূহের সারকথা

ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সারকথা

১. অবাধ ব্যক্তি মালিকানা।

২. বেসরকারী উদ্যোগের অবাধ সুযোগ এবং সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ অধিকার।

৩. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা।

৪. ভোক্তার স্বাধীনতা।

৫. অবাধ প্রতিযোগিতা।

৬. মুনাফায় একচেটিয়া অধিকার এবং সে লক্ষ্যে সকল কাজ-কর্ম।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সারকথা

১. সকল সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

২. উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোন সুযোগ না রাখা।

৩. একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে চাহিদা ও উৎপাদনের অনুপাত নির্ধারণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিষদের নির্দেশে যাবতীয় কাজ-কর্মের আঞ্জাম।

৪. ভোক্তাদের স্বাধীনতাও এ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত থাকে। ইচ্ছা করলেই কেউ যথেষ্ট পরিমাণ ভোগ করতে পারে না।

মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার সারকথা

১. এ ব্যবস্থায় সম্পদে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানা উভয়টিই বিদ্যমান থাকে।

২. সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি কাজ করে। মূলতঃ এ ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

৩. ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত সকল উৎপাদনশীল খাত ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে সরকার সবক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে।

৪. ধনতন্ত্রের মত স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। যে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী বিধি-নিষেধ দ্বারা আংশিক নিয়ন্ত্রিত থাকে।

৫. ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী এ ব্যবস্থায় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়। ভোক্তারাও আপন ইচ্ছানুযায়ী ভোগ করতে পারে। তবে বৃহত্তর স্বার্থে সরকার অনেক সময় বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. অবাধ মুনাফা অর্জনের অধিকার এ ব্যবস্থায় থাকে। তবে সরকার জনকল্যাণের স্বার্থে দাম ও মুনাফা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সারকথা

১. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় সম্পদের মালিকানা আল্লাহ্‌র। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض-

তুমি কি জান না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর।[৯]

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ واليه ترجعون-

অতএব পবিত্র তিনি, যার হাতে সবকিছুর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[১০]

যেহেতু সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্‌র, সুতরাং মানুষ কেবল তাদের বৈধ দখলদারিত্বের মাধ্যমে এই সম্পদ ভোগের অধিকার লাভ করতে পারবে।

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده-

নিশ্চয়ই ভূ-পৃষ্ঠ আল্লাহ্‌র, তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এর উত্তরাধিকার দান করেন।[১১]

২. যেহেতু সবকিছুর চূড়ান্ত মালিকানা আল্লাহ্‌র, তাই আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবিকা অর্জন ও যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলী আঞ্জাম দিতে হবে। তাঁর বিধান ডিঙ্গাবার অধিকার নেই কারো।

ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير-

আসমান ও যমীনের আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন।[১২]

انا نحن نرث الارض ومن عليها واليا يرجعون-

আমিই ভূ-পৃষ্ঠের একমাত্র উত্তরাধিকারী, এবং যা কিছু তার উপর রয়েছে তারও। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন।[১৩]

৩. যেহেতু ইসলাম সমস্ত সম্পদের মূল মালিক আল্লাহকে মনে করে এবং ব্যক্তিকে সেই সম্পদে সাময়িক কালের জন্য আমানতদার মনে করে; এ জন্যই একচ্ছত্র ব্যক্তি মালিকানার বিশ্বাসের ফলে আমিত্ব ও অহংকারের ন্যায় প্রবৃত্তিগুলো ব্যক্তির মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা জন্মে না।

৪. ইসলামী অর্থনীতিতে বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক উন্নতির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে নৈতিকতার সীমা ডিঙ্গিয়ে অন্যের ক্ষতি করে অর্থ সম্পদ আহরণের বিষয়টিকে মোটেও অনুমোদন দেওয়া হয় না। ধোকা, প্রতারণা, জালিয়াতি, কালোবাজারী, মওজুতদারী, ভেজাল মিশ্রণ, জুলুম, শোষণ ইত্যকার পন্থায় সম্পদ আহরণের অনুমোদন দেওয়া হয়।

---

৯. বাকারা : ১০৭।

১০. ইয়াসীন : ৮৩।

১১. সূরা আ'রাফ : ১২৮।

১২. আলে ইমরান : ১৮০।

১৩. মারইয়াম : ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين-

এই যমীন আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারিত্ব দান করেন। শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই (অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে এসব বর্জন করে তাদের জন্যই)।

৫. সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় যেহেতু সমাজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোষিত হয় তাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় কোনরূপ সুদী লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয় না।

৬. ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার কারো নেই। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ, যাকাত, সাদাকাহ ও সাধারণ জনকল্যাণের নিমিত্তে দান করে দিতে হয় অথবা উৎপাদনে নিয়োগ করার মাধ্যমে ব্যয় করে দিতে হয়। ফলে সম্পদের স্বাভাবিক আবর্তন অব্যাহত থাকে।

৭. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিকে স্বাভাবিকভাবে কার্যকর রাখা হয়। তবে এই চাহিদা ও যোগান বিধির আওতায় উৎপাদন ও ভাগ-বন্টনের যাবতীয় কার্যাবলী আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়।

৮. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য অধিক মুনাফা অর্জন নয়। বরং সমাজের মানুষের চাহিদা পূরণকল্পে হালাল ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠির সেবা করা। লভ্যাংশ যা পাওয়া যাবে তাদ্বারাও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সেবা করা। এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন :

نفقتك لنفسك صدقة ولا هلك صدقة-

তুমি নিজের জন্য যা ব্যয় করবে তা সাদাকাহ হিসাবে গণ্য হবে এবং পরিবার পরিজনের জন্য যা ব্যয় করবে তাও সাদাকাহ হিসাবে গণ্য হবে।

৯. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকে নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খাদ্য গ্রহণের পর বর্তনে যা লেগে থাকে সেই পরিমাণ সম্পদও যাতে অপচয় না হয় এজন্য রাসূল (সাঃ) বর্তন চেটে খাওয়াকে সুন্নত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যে খাদ্য মাটিতে পড়ে যায় তা কুড়িয়ে খাওয়াকেও সুন্নত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিলাস ও অপচয়ের কোন সমর্থন নেই।

১০. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইহকালীন সমৃদ্ধির সাথে সাথে পরকালীন সাফল্যের দিকটিকে সব সময় বড় করে দেখা হয় এবং পরকালীন সাফল্যকেই মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর এই পরকালীন সাফল্য নির্ভর করে স্রষ্টার সন্তুষ্টির উপর। তাই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্রষ্টার অভিপ্রায়কে সামনে রেখে তার নির্ধারিত বিধান মাফিক সব কিছু আঞ্জাম দেওয়ার জন্য মানুষ নিজ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়। তাই আইন লঙ্ঘন ও অবৈধ পন্থা অবলম্বনের প্রবণতা কখনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে না। মানুষ নিজস্ব তাড়নায় আইনানুগ জীবনযাপন করে। এমনকি সম্পদ মানুষের কল্যাণে সাদকাহ করে দিলে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ হয় ও তার ক্রোধ প্রশমিত হয় এই বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তি তার নিজের সম্পদ অকাতরে অন্যকে বিলিয়ে দেয়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন :

فان الصدقة تدفع غضب الرب-

'সাদাকা প্রতিপালকের ক্রোধকে প্রশমিত করে।' অন্য হাদীসে তিনি বলেন, 'সাদাকা জাহান্নামের আগুনকে নির্বাপিত করে।' সারকথা মানুষ অকাতরে সম্পদ দান করে পরকালীন সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করে। আর এ পথে সঞ্চয়ের মাধ্যমে সম্পদ কুক্ষিগত করণের মানসিকতা হ্রাস পায়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এবং সকল বিধি-বিধান আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। এজন্য কোন বাড়তি চাপের প্রয়োজন হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য

পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ইসলাম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন মানসকে এ ব্যবস্থার স্বতস্ফূর্ত আনুগত্য করার জন্য তৈরী করে। অন্যদিকে আইনের বলে মানুষের উপর এমন সব বিধি নিষেধ আরোপ করে যার ফলে মানুষ এ ব্যবস্থার চৌহদ্দীর মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য হয় এবং এর সুদৃঢ় প্রাচীর ছেদ করে যেতে পারে না। এ নৈতিক বিধি বিধান ও আইনসমূহ হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। নৈতিকতা, আইন এবং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য এসবের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

বিনিয়োগে বৈধ অবৈধের পার্থক্য

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হচ্ছে, ইসলাম এর অনুসারীদেরকে অর্থ বিনিয়োগ করার অবাধ সুযোগ দেয় না; বরং বিনিয়োগের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটা মূলনীতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ধন বিনিয়োগ বা উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। অন্যদিকে যেসব উপায় অবলম্বন করলে ধন-উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সঙ্গত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি কুর'আন মজীদে এভাবে বিবৃত হয়েছে :

> يايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما- ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف تصليه نارا-
>
> হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে (অথবা পরস্পর পরস্পরকে) ধ্বংস করো না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি করুণাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যুলুম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবো।[১৪]

এ নীতিগত নির্দেশ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করা হয়েছে :

- উৎকোচ (আল বাকারা ১৮৮ আয়াত)।
- ব্যক্তি, সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাত (আল বাকারা ২৮৩ ও আলে ইমরান ১৬১ আয়াত)।
- চুরি (আল মায়িদা ৩৮ আয়াত)।
- এতীমের অর্থ অন্যায়ভাবে তসরূপ (আন নিসা ১০ আয়াত); ওজনে কম করা (আল মুতাফ্ফিফীন ৩ আয়াত)।
- চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসা (আন নূর ১৯ আয়াত)।
- বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ (আন নূর ২, ৩৩ আয়াত)।

---

১৪. আন নিসা : ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

- মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসা ও মদ পরিবতন (আল মায়িদা ৯ আয়াত)।
- জুয়া ও এমন সব উপায় উপকরণ যেগুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যক্রমে একদল লোকের সম্পদ অন্য একদল লোকের নিকট হস্তান্তরিত হয় (আল মায়িদা ৯০ আয়াত)।
- মুর্তি গড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা (আল মায়িদা ৯০ আয়াত)।
- ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষির ব্যবসা (আল মায়িদা ৯০ আয়াত)।
- সুদ খাওয়া (আল বাকারা ২৭৫, ২৭৮ থেকে ২৮০ এবং আলে ইমরান ১৩০ আয়াত)।

ধন সম্পদ বিনিয়োগ না করে সঞ্চয় করা নিষেধ

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে যে, বৈধ উপায়ে যে ধন উপার্জন করা হবে তা পুঞ্জীভূত করে রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে ধনের আবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং ধন বণ্টনে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে পুঞ্জীভূত করে রাখে সে নিজে যে কেবল মারাত্মক নৈতিক রোগে আক্রান্ত হয় তাই নয় বরং মূলত সে সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি জঘন্যতম অপরাধ করে। এর ফল তার নিজের জন্যও খারাপ হয়। এজন্য কুর'আন কার্পণ্য এবং কারূণের ন্যায় সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করে রাখার বিরোধিতা করেছে কঠোরভাবে। কুরআন বলে :

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم-

যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক; বরং প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর।[১৫]

والذين يكنزون الذهب والافضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم-

যারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।[১৬]

এই ঘোষণা পুঁজিবাদের ভিত্তিতে আঘাত হানে। উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করে রাখা এবং জমাকৃত অর্থ আরো অধিক অর্থ সংগ্রহে খাটানো-এটিই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূলকথা। কিন্তু ইসলাম আদতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে রাখা পছন্দ করে না।

অর্থ ব্যয়ের পন্থায় বিনিয়োগ

সঞ্চয় করার পরিবর্তে ইসলাম অর্থ ব্যয় করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ব্যয় করার অর্থ বিলাসিতা ও আরামের জীবন যাপন করে দু-হাতে অর্থ লুটানো নয়; বরং ব্যয় করার ক্ষেত্রে 'আল্লাহ্র পথে'র শর্ত আরোপ করে। অর্থাৎ সমাজের কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজে তার অর্থ পুনঃ পুনঃ বিনিয়োগের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে। এটিই হবে আল্লাহ্র পথে ব্যয়।

ويسئلونك ماذا ينفقون- قل العفو-

---

১৫. আলে ইমরান : ১৮০।

১৬. আত তাওবা : ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কী ব্যয় করবে? তাদেরকে বলে দাও, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় কর)।[১৭]

وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتمى والمسكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم-

আর সদ্ব্যবহার কর নিজের মা বাপ, আত্মীয়স্বজন, অভাবী, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, নিজের বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও মালিকানাধীন দাসদাসীদের সাথে।[১৮]

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم-

তাদের অর্থ সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।[১৯]

এখানে এসে ইসলাম ও পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়।

বিত্তবান মনে করে, অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে, অর্থ ব্যয় করলে অর্থ কমে যাবে না বরং এতে বরকত হবে ও বৃদ্ধি হবে, বিনিয়োগের পন্থায় অর্থ সঞ্চালিত হবে।

الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا-

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয়; কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন।[২০]

বিত্তবান মনে করে কোনো কিছু ব্যয় করা হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, তা নষ্ট হয়ে যায়নি বরং তার সর্বোত্তম লাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসবে।

وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون-

সৎ কাজে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে এবং তোমাদের উপর কোনোক্রমেই যুলম করা হবে না।[২১]

وانفقوا مما رزقنهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور- ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله-

যারা আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে, যাতে কোনোক্রমেই লোকসানের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন বরং মেহেরবানী করে তাদেরকে আরো বেশী দান করবেন।[২২]

বিত্তবান মনে করে, সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, সুদের মাধ্যমে বরং সম্পদ কমে যায়। সৎকাজে অর্থ বিনিয়োগ করলেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

يمحق الله الربوا ويربى الصدقت-

আল্লাহ সুদ নির্মূল করেন এবং দান-সাদকাকে প্রতিপালন ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।[২৩]

---

১৭. আল বাকারা ; ২১৯।

১৮. আন নিসা : ৩৬।

১৯. আয যারিয়াত আয়াত : ১৯।

২০. আল বাকারা : ২৬৮।

২১. আল বাকারা : ২৭২।

২২. ফাতির : ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون-

তোমরা এই যে সুদ দাও মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধির আশায়, জেনে রাখ, আল্লাহর নিকট তা কখনো বৃদ্ধি লাভ করে না। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ যে অর্থ দান করে থাক একমাত্র তার মধ্যেই ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।[২৪]

উল্লেখ্য, পুঁজিপতি যদি কখনো সৎকাজে কোনো অর্থ ব্যয় করে তাহলে তার পিছনে তার আবেগ ও সদিচ্ছা থাকে না; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেই তা করে থাকে এবং এজন্য সে সবচেয়ে নিকৃষ্টমানের সম্পদ ব্যয় করে; তারপর নিজের শাণিত বাক্য-বাণে বিদ্ধ করে অর্থগ্রহীতার অর্ধেক প্রাণ বের করে নেয়। বিপরীত পক্ষে ইসলাম সবচেয়ে ভালো সম্পদ ব্যয় করা এবং এজন্য নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ না করা, এমনকি প্রতিদানে কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এ আশাও পোষণ না করার শিক্ষা দেয়।

انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون-

তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছো, আর যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর; আর বাছাই করে নিকৃষ্টতর বস্তু ব্যয় করো না।[২৫]

لا تبطلوا صدقتكم بالمن والاذى-

অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদকাসমূহ ধ্বংস করো না।[২৬]

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا- انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور-

আর তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকীন, এতীম ও কয়েদীকে আহার করায় এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (এজন্য) আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশী নই।[২৭]

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি মানসিকতার মধ্যে বিপুল ব্যবধান বিদ্যমান। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দু'টি মতাদর্শের মধ্যে ইসলামই হচ্ছে অধিক শক্তিশালী এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে অধিতর নির্ভুল।

যাকাত-এর পন্থায় অর্থ বিনিয়োগ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ধন একস্থানে পুঞ্জিভূত ও কুক্ষিগত হয়ে থাকতে পারবে না; ইসলামী সমাজের যে কয়কজন লোক তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের কারণে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ আহরণ করবে, ইসলাম চায় তারা যেন এই সম্পদ পুঞ্জিভূত করে না রাখে, বরং এগুলো যাকাতের পন্থায় এমনভাবে বিনিয়োগ করতে যাতে সেখান থেকে ধনের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্পবিত্তের লোকেরাও যথেস্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম

---

২৩. আল বাকারা : ২৭৬।

২৪. আর রূম : ৩৯।

২৫. আল বাকারা : ২৬৭।

২৬. আল বাকারা : ২৬৪।

২৭. আদ দাহর : ৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

হবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম একদিকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান, উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করে। যাতে লোকেরা নিজেদের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা আকাংখা অনুযায়ী ধনসম্পদ সঞ্চয় করাকে খারাপ জানবে এবং তা যাকাতের পন্থায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হবে। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীকে নামাযের পরে এ যাকাতের উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ সঞ্চয় করে, যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তার ঐ সম্পদ হালাল হতে পারে না।

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها-

(হে নবী!) তাদের ধনসম্পদ থেকে একটি সাদকা গ্রহণ কর, যা ঐ ধনসম্পদকে পাক পবিত্র ও হালাল করে দেবে।[২৮]

অন্য আয়াতে যাকাতের অর্থ কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করতে হবে এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

انما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل-

মূলত সাদকা-যাকাত হচ্ছে ফকির[২৯] ও মিসকীনদের[৩০] জন্য এবং তাদের জন্য।

মীরাসী আইনের মাধ্যমে বংশ পরিক্রমায় অর্থ বিনিয়োগ

নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগ, আল্লাহ্‌র পথে বিনিয়োগ ও যাকাত আদায় করার পরও যে অর্থসম্পদ কোনো একহাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে তাকে বিকেন্দ্রীভূত করার জন্য ইসলাম আর একটি পন্থা অবলম্বন করেছে। একে বলা হয় মীরাসী আইন। এ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে তা যতো কম বা বেশী হোক না কেন, তা কেটে টুকরো টুকরো করা হবে এবং নিকট ও দূরের সকল আত্মীয়ের মধ্যে ক্রমানুসারে বণ্টন করা হবে। যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে, যার কোনো ওয়ারিশ নেই, তাহলে তাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার অধিকার দেয়ার পরিবর্তে, তার সম্পদ মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা করে দিতে হবে। তাহলে সমগ্র জাতি এ থেকে লাভবান হতে পারবে। মীরাস বণ্টনের এ আইনের অস্তিত্ব একমাত্র ইসলামেই দেখা যায়, অন্য কোনো অর্থব্যবস্থায় এর অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য অর্থব্যবস্থা এ ব্যাপারে যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা এক ব্যক্তি যে অর্থ সঞ্চিত করে রেখে যায়, তার মৃত্যুর পর তা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট কেন্দ্রীভূত রাখতে চায়।[৩১] কিন্তু ইসলাম সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতি, এর ফলে অর্থের বিনিয়োগ সহজতর হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে স্তরে স্তরে।

---

২৮. আত তাওবা : ১০৩।

২৯. ফকির এমন সব লোকদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে কম রোজগার করার কারণে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। -লিসানুল আরব

৩০. মিসকীনদের সংজ্ঞা বর্ণনা করে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন : 'যারা অর্থ উপার্জন করতে পারে না অথবা অর্থ উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে যে দরিদ্র শিশু এখনো অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা রাখে না এবং যেসব বেকার ও রুগ্ন ব্যক্তি সাময়িকভাবে উপার্জনের যোগ্যতা বঞ্চিত তারা সবাই মিসকীন।

৩১. জেষ্ঠ্য পুত্রের উত্তরাধিকার (Primogeniture) এবং একান্নবর্তী পরিবার (Joint Family System) প্রথা এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয়ভাবে বিজিত সম্পত্তি বিনিয়োগ

এ ক্ষেত্রেও ইসলাম একই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। যুদ্ধে সেনাবাহিনী যে গনীমতের অর্থ (শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ) হস্তগত করে, সে সম্পর্কে ইসলাম একটি বিশিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে। এ অর্থসম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। চারভাগ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং অবশিষ্ট একভাগ সাধারণ জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার জন্য রেখে দেয়া হয়।

واعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل-

জেনে রেখো, গনীমত হিসেবে তোমরা যা কিছু হস্তগত কর, তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ্র তাঁর রাসুল, রাসূলের নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।[৩২]

আল্লাহ্ ও রাসূলের অংশ বলতে এমন অংশকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের আওতাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া যুদ্ধের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র যেসব সম্পদ সম্পত্তির মালিক হয় ইসলাম সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন রাখার বিধান দিয়েছে।

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل- كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ... للفقراء المهجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ... والذين تبوؤ الذار والايمان من قبلهم... والذين جاءوا من بعدهم-

জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে আল্লাহ্ 'ফায়' (বিনাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের যেসব সম্পদ হস্তগত হয়) হিসেবে যা কিছু দান করেছেন তা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, রাসূলের নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে এগুলো কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। ... আর এর মধ্যে অভাবী মুহাজিরদেরও অংশ রয়েছে, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সহায় সম্পদ থেকে বেদখল করে নির্বাসিত করা হয়েছে। ... আর তাদের অংশ রয়েছে যারা মুহাজিরদের আসার আগে মদীনায় ঈমান এনেছিল। ... আর তাদের পরে ভবিষ্যতে আগমনকারী বংশধরদেরও অংশ রয়েছে।[৩৩]

এ আয়াতগুলোতে কেবলমাত্র 'ফায়লব্ধ' অর্থের ব্যয়ক্ষেত্রগুলোর বিশদ বর্ণনা করা হয়নি; বরং এইসঙ্গে যে উদ্দেশ্যে ইসলাম ফায়লব্ধ অর্থসম্পদ বন্টন তথা সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে সেদিকেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ :

كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم-

'অর্থসম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।' কুরআন মজীদ ছোট একটি বাক্যের মধ্যে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছে সেটিই হচ্ছে সমগ্র ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর।

---

৩২. সূরা আনফাল : ৪১।

৩৩. আল হাশর : ৭-১০।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার পার্থক্য

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ-নির্যাতন শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও গরীব শ্রেণীকেও অধিকার-সচেতন করে তোলে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে অধিকার আদায়ের জন্য তারা সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে সংগঠন গড়ে তোলে। এমনকি তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ তাদের প্রতি সমর্থন জানানো শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েত রাশিয়ার মত বিরাট দেশে মেহনতী মানুষের বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কার্লমার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কায়েম করা হয়। এই ব্যবস্থা দাবি করছে, সে গণস্বার্থের আহ্বায়ক এবং শ্রমিক, কৃষক ও নির্যাতিত নিপীড়িত শ্রেণীর সমর্থক।

এজন্য এ ব্যবস্থার সাথেও ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। আর তা নিছক ধর্মের অনুসরণ ও সুধারণার ভিত্তিতে নয়; বরং উভয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিমালা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে নিরপেক্ষ ও ন্যায়নীতির সাথে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের সূচনা হয়। হেগেল সর্বপ্রথম একটি দার্শনিক চিন্তাধারা হিসাবে এই মতবাদ পেশ করেন। তিনি এটাকে অর্থনৈতিক বিষয়ের মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করেন। তাঁর এই মতবাদকে অর্থনৈতিক জীবনদান তথা সামাজিক দুর্নীতি ও কর্মসূচীর রূপদানকারী ব্যক্তি হলেন কার্লমার্কস।[৩৪] ১৯১৭ এই মতবাদই সোভিয়েত ইউনিয়নে 'কম্যুনিজম' রূপে[৩৫] বাস্তবায়ন এবং সারা বিশ্বে বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্য তৎপর ছিল।

এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে যেসব কথা বলা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম যে পরিপূর্ণ বিধানের নাম, তার সাথে সমাজবাদের (কম্যুনিজমের)-ও একাত্মতা সম্ভব নয়। কারণ কার্লমার্কস ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট নেতা যে দর্শনের উপর (মার্কসবাদের) বুনিয়াদ রচনা করেছেন, তার প্রথম সারিতে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাস। এজন্য তার চরিত দর্শনও এই আলোকেই প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুতরাং এই মতবাদের ধর্মস্থান দর্শনের সাথে কোন সম্পর্ক কায়েম হতে পারে না। কিন্তু আমরা যখন মার্কসীয় দর্শনের শুধু অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করি এবং পৃথিবীর অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় একে সামনে রাখি তখন এই প্রতিষ্ঠিত সত্য প্রকাশে আমাদের সংকোচ থাকা উচিত নয় যে, অর্থনৈতিক বিষয়ের অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রকে পরস্পরের নিকটবর্তী দেখতে পাই। যদিও কর্মপদ্ধতির বিভিন্নতার দরুন এই প্রান্তরে উভয়ের পথ সম্পূর্ণ পৃথক, তবু উভয়কে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমভাবে সোচ্চার দেখা যায়।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে।

১. 'ইহ্‌কোর' ও 'ইকতেনাজ' বা ধন-সম্পদ জমা করার মন্দ পদ্ধতি এবং সম্পদ বিশেষ শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগতকরণ ইসলাম ও সমাজতন্ত্র কেউই বৈধ মনে করে না। উভয়ে এই দুইটি বিষয়কে বাতিল ও অর্থনৈতিক জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করে।

---

৩৪. এই আন্দোলনে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের দার্শনিক ও বাস্তব প্রচেষ্টারও বিরাট অবদান রয়েছে।

৩৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদ এখনো সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে রয়েছে। কম্যুনিজম স্তর অনেক পরের ব্যাপার। - অনুবাদক।

Dhaka University Institutional Repository

২. উভয়ে এ বিষয়টি অত্যাবশ্যক মনে করে যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ সাধারণ মানুষের আর্থিক কল্যাণ বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সবাইকে তার জীবনোপায়ের অংশ পেতে হবে এবং কেউই তা থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

৩. উভয়ের দাবি হলো, অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে ভৌগোলিক, শ্রেণীগত, বংশগত, পারিবারিক বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ সমান অধিকারী হিসাবে পরিগণিত হবে।

৪. উভয়ের মধ্যে এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, ব্যক্তির অধিকারের চাইতে সামাজিক অধিকার অগ্রাধিকার পাবে।

৫. উভয়ের মধ্যে এ বিষয়টিও স্বীকৃত যে, আর্থিক শোষণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শাসক-শাসিত ও প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কায়েম হতে পারবে না। সেখানে এরূপ অবস্থা বিরাজ করছে, তা ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে উভয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুইটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এগুলোতে কোন প্রকারেই সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায় না। এই পার্থক্য আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠে যখন সমাজবাদের শেষ ধাপ কম্যুনিজমের রূপ সামনে আসে। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ায়[৩৬] এই শেষ স্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতমুখী বিষয় দুটি হলো :

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
১. ধন-সম্পদ ও উৎপাদন মাধ্যমে ব্যক্তি-মালিকানার স্বীকৃতির সাথে সাথে তার সীমা নির্ধারণ করতে হবে।	১. ধন-সম্পদ ও উৎপাদন মাধ্যম থেকে ব্যক্তি মালিকানা নির্মূল করে দিতে হবে।
২. জীবনোপায়ের অধিকারে সমতার স্বীকৃতির সাথে সাথে জীবন ব্যবস্থার দিক থেকে মর্যাদাগত পার্থক্য স্বীকার করতে হবে এবং এই সঙ্গে সম্পদ কুক্ষিগত করণ থেকে বিরত রাখতে হবে।	২. জীবনব্যবস্থার দিক থেকে কোন প্রকার মর্যাদাগত পার্থক্য অস্বীকার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সমাজে সমতা স্বীকার করতে হবে।

প্রথম মতানৈক্যের বিষয়টি এদিক থেকে প্রণিধানযোগ্য যে, উপার্জন ও উপার্জন-মাধ্যমের উপর যদি ব্যক্তি-মালিকানার কোন প্রভাব না থাকে তা'হলে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার বিচারে তাতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। কারণ ব্যক্তি-মালিকানার ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে সবকিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তর করার পর মানুষের কর্মক্ষমতায় যে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে না, যা ব্যক্তি-মালিকানা অবস্থায় হতে পারে। কেননা, প্রত্যেকে এরূপ ভাবতে বাধ্য হবে যে, আমার সকল প্রকার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনের কার্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্বে এবং রাষ্ট্রের সাথে তা সম্পৃক্ত। এরূপ অবস্থায় কেন আমি আমার মানসিক,

৩৬. সোভিয়েত রাশিয়ার সবগুলো প্রজাতন্ত্রই বর্তমানে পৃথক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক ও সক্রিয় ক্ষমতাকে অধিক পরিশ্রমে নিয়োজিত করব এবং জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায়ই বা কেন অধিক উপার্জনের চেষ্টা করব? কাজ করলে যা পাব, না করলেও তো তাই পাব। এ থেকে তো আমি বঞ্চিত হব না। সুতরাং অধিক কাজ করে কি লাভ?

পক্ষান্তরে, ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকার করে নেয়ার যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় যেসব অনিষ্ঠের সৃষ্টি হয় এবং যেসব সামাজিক ক্ষতির আশংকা রয়েছে, সেগুলো প্রতিরোধ করে মানসিক ও শারীরিক কর্মশক্তিকে নিজের স্বভাবজাত বিকাশ অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেয়া হলে এই কর্মপদ্ধতিই সুষ্ঠু হতে পারে। বস্তুত সোভিয়েত রাশিয়ার বিগত দশসালা পরিকল্পনা সংশোধনকালেও এর সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনীতে বলা হয়েছে, অনেক জমি বেকার পড়ে থাকায় এবং উৎপাদনের গতি মন্থর হওয়ার দরুন নতুন দশসালা পরিকল্পনায় জমিতে একটা সীমা পর্যন্ত ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। কোন কোন স্থানে উৎপাদন মাধ্যমেও ব্যক্তি-মালিকানা প্রবেশ করছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য লাভের এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয় যে, ইসলামের চিন্তাধারা ও মূলনীতিকেই কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

আর তাই পবিত্র কুরআন বলেছে, সবকিছুর প্রকৃত মালিক হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা। এজন্য তোমাদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদে আল্লাহ্র বান্দাদের বিরাট অংশ রয়েছে। তার মধ্যে সামাজিক অধিকার হলো সবার আগে। অপরদিকে ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকার করে মানুষের মানসিক ও শারীরিক কমক্ষমতায় প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। তাদের জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করিয়ে জীবনোপায় উপার্জনের একাধিক পথ খুলে দিয়েছে। তা'ছাড়া যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দিক থেকেও এটাই সঠিক যে, ব্যক্তি-মালিকানার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। অতপর ব্যক্তির উপর সামাজিক বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون-

তোমরা কখনো পূণ্য লাভে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না নিজের প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করো।[৩৭]

এ জন্যই আইনগত ও বাধ্যতামূলক উপায়ে ব্যক্তি-মালিকানার ধারাও সমাজ তথা সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে আশংকা করা হয় যে, উৎপাদন ও উৎপাদন-মাধ্যমে ব্যক্তি-মালিকানার সামান্য অবকাশ থাকলেও ঘৃণ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই ছিদ্রপথে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে যাবে। মূলত এই আশংকা ঠিক নয়। কারণ ব্যক্তি-মালিকানা একটা সীমা পর্যন্ত স্বীকার করে নেয়ার পর তা সীমাহীন হওয়া ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপকরণ হওয়ার পথে যদি কোন প্রকার প্রতিরোধমূলক আইন-কানুন না থাকে কেবল তখনই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলাম নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকার করে নেয়ার পর তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কতকগুলো আইন-কানুনও উল্লেখ করেছে। এসব আইন-কানুন ব্যক্তি-মালিকানাকে সমাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার থেকে বিরত রাখে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাথা গুঁড়ো করার জন্য সে তার আইনের কুঠার ব্যবহার করে থাকে। এমতাবস্থায় একটি কাল্পনিক আশংকায় মানুষকে তার স্বভাবজাত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অত্যন্ত অন্যায় ও অবিচার প্রসূত হবে।

---

৩৭. সূরা আল-ইমরান : ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে দ্বিতীয় মতানৈক্য হলো জীবনোপায়ের মর্যাদা সম্পর্কিত। ইসলাম জীবনোপায়ের অধিকারের সাম্যকে স্বীকার করে; এমনকি অত্যাবশ্যকীয় মনে করে। অর্থাৎ ইসলাম এ কথা স্বীকার করে না যে, সবার অবশ্যই একই ধরনের জীবনোপকরণ হতে হবে। তবে সে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে যে সবই জীবনোপকরণ হতে হবে এবং প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির পথ সবার জন্য সমভাবে অবারিত থাকবে। পক্ষান্তরে, সমাজতন্ত্র জীবনোপায়ে অধিকারের সমতার সাথে সাথে মূল জীবনোপায়েও সমতার সমর্থক। সে জীবনোপায়ে মর্যাদা বা শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। সে বলে-জীবন-ব্যবস্থার এই পার্থক্য স্বভাবজাত নয়, বরং খোদ সমাজ তা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং সমাজের জীবনব্যবস্থা যদি সমতার নীতিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় তা'হলে তাতে ভিন্ন ধরনের মানসিক তৎপরতা সৃষ্টি হবে। ফলে জীবনোপায় কারখানার সকল তৎপরতা সেভাবেই অব্যাহত থাকবে।

এই দ্বিতীয় মতানৈক্যটির প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে স্বীকার করতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে ও ইসলাম-নির্দেশিত পথই সঠিক। এটা একটা স্পষ্ট ব্যাপার যে, সকল মানুষের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা সমান নয়। আর তাই জীবনোপায় প্রচেষ্টার পরিণামে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অবস্থায় জীবনোপায়ে সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা কিছুতেই সুষ্ঠু হতে পারে না। আর এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয় যে, এ ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর মানসিক তৎপরতাও অনুরূপ খাতে রূপান্তরিত হবে, যার দরুন জীবনোপায় কারখানাও অনুরূপ তৎপরতায় চালু থাকবে।

মোটকথা, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার পার্থক্য মেনে নেয়ার পর জীবনোপায়ের পার্থক্যও স্বভাবজাত হয়ে যায়। এজন্যই পবিত্র কুরআন এদিকে পথ-প্রদর্শন করছে যে, এই পার্থক্য প্রকৃতিজাত ব্যাপার। আর বিশ্ব কারখানার স্বভাবজাত শক্তিগুলোর অগ্রগতির জন্য এরূপ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। যদি এরূপ না হতো এবং সবার অবস্থা সমান হতো তা'হলে কখনো প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি হতো না। সকল শক্তি অগ্রগতি লাভের সুযোগ কখনো পেত না। আর এই সুযোগ না হলে সমাজ জীবনের যেসব তৎপরতার উপর বিশ্ব ব্যবস্থার এই কারখানা চলছে সেগুলো সবই শীতল হয়ে পড়ত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق-

আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকার ক্ষেত্রে তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[৩৮]

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات-

আমিই পার্থিব জীবনে তাদের (মানুষের) জীবনোপকরণগুলো বণ্টন করে দিয়েছি। এবং সবাইকে সমমর্যাদায় রাখা হয়নি। কিন্তু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৩৯]

وهو الذى جعلكم خلئف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما اتكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم-

তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি পৃথিবীতে তোমাদের এককে অপরের স্থলবর্তী করেছেন। এবং তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে, তাতে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠ

---

৩৮. সূরা নাহল : ৭১।

৩৯. সূরা যুখরুফ : ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা প্রদান করেছেন। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু (মন্দ কাজের) দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী।[৪০]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলোতেও এ কথাই বলা হয়েছে যে, মানব জীবনের এই আবর্তে একজন অপরজনের স্থলবর্তী হওয়ার ধারা অব্যাহত রয়েছে। একজন চলে যাওয়ার পর তার স্থলবর্তী হচ্ছে আর একজন। বিগতজনের কর্মফলের উত্তরাধিকারী হয় আগতজন। আর সব মানুষ মর্যাদার দিক থেকে সমান নয়। অধিকন্তু জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে এই মর্যাদাগত পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে তার কাজকর্মে পরীক্ষ করার জন্য। তাকে সুযোগ দেয়া হয়েছে, সে নিজের কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে কোন মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই উঁচু-নীচু মর্যাদায় কোন অবস্থায় সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি গাফিল থাকে আর কোন অবস্থায় থাকে না, তা-ও পরীক্ষা করা হয়।

ফ্যাসিবাদ কিংবা নাৎসীবাদ

ফ্যাসিবাদ[৪১] চিন্তাধারা বা দর্শন দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কিন্তু পরিণাম বা ফলশ্রুতির দিক থেকে এটি উল্লিখিত কয়েকটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. সকল উৎপাদন উপায়মুক্ত হতে হবে এবং তার কল্যাণ বা উপকারিতা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে হবে;

২. উৎপাদনের মূলনীতি হবে জনস্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিক। আর তাই উৎপাদন নীতি প্রয়োজন অনুযায়ী না হয়ে ব্যক্তিস্বার্থে অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।

৩. উক্ত দুইটি উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য এরূপ রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও অগ্রগতি আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

উক্ত সংক্ষিপ্ত মূলনীতি ক'টির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রথমে ফ্যাসিবাদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

মানব সমাজে কোন-না-কোন রূপে আত্মপ্রকাশ ও প্রচার-প্রসারের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সব সময় প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং সে তার প্রচেষ্টায় সফলতাও লাভ করেছে।

অদূর অতীতে এই ধরনের প্রচেষ্টার উন্নত ব্যবস্থা 'ফ্যাসিবাদ' নামে অভিহিত। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জার্মানী ও ইতালীকে এই ফ্যাসিবাদ বিশেষভাবে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ফ্রান্স এবং বৃটেনকেও প্রায় জয় করে ফেলেছে। মার্কন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানও তার জন্য দোলনা সেজে বসে আছে।

প্রায় পনের শ' শতাব্দী থেকে ইউরোপে অজ্ঞতার অবসান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগের সূচনা হয়। এ সময় থেকে ইউরোপের কোন কোন রাষ্ট্র আধুনিক অনুসন্ধান ও ধন-সম্পদ লাভের নেশায় বিশ্বের দিকে দিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। বৃটেনে এ সময় সামন্তবাদ ও রাজতান্ত্রিক শোষণের ভরা যৌবন ছিল। ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী শ্রেণী সুসংহত হতে থাকে। কোন কোন রাজনৈতিক অবস্থা তাদের শক্তিকে আরো সুদৃঢ় করে দেয়। তারা দেশের বিরাট শক্তি হিসাবে গণ্য হতে থাকে। তাদের অধিকাংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল পশমের। ষ্টুয়ার্ট বংশ বৃটেনের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বণিকদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভীত হয়ে পড়েন। তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ শুরু করেন। এর পরিণামে

৪০. সূরা আনআম : ১৬৫।

৪১. নাজিবাদ কিংবা নাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদেরই একটি উন্নতরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

বণিক শ্রেণী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৬৪৪ সালে বৃটেনের ইতিহাসখ্যাত গৃহযুদ্ধে বণিকরা জয়লাভ করে। তারা সামন্ত প্রথা বিলোপ করে এবং রাজতন্ত্র প্রথা নামমাত্র রেখে সম্রাটের সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। এবার ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের প্রচুর সুযোগ আসে। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের মাধ্যমে তারা অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করতে থাকে।

এ সময়ে বৃটেনে সামন্ত প্রথার অবসান হলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণে ছিল না। তাতে একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। এই শ্রেণীটি ব্যক্তিগতভাবে কল-কারখানা খুলে অর্থ-সম্পদ লুটপাট আরম্ভ করে। এসবের উন্নতির জন্য আইনের মাধ্যমে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু তখনো কল-কারখানায় হাতে কাজ হতো। ফলে এসবের মাধ্যমে উপার্জন ছিল সীমিত। আর চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হতো না। এরূপ পরিস্থিতিতে ধন-সম্পদের পূজারীদের অধিক অর্থোপার্জনের আরো উত্তম পন্থা উদ্ভাবনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে দেখা যেত।

প্রায় দেড়শ' বছর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মেশিনপত্রের আবিষ্কার শুরু হয়। এবার হস্তশিল্প-কারখানাগুলোর স্থান দখল করে যান্ত্রিক কল-কারখানা; এভাবে ব্যবসায়ী ও পুঁজিবাদের উক্ত বিশেষ শ্রেণীটি সীমাহীন ধন-সম্পদ উপার্জন আরম্ভ করে।

এটা ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদন আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে হস্তশিল্পীদের উপর বিপদ নেমে আসে। ছোট পুঁজিপতিদের কাজ-কারবার বন্ধ করে দিতে হয়। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য তারা যান্ত্রিক শিল্প-কারখানায় একজন শ্রমিক হিসাবে নিজেদের শ্রম ন্যূনতম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাতে কারখানার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের যন্ত্রমালিকের দাসে পরিণত হওয়া ছাড়া বিকল্প আর কোন পথ দৃষ্টিগোচর হয় না।

চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়। বৃটেনে পশমের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করার দরুন জায়গীরদারদের সম্পদের লালসা তাদের জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করতে বাধ্য করে। তারা পশমের ব্যবসা করার জন্য জমির চারপাশে বেড়া তৈরি করে ভেড়া পালতে শুরু করে। জমিদারীর আয়ের চাইতে পশমের ব্যবসায়ে তাদের অনেক বেশি অর্থোপার্জন হতো। এই মহামারী এত বৃদ্ধি পায় যে, লাখ লাখ কৃষকের জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার ঘোর তমসা। তাতে করে বেকারত্ব দিন দিন বেড়ে চলে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা (ফ্যাসিবাদ) কি এবং এটা কিরূপে ধীরে ধীরে জনগণের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়– তা আজ বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। এই ব্যবস্থা সাধারণ শান্তিকে ভয়াবহ যুদ্ধের অগ্নিশিখায় নিক্ষেপ করে। এই ব্যবস্থা প্রথমে গণতন্ত্রের নামাবলী দ্বারা নিজের স্বরূপ আবৃত করে বিশ্বের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর প্রতারণা করে সাধারণ মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করে। যেমন বৃটেন ও আমেরিকায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই রূপ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিন্তু এই ছদ্মাবরণে তার স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়লে নামাবলী ঝেড়ে ফেলে আসল (একনায়কত্বের) রূপে বেরিয়ে পড়ে। যেমন জার্মানী, ইটালী ও জাপানে তার আসল রূপ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে।

> আর তাই এসব তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদ থেকে আলাদা কিছু ভেবে এক মুহূর্তের জন্যও প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। বস্তুত একনায়কত্ব হোক কিংবা বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হোক, এসব ক'টির মধ্যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। সবকটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

সারকথা, ইতিহাস আমাদের এই সন্ধান দিচ্ছে যে, বর্তমান পুঁজিবাদ ব্যবস্থার সূচনা হয় বৃটেন থেকে। এরপর ধীরে ধীরে তা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে জার্মানী ও ইতালীকে এই ব্যবস্থার বিরাট নেতা মনে করা হয়। অবশ্য আগ্রাসন প্রতিযোগিতায় বর্তমানে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদিও জার্মানী ও

Dhaka University Institutional Repository

ইতালীর শত্রু মনে হচ্ছে, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদেরও নীতিগতভাবে এদের পেছনে সমর্থন রয়েছে। এ ব্যাপারে সবাই অভিন্ন মত পোষণ করে। অনুরূপ জার্মানীর নাজিবাদ, মার্কিনী গণতন্ত্র, বৃটিশ গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, ইতালীর ফ্যাসিবাদ এবং জাপানের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এসব একই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন নামমাত্র অথবা একই তেলের বিভিন্ন রং বলা চলে।

ফ্যাসিবাদী অর্থব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হলো :

ইসলামের অর্থনৈতিক অবস্থা	ফ্যাসিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
১. ধন-সম্পদ ও তা উপার্জনের মাধ্যমে বিশেষ শ্রেণীর হাতে সীমিত হয়ে জনগণের জীবনোপায়ের ধ্বংসের কারণ হওয়া হারাম।	১. ধন্য-সম্পদ ও তা উপার্জনের মাধ্যমে অবশ্যই বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থে হতে হবে।
২. ব্যক্তি-মালিকানায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।	২. ব্যক্তি-মালিকানার কোন সীমারেখা নেই।
৩. ব্যক্তি-মালিকানা সামাজিক দায়িত্বের অধীন।	৩. ব্যক্তি-মালিকানা সামাজিক দায়িত্ব ও জনস্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করার উপর প্রতিষ্ঠিত।	৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।
৫. সাধারণ অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	৫. এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ধ্বংস মন্দা বাজার।
৬. অর্থনৈতিক শোষনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করা অভিশাপ।	৬. অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিকে দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃংখলাবদ্ধ করা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার।
৭. সম্পদ জমা ও কুক্ষিগত করা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন থেকে দূরে থাকার কোন অবকাশ নেই।	৭. সম্পদ জমা ও কুক্ষিগত করা অর্থনৈতিক সফলতার পূর্ব শর্ত।
৮. বংশগত, পারিবারিক, শ্রেণীগত ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য এক্ষেত্রে স্বীকৃত নয়।	৮. বংশগত, ভৌগোলিক ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

উপরিউক্ত তুলনার মাধ্যমে একথা সহজে অনুমান করা যায় যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ফ্যাসিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন অভিন্ন বিষয় নেই যার মাধ্যমে উভয়ের ভিতর সমঝোতা হতে পারে। কারণ এটা একটা স্বীকৃত ব্যাপার যে, ফ্যাসিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কয়েকশ', কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লাখ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের বধ্যভূমিতে কোটি কোটি মানুষকে বলি দেয়া হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, উক্ত ব্যবস্থা সাধারণ মন্দা বাজার ও বেকারত্বের সৃষ্টি করে পৃথিবীর সুখ-শান্তি ধ্বংস করা হয়। নির্যাতিত-নিপীড়িতদের পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করে অত্যাচারীদের হাতে ধ্বংস হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থার সাথে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এতটুকু সম্পর্ক বা সাযুজ্য নেই এবং থাকতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের অর্থনৈতিক মতাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা

এই আলোচনায় অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্য মতবাদ, বৌদ্ধ মতবাদ, ইহুদী মতবাদ এবং ইসলামের আলোচনা উপস্থাপন :

১. ধর্মের একটি দর্শন এই যে, মানুষ তার সংসার জীবনে বিশ্বের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলোকে যত বেশি এড়িয়ে চলে তার সিদ্ধিলাভও হয় তত ত্বরান্বিত। খাওয়া পরার জিনিস তো দূরের কথা, শ্বাস গ্রহণের জন্য মানুষ যে বায়ু ব্যবহার করে, দৈহিক অনুশীলনের সাহায্যে সেটাকেও যদি সে সংসার জীবনে অনাবশ্যক বস্তু বলে প্রমাণিত করতে পারে, তাহলে ধর্মীয় দৃষ্টিতে সেই হবে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ।

২. দ্বিতীয় দর্শন এই যে, মানুষ জড়বাদী এবং রক্তপিপাসু জানোয়ারে পরিণত হয়ে শুধু ভাবতে শিখুক যে, সবকিছুর উপরই আমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

৩. উপরোক্ত দু'টি চরম দর্শনের মধ্যবর্তী আর একটি দর্শন আছে এবং তা হচ্ছে– মানুষ আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর সমস্ত জিনিস মানুষের খেদমতের জন্যে। এই দর্শন অনুযায়ী বিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলোকে মানষের উপকারে যত বেশি নিয়োজিত করা যায়, আসমানি কিতাবের সত্যতাও তত বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আল-কুর'আন মানুষের সামনে যে ধর্মমত পেশ করেছে তা পরিষ্কার ভাষায়, তার অনুসারীদের উপর এ দায়ত্ব অর্পণ করে যে, বিশ্ব এবং বিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা গবেষণা করে দেখা না হবে, এগুলো মানুষের কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আসমানী কিতাবের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ হয় না বা হতে পারে না।

বর্তমানে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের যে সংঘাত চলছে, তা ইসলামী অর্থনীতির আলোকে পরস্পর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে অনায়াসে দূর করা যেতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানব সমাজকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথও নেই। ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ না করলে মানব সমাজের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ এভাবে চলতেই থাকবে এবং বেকার সমস্যা ও অভাব-অনটন আরো ব্যাপক আকার ধারণ করবে।

মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ধর্মের প্রভাব

বিভিন্ন ধর্মের নির্দেশ এবং চিন্তাধারা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে তার তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যক। ইসলামী মতাদর্শকে ভালভাবে বুঝতে হলে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বর্তমান যুগেও যে সমস্ত মতাদর্শ পেশ করে থাকেন সেগুলো সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা রাখতে হবে। অন্যথায়, বিশ্বের এই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে কোন আদর্শটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী তা বিচার-বিবেচনা করে দেখা সম্ভবপর হবে না।

শুধু আজ নয় বরং ইতিহাসের সেই অজানা যুগ থেকেই মানুষ অর্থনৈতিক সমস্যার পুরাপুরি না হলেও অন্তত আংশিক সমাধান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বর্তমান বিশ্বেও এ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণার অন্ত নেই।

একদল লোক এমন আছেন যারা বহির্জগতের চিন্তা না করে শুধু মানুষের অন্তর্জগতের কথাই চিন্তা করছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত অভাব-অনটন, দুঃখ-ব্যথা এবং বিপদ-আপদ আসে

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলোর জ্বালা যন্ত্রণাকে লাঘব করার উদ্দেশ্যেই তারা উপরোক্ত পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য মতবাদ, বৌদ্ধ মতবাদ, ইহুদী মতবাদ, ঈসায়ী মতবাদ প্রভৃতি এই একই পথ অবলম্বন করেছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা উপরোক্ত ধর্মমতগুলোর উপরই কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

ব্রাহ্মণ্য মতবাদ

গীতায় একটি শ্লোক আছে : ধোঁয়ায় যেমন আগুন চাপা থাকে, ধুলায় যেমন আয়না আবৃত থাকে, গর্ভস্থিত শিশু যেমন চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে, মানুষও ঠিক তেমনি তার কামনাসমূহের (রিপু) দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে।[৪২] মনু তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন : মনের মধ্যে যে জিনিসের কামনা জাগে সে জিনিসটি হস্তগত হওয়ার পরও মন তৃপ্ত হয় না বরং ঘি ঢাললে আগুনের তেজ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি (ঐ জিনিসটি পাওয়ার পর) কামনাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪৩] তাঁর মতে, এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে, সারথী যেমন লাগামের সাহায্যে অশ্বকে বাগে রাখে ঠিক তেমনি মানুষকেও এই কামনাগুলো থেকে ইন্দ্রিয় সমূহকে (পঞ্চ ইন্দ্রিয়) নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।[৪৪] অর্থাৎ সে যেন চোখকে দর্শন থেকে, জিহ্বাকে আস্বাদন থেকে, নাককে ঘ্রাণ নেওয়া থেকে, কানকে শোনা থেকে এবং দেহকে স্পর্শ করে বাঁচিয়ে রাখে এবং একটি নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার পর যেন বনবাসে চলে যায়। সে যেন চামড়া অথবা কাপড়ের লেংটি পরে, সকালে বিকালে স্নান করে এবং দাড়ি, গোঁফ, চুল, নখ বাড়িয়ে রাখে (অর্থাৎ এগুলো কেটে যেন পরিষ্কার না করে[৪৫]) এবং গরমের সময়ে যেন আগুন পোহায়, বর্ষার সময় যেন খোলা মাঠে কাটায় এবং শীতের সময় যেন ময়লাজীর্ণ কাপড় পরিধান করে।[৪৬] শুধু এটুকুই নয়, বরং সে যেন আরাম-আয়েশের কোনো তোয়াক্কাই না রাখে, ব্রহ্মচারী হয়ে মাটিতে যেন শয়ন করে, বৃক্ষমূলে যেন দিন কাটায় এবং আবাসস্থলের প্রতি কোনো মোহই যেন না রাখে।[৪৭]

বর্ণ-বৈষম্য

ব্রাহ্মণ্য মতবাদ সমাজের মধ্যে কর্মবণ্টনের একটি তালিকা পেশ করেছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই সমাজের মধ্যে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন বর্ণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর। ব্রাহ্মণরা হচ্ছে সমাজের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। 'তারা জন্মগতভাবেই দেবতাদের দেবতা।'[৪৮] 'ব্রহ্মা উপাসনার জোরে ব্রাহ্মণকে নিজের মুখ থেকেই সৃষ্টি করেছেন।[৪৯]

---

৪২. ভগবত গীতা, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক নং ৩৮।

৪৩. মনস্মৃতি, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক নং ৯৪।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. মনুস্মৃতি, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ৮৮।

৪৬. প্রাগুক্ত, শ্লোক ২৩।

৪৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক ২৬।

৪৮. প্রাগুক্ত, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৮৫।

৪৯. প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণদের স্থান যেমন সর্বোচ্চে তেমনি শুদ্রদের স্থান সর্বনিম্নে। কেননা 'এরা নিকৃষ্ট অঙ্গ অর্থাৎ পা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।'[৫০] ব্রাহ্মণ্য সমাজের লোক তাদের পেশা অনুযায়ী চারটি বর্ণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন :

১. ব্রাহ্মণ।

২. ক্ষত্রিয়।

৩. বৈশ্য।

৪. শুদ্র।

এগুলো ছাড়া আর একটি স্তরের লোক আছে (যেমন চণ্ডাল প্রভৃতি)– সমাজের মধ্যে যাদের কোন স্থানই নেই। চণ্ডাল এবং অস্পৃশ্য– এই দুই স্তরের লোক লোকালয়ের বাইরে অবস্থান করবে, খাদ্য-পত্র (প্লেট) প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং কুকুর ও গাধা হবে তাদের একমাত্র সম্পদ।[৫১] চণ্ডাল প্রভৃতিরা মৃতের কাপড় পরবে এবং ছিদ্রযুক্ত পাত্রে ভোজন করবে।[৫২]

বসবাস, পানাহার, পোশাক-আশাক প্রভৃতি ব্যাপারে এক জাতি (বর্ণ) অন্য জাতি হতে ভিন্ন। যে বস্তুটি এক জাতির খাদ্য তা অন্য জাতির ঈশ্বর। এক জাতি অন্য জাতির সাথে না পানাহার করতে পারবে, না উঠাবসা অথবা বিয়ে-শাদী করতে পারবে। নীচু জাতের লোক এমন দোকানে প্রবেশ করার অথবা এমন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করার যোগ্য নয়, যে রাস্তা দিয়ে উঁচু জাতের লোকেরা চলাফেরা করে।[৫৩] বেদের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য বা শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ আছে।[৫৪] এ ছাড়া গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং মনুস্মৃতিতেও বর্ণ-বৈষম্য বা জাতিভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যক্তির মর্যাদা বা পেশা তার জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রত্যেকটি জাতির পেশা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিছুতেই এক জাতি অন্য জাতির পেশা গ্রহণ করার অধিকারী নয়। যেমন– ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে দান গ্রহণ করা, শাস্ত্র শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া প্রভৃতি; ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে প্রজা পালন করা, দান করা, পৃথিবীর আরাম-আয়েশের দিকে মনোনিবেশ না করা প্রভৃতি; বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, পশুপালন প্রভৃতি; আর শুদ্রদের পেশা হচ্ছে আন্তরিকতার সাথে উপরোক্ত তিনটি জাতের সেবা করা।[৫৫]

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দৃষ্টিতে নীচু জাতের লোক লোভের বশবর্তী হয়ে যদি উঁচু জাতের পেশা গ্রহণ করে, তাহলে রাজা যেন তাকে কপর্দকশূন্য করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন।[৫৬] 'ব্রাহ্মণের সেবাই হচ্ছে শুদ্রের পরম ধর্ম। এ পুণ্যের কাজটি ছেড়ে সে যা কিছুই করবে সবই নিষ্ফল।'[৫৭] 'হে কুন্তীর সন্তান! নিজের

---

৫০. প্রাগুক্ত, অষ্টম অধ্যায়, শ্লোক ২৭০।

৫১. প্রাগুক্ত, দশম অধ্যায়, শ্লোক ৫১।

৫২. প্রাগুক্ত, শ্লোক ৫২।

৫৩. মাআ'শিয়াতে হিন্দু, ১ম খ., পৃ. ১০৪।

৫৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য ঋগবেদ দ্রষ্টব্য।

৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫৬. মনুস্মৃতি, দশম অধ্যায়, শ্লোক ৯৬।

৫৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

পেশা দূষণীয় হলেও তা পরিত্যাগ করতে নেই। কেননা আগুন যেমন ধোঁয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত তেমনি প্রত্যেকটি কাজই দোষের দ্বারা পরিবেষ্টিত।'[৫৮]

ব্রাহ্মণ্যমতে নিম্নলিখিত পেশাগুলোকে অত্যন্ত হীন এবং অপবিত্র মনে করা হয় :

'চামড়া, হাড় এবং চুল পেটে গেলে যেরূপ কষ্ট হয়, এদের সাথে ভোজন করলেও ঠিক সেরূপ কষ্ট হয়।[৫৯] আর এরা হচ্ছে, সূত্রধর, বৈদ্য (চিকিৎসক), দরজি, স্বর্ণকার, কর্মকার, অস্ত্রশস্ত্র বিক্রেতা, বণিক, সাহুকার, কৃষক, পক্ষী পালনকারী, নটনটী, গায়ক, ধোপা, কারিগর প্রমুখ।'[৬০]

বৈষম্যের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত

ব্রাহ্মণ্য সমাজে নিছক অর্থনৈতিক ব্যাপারে বৈষম্য রাখা হয়েছে। যেমন : ব্রাহ্মণের নিকট থেকে ঋনের মাসিক সুদ বাবদ শতকরা এক টাকা, ক্ষত্রিয়ের নিকট থেকে তিন টাকা, বৈশ্যের নিকট থেকে চার টাকা এবং শুদ্রের নিকট থেকে পাঁচ টাকা গ্রহণ করা হবে।[৬১] এভাবে কোন ব্রাহ্মণের চার জাতের (বর্ণের) চারটি স্ত্রী থাকলে ব্রাহ্মণ পুত্র চার ভাগ, ক্ষত্রিয় পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যপুত্র দু'ভাগ এবং শুদ্রপুত্র এক ভাগ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।[৬২] শুদ্র শুধু নিজের জাতের স্ত্রীলোককে, বৈশ্য নিজের জাত এবং শুদ্র জাতের স্ত্রীলোককে, ক্ষত্রিয় নিজের জাত এবং বৈশ্য ও শুদ্র জাতের স্ত্রীলোককে এবং ব্রাহ্মণ চার জাতের স্ত্রীলোককেই বিয়ে করতে পারে।[৬৩]

এভাবে, রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে পড়লে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কোন কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে।[৬৪] এবং বৈশ্য নিজের পেশা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে না পারলে শুদ্রের পেশা গ্রহণ করতে পারে।[৬৫] কিন্তু এর বিপরীত হতে পারবে না। অর্থাৎ নীচু জাতের লোক লোভের বশবর্তী হয়ে যদি উঁচু জাতের পেশা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তাহলে রাজা যেন তাকে কপর্দকশূন্য করে অতি শীঘ্র রাজ্য থেকে বের করে দেন।[৬৬]

বৌদ্ধ মতবাদ

মহাত্মা বুদ্ধ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্রাহ্মণ্যবাদের পেশকৃত পথকেই বেছে নিয়েছেন। বরং এও বলা যায় যে, তিনি এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর মতে :

> কোন ব্যক্তিই নির্বাণ বা মুক্তি লাভের উপযুক্ত হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের স্বভাবকে লোভ-লালসা থেকে মুক্ত করতে পারবে।

---

৫৮. গীতা, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৪৮।

৫৯. মনুস্মৃতি, চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক ৩২১।

৬০. প্রাগুক্ত, শ্লোক ১০-২১৬।

৬১. প্রাগুক্ত, অষ্টম অধ্যায়, শ্লোক ১-২।

৬২. মনুস্মৃতি, নবম অধ্যায়, শ্লোক ১৪৮।

৬৩. প্রাগুক্ত, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ১৩।

৬৪. প্রাগুক্ত, দশম অধ্যায়, শ্লোক ৮৫ ও ৯৫।

৬৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক ৯৮।

৬৬. প্রাগুক্ত, শ্লোক ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ মানুষ যেন সব সময় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে রাখে।

দুনিয়ার কিছু সংখ্যক ধর্মের মতে, বৌদ্ধ ধর্মেও পার্থিব উন্নতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ কেউ তো দুনিয়াদারীকে 'মায়া' এবং সেই শস্যদানার সাথে তুলনা করেছেন, যা শিকারী তার গুপ্ত ফাঁসের মধ্যে ছড়িয়ে রাখে; যে-ই এর উপর মুখ দেবে সেই ফাঁদে আটকা পড়বে। অতবএ, মানুষ যেন দুনিয়াকে মরীচিকা, বুদ্‌বুদ্‌ এবং স্বপ্নের ন্যায় মনে করে এবং তা থেকে নিজেকে দূরে রাখে।

মহাত্মা বুদ্ধ শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু তিনি এই শ্রেণী-বৈষম্য নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেননি। তিনি পবিত্র জীবন নির্বাহের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাম্যের উপর জোর দিয়েছেন যাতে করে নির্বাণ লাভ করা যায়।[৬৭]

ইহুদী মতবাদ

'... ইহুদী মত বিত্তশালীর ধর্ম। এই ধর্মের যা দাবী তা একজন বিত্তহীন লোক পূরণ করতে পারে না।... ইহুদী ধর্মনেতা দারিদ্র্যকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধাস্বরূপ মনে করতেন।[৬৮]

সমাজের উপর বর্ণবৈষম্যের প্রভাব

ইহুদীরা নিজেদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট এবং অন্যদেরকে সর্বনিকৃষ্ট মনে করত। 'এভাবে তারা শুধু একটি পৃথক জাতীয়তাই সৃষ্টি করেনি; বরং তারা অন্যদের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষভাবও পোষণ করত। তারা মনে করতে থাকে, তাদের সামাজিক সংস্থাদি এবং তাদের ধর্ম অন্যদের ধর্মের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত।' 'এই শত্রুতা এবং ঘৃণাদ্বেষের দরুনই হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের রোমানরা ইহুদীদেরকে মানবজাতির শত্রু বলে ঘোষণা করে।[৬৯]

ইঞ্জিল গ্রন্থ পাঠে পরিষ্কার বোঝা যায়, ইহুদীরা অ-ইহুদীর সাথে পানাহার করত না। সামিরিয়ার ঐ স্ত্রীলোকটি তাকে বললো : তুমি ইহুদী হয়ে আমার মত একটি সামিরীয় স্ত্রীলোকের কাছে কেন পানি চাচ্ছ? ইহুদীরা তো সামিরীয়দের সাথে মেলামেশা করে না।[৭০]

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইহুদীদের ধর্মীয় আইন-কানুন, অ-ইহুদীদের সাথে জিনিসপত্রের লেনদেন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। পৌত্তলিকতার সাথে কিছুমাত্র সম্পর্ক রাখে এমন লোকের কাছ থেকে একজন সাধাসিধা ইহুদীর জন্য কোন জিনিসপত্র ক্রয় করা নিষিদ্ধ। সে ধর্মীয় পর্বের তিন দিন পূর্ব থেকেই কাফিরদের সাথে কোন কারবার করতে পারবে না-- তাকে টাকা ঋণ দিতে পারবে না এবং জমি ও ঘরবাড়ীও তার কাছে ভাড়া দিতে পারবে না। জোসেফ বলেন, ইহুদীরা কোনদিনই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেনি।[৭১]

ইহুদীদের মধ্যে প্রথম থেকেই উঁচু-নীচু ভেদাভেদ এবং বিত্তের অনুপাতে মর্যাদার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন শরীফে আছে যখন 'তালুত' নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে তাঁর যোগ্যতা এবং

---

৬৭. এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা, ৫ম খ., পৃ. ৯৭৮।

৬৮. ক্রিশ্চিয়ানিটি এন্ড ইকনমিক্স : লর্ড স্টাম্প, পৃ. ২৩।

৬৯. হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন : হাইল্যান্ড, পৃ. ৭৫।

৭০. ইউহনা বা ইনজিল : চতুর্থ অধ্যায় : নম্বর নয়।

৭১. ক্রিশ্চিয়ানিটি এন্ড ইকনমিক্স, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

সততার ভিত্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করা হয় তখন এই প্রশ্ন ওঠে যে, 'আমাদের উপর আধিপত্য করার কি অধিকার তালুতের আছে? বস্তুত রাজত্ব করার প্রধান হকদার তো আমরাই, অধিকন্তু ধনদৌলতের দিক দিয়েও তাকে সমৃদ্ধ করা হয়নি।'[৭২]

জিনিসপত্র দ্বারা উপকৃত না হওয়া

যদিও ইহুদী ধর্মে ঈসায়ী মত, ব্রাহ্মণ্য মত এবং বৌদ্ধমতের ন্যায় বৈরাগ্যের শিক্ষা দেয়া হয়নি, তবুও ইহুদী ধর্মে বর্তমানে যে অনুশাসন রয়েছে তাতে বিশ্বের অধিকাংশ জিনিসই থেকেই ফায়দা গ্রহণ না করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে আমরা শুধু দু'চারটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। যথা– 'তোমরা গাভী, ষাঁড়, ভেড়া, বকরীর সর্বপ্রথম যে নর বাচ্চা হবে সেটাকে আপন খোদার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও। তুমি পশমও কাটবে না।'[৭৩] তুমি মিশ্র বুনটের কাপড়, যেমন উল এবং মখমল মিশ্রিত কাপড় কখনো পরবে না।[৭৪] 'যদি কোন ষাঁড় কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে শিং-এর আঘাতে মেরে ফেলে, তাহলে ঐ ষাঁড়কে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলতে হবে; তবে তার মাংস খাওয়া চলবে না।'[৭৫]

'ইহুদীরা শূকর ছাড়াও উট এবং খরগোশের মাংস খেত না। এ ছাড়া ষাঁড় এবং ভেড়া-বকরীর চর্বিও তারা ব্যবহার করত না।'[৭৬] চর্বি এবং মাংস ব্যবহার না করার ফলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বলা যায়, যে মহল্লায় শুধুমাত্র ইহুদীরা বসবাস করে সেখানে এই সমস্ত জিনিস বেচা-কেনা হয় না, এমনকি এগুলোর কোন দোকানও সেখানে পাওয়া যায় না।

পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ষাঁড়, ভেড়া-বকরী ইত্যাদি না পাওয়া গেলে তার বদলে কবুতর প্রভৃতিকে আগুনে পোড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এগুলোকে ইহুদীদের ভাষায় 'পোড়ানোর ভেট' 'পাপের ভেট' ইত্যাদি বলা হয়।'[৭৭] ধর্মীয় রীতিনীতির সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়। এটা বলার জন্য যে, যে কোন অর্থনীতিবিদই এ সমস্ত জিনিসকে আগুনে না পুড়িয়ে, অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার পরামর্শ দেবেন।

ঈসায়ী মতবাদ

জেনে রাখা ভাল যে, বর্তমান ঈসায়ী মতের সাথে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সম্পর্ক হচ্ছে অনেক দূর-দূরান্তের। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান ঈসায়ী মত এবং এর ধর্মবিশ্বাস (আকাইদ) সেন্ট পলেরই চিন্তাপ্রসূত। 'সেন্ট পল হযরত মসীহ (আ.)-কে দেখেনওনি এবং তাঁর থেকে উপকৃতও হননি। প্রথম প্রথম সেন্ট পল তখনকার ক্ষুদ্র ঈসায়ী দলটির উপর যুলুম-অত্যাচার করার ব্যাপারে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য পরবর্তী যুগে তিনিও ঈসায়ী মত গ্রহণ করেন।'

প্রথম তার নাম ছিল 'সল'। ঈসায়ী মত গ্রহণ করার পর তিনি 'পল' নাম গ্রহণ করেন।'

---

৭২. আল কুরআন, সূরা বাকারা : আয়াত ৪৭।

৭৩. বাইবেল, ইসতেস্না : পঞ্চদশ অধ্যায়, নং ১৯।

৭৪. বাইবেল, হিজরত : ২১ অধ্যায় : নং ৮।

৭৫. বাইবেল, ইসতেস্না : চতুর্থ অধ্যায় : নং ৭।

৭৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য লা-দি-টি-কস্ : চতুর্থ অধ্যায় : নং ২১ দ্র.।

৭৭. বাইবেল হিজরত : ২১শ অধ্যায়, নং ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট পল ঐ যুগের ইহুদী ধর্মাচার, ইরানের অগ্নি উপাসনা এবং আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত ধর্মের সাথে পবিত্র ইঞ্জিলের ধর্মমতকে মিলিয়ে সেটাকে ঈসায়ী মত নামে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেন।[৭৮]

বৈরাগ্য ছিল চার্চের ভিত্তি

মোটকথা, সেন্ট পলের ঈসায়ী মতবাদ এমন একটি ব্যবস্থা পেশ করে যার সাথে পার্থিব জগতের কোন সম্পর্ক নেই। সেন্ট পল ঐশী রাজ্যের অনুসন্ধানে ক্ষুধা-পিপাসা, অভাব-দারিদ্র, কষ্ট-পরিশ্রম, রাত্রি-জাগরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করতেন।[৭৯] কেননা, ঈসায়ীদের মতে : 'দেহের কামনা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার কামনা দেহের বিরোধী এবং এগুলোর একটি অন্যটির বিপরীত।'[৮০]

ইঞ্জিলওয়ালারা তো সমস্ত বিশ্বে এই ঘোষণা করে বেড়ায় যে, 'বিত্তশালীদের ঐশী রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন, বরং আমি তোমাদের বলি যে, বিত্তশালী ব্যক্তির ঐশী রাজ্যে প্রবেশ করার চাইতে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে একটি উটের নিষ্ক্রমণ সহজ।'[৮১] ঈসায়ী ধর্ম-সংস্কারক লুথারের মতেও অর্থনীতির বড় একটা গুরুত্ব নেই। তিনি এক জায়গায় বলেছেন

> আল্লাহ তা'আলা গাধাদেরই কিছু সম্পদ দান করেন এবং অন্যকোন প্রকারের প্রাচুর্য দান করেন না।[৮২]

ঈসায়ী ধর্মে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

আক্ষেপের বিষয় এই যে, হযরত ঈসা (আ) কোন অবকাশই পাননি। তাঁর আড়াই বছর সময়কাল অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়। তিনি এই বলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন যে :

> তোমাদেরকে বলার আমার আরো অনেক কথা আছে অথচ তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু যখন সে অর্থাৎ 'পবিত্র আত্মা' আসবে তখন সে তোমাদেরকে যাবতীয় সত্যের পথ বলে দিবে, কেননা সে নিজের থেকে কিছুই বলবে না বরং যা কিছু শুনবে তাই বলবে।[৮৩]
>
> 'যে আমাকে পাঠিয়েছিল আমি তার কাছেই যাচ্ছি....কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্র কথাই বলছি যে, আমার যাওয়াটাই তোমাদের জন্য লাভজনক। আমিনা গেলে সান্ত্বনাদানকারী তোমাদের কাছে আসবে না। আমি গেলে পর তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।'[৮৪]

পরলোকগত লর্ড স্টাম্প তাঁর 'ঈসায়ী মতবাদ ও অর্থনীতি' গ্রন্থে বলেছেন :

> ইঞ্জীল থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে নির্দেশ লাভের চেষ্টা সাধারণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ঈসায়ীদের ধর্মগ্রন্থ কোন বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক দল কিংবা অর্থনৈতিক জীবন গঠনের জন্য কোন মতাদর্শ পেশ করেনি।[৮৫]

---

৭৮. ইনজীল, পঞ্চম অধ্যায়, নং ১৭।

৭৯. ইনজীল, একাদশ অধ্যায়, নং ২৭ ।

৮০. ইনজীল, পঞ্চম অধ্যায়, নং ১৭।

৮১. ইনজীল, মতি, ঊনবিংশ অধ্যায় নং-২৩-২৪ প্রভৃতি।

৮২. মিনহাজ ও মাক'সদ, ডক্টর জাকির হোসেন, পৃ. ১৮।

৮৩. ইউহন্না কী ইনজীল, ষষ্ঠদশ অধ্যায়, পৃ. ১২-১৩।

৮৪. ইনজীল, ইউহন্না, ষষ্ঠদশ অধ্যায়, পৃ. ৫-৭।

৮৫. লর্ড স্টাম্প. ক্রিশ্চিয়ানিটি এন্ড ইকনমিক্স, পঞ্চম অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষেপে বলতে গেরে ব্রাহ্মণ্যমত, বৌদ্ধমত, ঈসায়ী মত প্রভৃতি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সমাধানই দিতে পারেনি।

ইসলাম

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক ভিত্তি লো, 'লা রাহবানিয়াতা ফিল ইসলাম' ইসলামের কোন বৈরার্গ নেই। কুরআন বলে :

> এবং বৈরাগ্যকে তারা সৃষ্টি করে নিয়েছিল, যার নির্দেশ আমরা তাদের দেই নি, অবশ্য তারা এই বৈরাগ্য-ধর্মের সৃষ্টি করেছিল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তার মর্যাদা ও তারা যথাযথভাবে রক্ষা করেনি...।[৮৬]

এভাবে কুরআন বৈরাগ্যকে মনগড়া বস্তু বলে আখ্যা দিয়েছে এবং পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এটা মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া কোন স্বাভাবিক পথ নয়– আর না আল্লাহ মানুষকে এই প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন, আর না কোন যুগে তার কাছে এ ব্যাপারে কোন দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। 'যার নির্দেশ আমরা তাদের দেইনি'-এই সামান্য কয়েকটি শব্দের দ্বারা বৈরাগ্য দর্শনের আগাগোড়া ইতিহাসটাই যেন বলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ শুধু আজই নয়, বরং কোন যুগেই কোন দেশ বা কোন জাতিকেই আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন সত্যিকার পয়গাম্বর বা পথ প্রদর্শকের মাধ্যমে এই পথে চলার জন্য মানবজাতিকে নির্দেশ দেননিঃ মানুষই এটাকে আপনা থেকে গড়ে নিয়েছে। এ ছাড়াও বৈরাগ্য, যোগীবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতির অন্তরালে যা কিছু হয়েছে বা হচ্ছে, 'কাসীরুম মিনহুম ফাসিকুন (বস্তু তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক...) দ্বারা তার প্রকৃত এবং কার্যকরী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিরাট সংখ্যক আদম সন্তানকে বৈরাগ্যের মাধ্যমে যে আভ্যান্তরীণ 'অস্ত্রোপাচার'-এর চেষ্টা করা হয়েছিল তা শুধু বিফলে যায়নি, শেষ পর্যন্ত মানবজাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেও প্রমাণিত হয়েছে

অর্থনৈতিক সমস্যার ভুল এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধে সমাধন যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর তার পরিনাণ সেই রকমই হতে বাধ, যে রকম অন্যান্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজকর্মের বেলায় হয়ে থাকে।

কুরআন মাজীদ প্রদত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি

কুরআন মাজীদ উপরোক্ত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ পন্থার বিরোধিতা করে আমাদের সামনে যে অর্থনীতি পেশ করেছে এখন সেটাকেই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। কুরআনের ভাষায় মানুষকে লোভী এবং 'বেসবর' (অতৃপ্ত) করে সৃষ্টি করা হেয়েছে। নিশ্চয় মানুষ হচ্ছে জন্মগতভাবে বেসবর।'[৮৭]

কুরআনের অন্যত্র বলা হচ্ছে :

> নিশ্চয় মানুষের কাছে শোভনীয় হয়ে আছে- স্ত্রীদের, পুত্রদের এবং স্তুপে স্তুপে সজ্জিত স্বর্ণ ও রৌপের এবং সুসজ্জিত অশ্বরাজির, আর পশুপালের ও শস্যক্ষেত্রের মায়া-মহব্বত...।[৮৮]

---

৮৬. সূরা আল আ'রাফ : ২৭।

৮৭. সূরা আল মা'আরিজ : ১৯।

৮৮. সূরা আলে ইমরান : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ মানুষ স্তূপে স্তূপে সজ্জিত স্বর্ণ এবং রৌপ্যের প্রতি অনুরাগী। এভাবে অরাজি, পশুপাল এবং বাগ-বাগিচার প্রতিও তাদের আকর্ষণ রয়েছে। আর এগুলোকে পাওয়ার জন্য তাদের অন্তরে প্রবল আকাঙ্খা বিদ্যমান। কুরআন পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করছে, এই যে, আকর্ষণ এবং আশা-আকাঙ্খা, তা মানুষ নিজ থেকেই সৃষ্টি করেনি, বরং তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষের মধ্যে এই আকর্ষণ এবং কামনা-বাসনাককেও সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

কুরআন, একদিকে যেমন এই তথ্যাটি প্রকাশ করেছে, তেমনি মানুষের কামনা বাসনা এবং আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিরোধ না করে শুধু স্বর্ণ-রৌপ্যই নয়, বরং যে জমিনের অভ্যন্তরে স্বর্ণরৌপ্য এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুকিয়ে রয়েছে সেই জমিনকে মানুষের হাতে তুলে দিয়ে বলেছে :

> আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনে যা কিছু আছে সে সবই সৃষ্টি করেছেন।[৮৯]

মোটকথা, কুরআন আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে ধর্ম মানুষকে জমিন এবং জমিনের উৎপাদন থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখ; কিন্তু কুরআন যে ধর্ম নিয়ে এসেছে তা মানুষের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জমিন এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয় যে, কোন জিনিসটি মানুষের কি কাঝে লাগবে- ততক্ষণ পর্যন্ত তা রকাছে আসমানী গ্রন্থের ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শুধু তাই নয়, কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে :

> হে আমাদের প্রভূ, এসবকে তুমি কখনো অনর্থক সৃষ্টি করনি।[৯০]

বিশ্বের কোন জিনিসকেই অযথা সৃষ্টি করা হয়নি, বরং এর প্রত্যেকটি অণুপরাণু মানুষের কোন না কোন কাজে লাগে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের অনেক জিনিসই আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় এবং এগুলো দ্বারা মানুষের কি উপকার সাধিত হয় তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনা। কিন্তু আমরা কোন জিনিসের উপকার সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না থাকলেই একথা কখনো প্রমানিত হয় না যে, এ জিনিসটি প্রকৃতপক্ষেই অপ্রয়োজনীয়। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বুঝতে না পারলেও আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই এটাকে আমাদের কোন না কোন উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

এই আলোকে কুরআনে শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করলে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুরআন মানুষকে, বিশ্ব এবং বিশ্বের মধ্যে যা কিছু সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে এড়িয়ে যাবার কথা বলে না। আল্লাহ ইকবাল যথার্থই বলেছেন : 'ইসলামের আত্মা জড় উপাদানের নৈকট্যকে ভয় করে না।' কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, 'দুনিয়ায় তোমার যে অংশ রয়েছে তা বিস্তৃত হয়ো না।'[৯১]

কুরআন শুধু জমিনের মধ্যেই মানুষের আধিপত্যকে সীমিত রাখেনি, বরং মানুষ যে জিনিসের উপরই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে জিনিসকেই তার নিয়ন্ত্রনাধীন করে দেয়। কুরআন বলে :

> তোমাদের জন্য আরো বশীভুত করেছেন নিজের তরফ হতে আকশামন্ডলের সবকিছুকে সমগ্রভাবে।[৯২]

> শুধু জমিন এবং আসমানই নয় বরং চন্দ্র-সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্রকেও ইসলাম মানুষের হাতে ন্যস্ত করেছে। আরো বশীভূত করেছেন তোমাদের মঙ্গলের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে।[৯৩]

---

৮৯. সূরা আল বাকারা : ২৯।

৯০. সূরা আলে ইমরান : ১৯০।

৯১. সূরা আল কাসাস : ৭৭।

৯২. সূরা আল জাসিয়া : ১২।

৯৩. সূরা ইবরাহীম : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

মূলধন বিনিয়োগের বিভিন্ন পন্থা

ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তিগত যত্ন-প্রচেষ্টায় অর্জিত ধন-সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান করে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গুটি কয়েক লোকের হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে এই অজুহাতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধিতা করে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইসলামী অর্থনীতি সম্পদ বণ্টনের যে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করছে তাতে দেশের সমস্ত সম্পদ গুটিকয়েক লোকের হাতে কখনো কেন্দ্রীভূত হতে পারে না। তা ছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানার কথা-অস্বীকার করলে সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জনসাধারনের উৎসাহ অনুপ্রেরনা হ্রসা পাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। ইসলামী অর্থনীতি যে কোন বৈধ কারবারে মানুষের ব্যক্তিগত যত্ন-প্রচেষ্টাকে অনুমোদন করে। কুরআন বলছে :

> আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছে। আর সুদকে হারাম করেছেন।[৯৪]

ব্যক্তিগত কারবার

মূলধন নিয়োগের একটি পন্থা এই যে, মানুষ নিজের পুঁজি দ্বারা নিজেই কারবার করবে। চাষাবাদের কাজ সাধারনথ এই পন্থায়ই করা হয়। ব্যক্তিগত কারবারের দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মুলধন নিয়োগকারী নিজের তত্ত্বাবধানে কিছু সংখ্যক মজুর রেখে কারবার পরিচালনা করবে। বেশীর ভাগ ছোট ছোট কারখানাই এভাবে পরিচালিত হয়। ইসলামী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোন কোন সাহাবী এবং তাবিয়ী মজুরীর বিনিময়ে হাবশীদের দ্বারা ক্ষেতের কাজ করাতেন।[৯৫]

কিরায বা মুযারাবাত

মুলধন নিয়োগের আর একটি পন্থা হলো, কিরায বা মুযারাবাত (Sleeping partnership)। যদি কোর কারবারে এক ব্যক্তি সমস্ত মূলধন এবং অন্য ব্যক্তি শুধু শ্রমশক্তি নিয়োগ করে, আর এই কারবার থেকে যে মুনাফা আসে তাতে উভয়েই শরীক থাকে তাহলে এই কারবারকে বলা হবে কিরায বা মুযারাবাত।

ইসলামী নীতিশাস্ত্রবীদরা কিরাযের যে সর্বসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো এক ব্যক্তি অনং ব্যক্তিকে ব্যবসা করার জন্য একটি নির্ধারিত বিনিময়ের উপর নিজের মাল দেবে এবং উভয়ের মধ্যে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মচারী (যে মাল গ্রহণ করেছে) মুনাফার এক -চতুর্থাংশ, অর্ধেক অথবা এই ধরনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ করবে।[৯৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি

খায়বর বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাগাভাগির ভিত্তিতে জমি-যিরাত ইহুদীদের দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খায়বরের জমি-যিরাত ইহুদীদেরকে এই শর্তে দান করেন যে, তারা এর মধ্যে পরিশ্রম করবে এবং এতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পাবে।[৯৭]

---

৯৪. সূরা আল বাকারা : ২৭৫।

৯৫. বুখারী।

৯৬. হিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, কিতাবুল কিরায।

৯৭. বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীদের কর্মপদ্ধতি

সাহাবীরাও কিরাযের মাধ্যমে কারবার করতেন। ইয়াকুব আল-মাদানী বর্ণনা করেছেন যে, তাকে উসমান বিন আফফান কিরাযের ভিত্তিতে কিছু মাল দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, তিনি পরিশ্রম করবেন এবং মুনাফার মধ্যে উভয়েই শরীক থাকবেন।[৯৮]

কিরায সম্পর্কে নীতিশাসন্ত্রবিদদের অভিমত

কিরায বৈধ হওয়া সম্পর্কে মুর্সলিম নীতিশাস্ত্রবিদরা একমত। উপরন্ত তাঁরা ইসলাম-পূর্ব যুগে প্রচলিত কিরায-এর ক্ষতিকর দিকগুলো বন্ধ করে এর উকারিতাকে আরো বৃদ্ধি করা দিয়েছেন।

মুনাফার মধ্যে কর্মী এবং মূলধন নিয়োগকারীর অংশ

কিরাযের কারবারে মূলধন নিয়োগকারী এবং কর্মী উভয়েই লাভবান হয়। মূলধন নিয়োগকারী তার মূলধনের বদলে এবং কর্মী তার শ্রমের বদলে মুনাফা বা লাভের অদিাকরী হয়।[৯৯]

সমবায় পদ্ধতি

ইসলামী নীতিশাস্ত্রবিদরা সমবায়ের কারবারকে মোট চার ভাবে বিভক্ত করেছেন। যেমনঃ (১) শারিকাতুল মুফাভিজা, (২) শারিকাতুল এনান, (৩) শারিকাতুস সানয়ে এবং (৪) শারিকাতুল ভুজুহ।

কয়েকজন লোক একত্রে মিলে শিরকাত বা সমবায়েল কারবার করে থাকে। এতে সকলেরই পুঁজি থাকতে পারে, আবার কারো কারো একেবারে নাও থাকতে পারে। যদি কারবারে সকলেই পুঁজি বিনিয়োগ করে তাহলে দেখতে হবে, সকলেই সমানভানে বিনিয়োগ করছে, না কারো কম আবার কারো বেশী আছে। যদি সকল অংশীদার সমভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাহলে সেই কারবারকে বলা হয় শারিকাতুল মুফাভিজা। আর যদি কারো পুঁজি কম থাকে এবং কারো বেশী, তাহলে সেটাকে বলা হয় শারিকাতুল এনান।

অংশীদারদের কোন পুঁজি নেই কিন্তু নির্দিষ্ট কোন কাজে তাদের দক্ষতা রয়েছে, যদি এই দক্ষতাকে পুঁজি করে তারা কোন সমবায় কারবার গড়ে তোলে (যেমন কয়েকজন ধোপা মিলে একটি যৌথ ওয়াশিং কোম্পানী গড়ে তুললো) তাহলে সেটাকে বলা হয় শাকিরাতুস সানায়ে। ইমাম আবু হানীফার মতে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ ব্যক্তিরাও (যেমন বস্ত্র কর্তনকারী, সেলাইকারী, রঞ্জনকারী ধোলাইকারী প্রভৃতি) একত্রে মিলে সমবায়ের কারবার করতে পারে। তবে এই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাজ করবে এবং এই যৌথ কারবারে যে মুনাফা হবে তা সকলে বণ্ঠ করে নেবে। অংশীদারদের পুঁজি বা দক্ষতা কিছুই নেই, এমতাবস্থায় যদি তারা নিজেদের বিশ্বস্ততাকে পুঁজি করে অন্যের কাছ থেকে দ্রব্য-সামগ্রী ধারে নিয়ে যৌথভাবে কোন কারবারে হাত দেয় তাহলে সেটাকে বলা হয় শারিকাতুল ভুজুহ।

---

৯৮. মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

৯৯. হিদায়া।

Dhaka University Institutional Repository

শারিকাতুল মুফাভিজা

শারিকাতুল মুফাভিজা সমবায় কারবারের এমন একটি পন্থা, যাতে দুই ব্যক্তি (বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তি) শুধু পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারেই নয় বরং তসরুফ এবং ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও সমান সমান অংশীদার থাকে।[১০০]

শারিকাতুল মুফাভিজার শর্তাবলী

শারিকাতুল মুফাভিজার অংশীদারদের মধ্যে অধিকার এবং মর্যাদার ক্ষেত্রেও সমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ উভয়েই (বা সকলেই) যেন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন এবং মুসলামন হয়।[১০১] এ কারণে স্বাধীন ও দাসের মধ্যে কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শারিকাতুল মুফাভিজা বৈধ নয়। কেননা দাস এবং অপ্রাপ্ত বয়স্করা তাদের মাল তসরুফ করার অধিকার রাখে না। (মাল তসরুফ করার আগে দাসকে তার প্রভুর এবং অপ্রাপ্তবয়স্ককে তার অভিভাবকের অনুমতি নিতে হয়)। অতএব স্বাধীন এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে যথাক্রমে দাস ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের 'শারিকাতুল মুফাভিজা ' হতে পারে না।[১০২]

অধিকার এবং দায়িত্ব

শারিকাতুল মুফাভিজায় প্রত্যেক অংশীদার তা সঙ্গীর ওকীল হিসাবে কাজ করে। 'প্রত্যেক অংশীদার অন্য অংশীদারের পক্ষ থেকে মাল বেচাকেনা, ঋণ দেওয়া এবং আমানত রাখার অধিকার রাখেন।' 'হ্যাঁ এক অংশীদা যদি অন্য অংশীদারকে বলে যে, তুমি মাল বিক্রি করার জন্য নিশাপুর যাও আর সে যদি নিশাপুর না গিয়ে অন্য কোন জায়গায় যায় এবং এতে মাল বিনষ্ট হয় তাহলে ঐ অংশীদারকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[১০৩]

শারিকাতুল এনান

সমবায়ভিত্তিক কারবারে অংশীদারদের পুঁজি অথবা মুনাফা বরাবর না হলে সেটাকে শারিকাতুল এনান বলা হয়। প্রাচীন আরবে এই জাতিয় শারিকাতের প্রচলন ছিল।

শারিকাতুল এনানের শর্তাবলি

১. এই জাতীয় কারবারে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের পুঁজির পরিমাণ সমান সমান হওয়া আবশ্যকীয় নয়।[১০৪]

২. পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে অংশীদাররা সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও একে অন্যের চেয়ে বেশী লভ্যাংশ গ্রহণ করতে পারে। যেমন (অংশীদারদের মধ্যে একি ব্যক্তি খুব অভিজ্ঞ এবং অন্যজন অনভিজ্ঞ হলে নির্ধারিত শর্তানুযায়ী অভিজ্ঞ ব্যক্তি বেশী লভ্যাংশের অধিকারী হতে পারে।

---

১০০. প্রাগুক্ত।

১০১. প্রাগুক্ত।

১০২. ফত্ওয়ায়ে কাযীখান, ৩য় খ., পৃ. ৬৪২।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪০।

১০৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যেহেতু এ্ শারিকাতের মধ্যে সমতা অত্যাবশ্যকীয় নয়, তাই স্ত্রী, পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক (অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে) স্বাধীন, দাস (প্রভুর অনুমতি নিয়ে) এমন কি মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যেও 'শারিকাতুল এনান' হতে পারে।[১০৫]

৪. এই শারিকাতের মধ্যে প্রত্যেক অংশীদার একে অন্যের ওকীল, কিন্তু কফীল নয়। তাই সমবায় সম্পত্তি থেকে কাউকে ঋণ দেওয়ার অধিকার কোন অংশীদারের নেই।

শারিকাতুস সানায়ে

মিস্ত্রী, কারিগর বা এই ধরনের কায়িক শ্রমিকরা শুধু নিজেদের শ্রমকে পুঁজি করে যখন কোন সমবায় কারবার গড়ে তোলে তখন সেটাকে বলা হয় শারিকাতুস সানায়ে।

শারিকতুস সানায়ে সম্পর্কে নীতিশাস্ত্রবিদদের মতামত

বেশীর ভাগ হানাফী নীতিশাস্ত্রবিদদের মতে শারিকাতুস সানায়ে জায়েয এবং বৈধ। কিন্তু ইমাম যুফার এবং শাফী এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন।

শর্তাবলী

এই সমবায় কারবারের মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা যেতে পারে, আবার কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পূর্ব নির্ধারিত শর্তানুযায়ী কেউ বেশী আবার কেউ কম মুনাফারও অধিকারী হতে পারে।

শারিকাতু ভুজুহ

যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন পুঁজি ছাড়াই পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, তারা অন্যের কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রী ধার নিয়ে যৌথভাবে কারবার করবে এবং এই কারবারের লাভ-লোকসান উভয়েই সমান অংশীদার থাকবে তাহলে এটাকে বলা হয় শারিকাতুল ভুজুহ। এই শারিকাতের অংশীদাররা সমান সমান মুনাফা পারে এবং এতে কমবেশী করা জায়েজ হবে না।[১০৬]১০৬

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম মালিক এবং শিষ্য সমবায় কারবারের আরো অনেকগুলো পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যেমন :

১. তিব্বী শারিকাত

১. এই পদ্ধতি অনুযায়ী একাধিক চিকিৎসক একত্রে মিলে যৌথভাবে একটি হাসপাতাল স্থান করবেন। হাসপাতালে যে ঔষধপত্র লাগে তা তাঁরা সমবায়ের ভিত্তিতে খরিদ করবেন অত:পর রোগীদের চিকিৎসা করে যে আয় হবে তা পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী সকলের মধ্যে বন্টিত হবে।

২. তা'লীমি শারিকাত

---

১০৫. হিদায়া।

১০৬. আবূ দাউদ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. এই পদ্ধতি অনুযায়ী একাধিক শিক্ষক একত্রে মিলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা টিউটোরিয়াল স্কুল স্থাপন করবেন এবং ছাত্র-বেতন বাবদ যে আয় হবে তা পূর্বচুক্তি অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টিত হবে।

৪. যারয়ী শারিকাত

৫. এই পদ্ধতি অনুযায়ী একাধিক কৃষক একত্রে মিলে জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ প্রভৃতি যৌথভাবে সংগ্রহ করে চাষাবাদের কাজ করবেন। এতে যদি কেউ শুধু পুঁজি, আবার কেউ শুধু বিনিয়োগ করেন তাহলেও চলবে। তবে কারবারের মুনাফা পুর্বচুক্তি অনুযায়ী সকলের মধ্যে বন্টিত হবে।

৫. মা'দানী শারিকাত

৬. এই পদ্ধতি অনুযায়ী একাধিক লোক মিলে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য একটি যৌথ কোম্পাণী গড়ে তুলতে পারেন।

৬. শারিকাতে হামল ও লকল

৭. এই পদ্ধতি অনুযায়ী একাধিক লোক মিলে মাল পরিবহনের জন্য ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী গঠন করতে পারেন।

সরকার পরিচালিত কারবার

বর্তমান যুগের সরকারগুলো জনসাধারণের কাছ থেকে তমসুক বিক্রির মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে সম্পদ উৎপাদনকারী বিভিন্ন কাজ (যেমন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপদান প্রভৃতি) আনজাম দিয়ে থাকে। কিন্তু এই কারবারে লাভ- লোকসানের সাথে তমসুক ক্রয়কারীদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইসলামী রাষ্ট্র শুধু কারবারে লাভ-লোকসানের উপরই ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আমরা এ সম্পর্কে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলামী অর্থনীতি প্রত্যেকটি লাভজনক কারবারকে বৈধ এবং প্রত্যেকটি সূদী কারবারকে অবৈধ্য ঘোষণা করেছে।

সংগঠন

তানযীম বা সংগঠন হচ্ছে এক প্রকারের বুদ্ধিগত শ্রম। কারবারী যোগ্যতা বা সংগঠন ছাড়া কোন দেশই ব্যাপকভাবে কোন সম্পদ উৎপাদন করতে পারে না। এ কারণেই অর্থনীতিবিদরা সংগঠনকে উৎপাদনের একটি পৃথক উৎস বলে মনে করেন।

সংগঠন বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, ইসলাম আগাগোড়া একটি সংগঠন ছাড়া কিছু নয়। নামাযের মধ্যে ইমামত রাষ্ট্রের মধ্যে খিলাফত ও হজ্জের মধ্যে এমারত (নেতৃত্ব) এসব কিছুতেই ইসলমী সংগঠনের পরিচয় মিলে। হুযুর আকরম (সা.) সংগঠনের উপর এত জোর দিতেন যে, যখন দু'তিন জন লোক সফরে বের হতো যখন তিনি তাদের মধ্যেও একজনকে আমীর মনোনীত করতেন। আবু দাউদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যখন তিনজন লোক সফরে বের হবে তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে যেন আমীর মনোনীত করা হয়।'[১০৭]

১০৭. তিরমিযী।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) এক সপ্তাহের জন্যও মদীনার বাইরে গেলে কোন একজনকে সেখানে তার প্রতিনিধি মনোনিত করে যেতেন। বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সংগঠনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'জামা'আতবদ্ধ লোকদেরকে আল্লাহ তা'আয়াল সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায় সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়।'[১০৮]

কোন সংগঠনকে ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য কর্ম-বন্টন প্রভৃতির উপর ও জোর দিতে হয়। খন্দক যুদ্ধের সময় যখন বেশ কয়েক মাইল জুড়ে খাল খনন করা হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি চল্লিশ গজ জায়গা প্রতি দশজন সাহাবীর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন।[১০৯]

ইতিহাস আমাদের এই সন্ধান দিচ্ছে যে, বর্তমান পুঁজিবাদ ব্যবস্থার সূচনা হয় ব্রিটেন থেকে। এরপর ধীরে ধীরে তা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে জার্মানী ও ইতালীকে এ ব্যবস্থার বিরাট নেতা মনে করা হয়। অবশ্য আগ্রাসন প্রতিযোগিতায় বর্তমানে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদিও জার্মানী ও ইতলীর শত্রু মনে হচ্ছে, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদেরও নীতিগতভাবে এদের পেছনে সমর্থন রয়েছে। এ ব্যাপারে সবাই অভিন্ন মত পোষণ করে। অনুরূপ জার্মানীর পুঁজিবাদ, মার্কিনী গণতন্ত্র, ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, ইতালীর ফ্যাসিবাদ এবং জাপানের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এসব একই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন নামমাত্র।

উপরোক্ত আলোচনার পর সহজে অনুমান করা যায় যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিপক্ষ হিসেবে ফ্যাসিবাদকে দাঁড় করানো মূলত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামে যদিও উৎপাদন ও উৎপাদন মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত ব্যক্তি-মালিকানা বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু তা শর্তহীন নয়। তাতে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, কোন অবস্থায়ই এই ব্যক্তি-মালিকানা ও সামাজিক স্বার্থে পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং ব্যক্তি-মালিকানা সামাজিক স্বার্থের সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করবে। কোথাও সংঘাতের আশংকা হলে সামাজিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। শুধু ব্যক্তি-মালিকানার এ ধরনের বৈধতার দরুন ইসলামী ব্যবস্থাকে ফ্যাসিবাদের সমগোত্রীয় কিংবা ঘনিষ্টতর মনে করলে ইসলামের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হবে।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। তাহলো সাধারণ মানুষের আর্থিক ধ্বংস, দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য দূর করা এবং তাদের অধিকাংশের দুরবস্থার অবসান করা। কিন্তু উভয় ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতিতে দু'টি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জীবনোপায়ে পার্থক্য স্বীকার করে এবং ব্যক্তি মালিকানাকেও (একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত) সে স্বীকার করে। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উক্ত দু'টি বিষয়ই অস্বীকার করে এবং ধ্বংস করতে চায়।

তাই পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ সহ অন্যান্য সকল ধর্মীয় মতবাদ-এ যে অর্থনৈতিক দৃষ্টি উপস্থাপিত হয়েছে ইসলাম তার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে এর স্পষ্টতা এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ তুলে ধরেছে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে সকল ক্ষেত্রেই উন্নতির পথ উন্মুক্ত হবে।

---

১০৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য তারীখে তাবারী, পৃ. ১৪৬৭ দ্রষ্টব্য।

১০৯. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : পাঁচ
ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা : শর'য়ী বিধান

ইসলামে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে আর মুনাফা অর্জনের জন্যে ক্রয় বিক্রয় ও বিনিয়োগকে বৈধ করা হয়েছে। মুসলমানগণ কি কি পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় ও অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করবে সে পদ্ধতিগুলোও ইসলামে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. বাই মুরাবাহা (البيع المرابحة) অর্থাৎ লাভযুক্ত ক্রয় বিক্রয়।

২. বাই মুয়াজ্জাল (البيع المؤجل অর্থাৎ বাকীতে ক্রয় বিক্রয়।

৩. বাই সালাম (البيع السلم) অর্থাৎ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়।

৪. বাই মুদারাবা (البيع المضاربة) অর্থাৎ উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ।

৫. বাই মুশারাকা (البيع المشاركة) অর্থাৎ অংশীদারী কারবার।

৬. ইজারা (اجارة) অর্থাৎ ভাড়া।

৭. নিলাম ক্রয় বিক্রয় (بيع بالمزاد العلانى) বাইউন বিল মুযাদিল আলানিয়্যি) অর্থাৎ যে অধিক মূল্য প্রস্তাব করে তার নিকট বিক্রি করা।

৮. ইস্তিসনা (الاستصنا) অথাৎ কারিগর/ শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন।

৯. বাই সারাফ (البيع الصرف) অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রার বিনিময় (Money Exchange)। স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা ইত্যাদি সমজাতীয় জিনিসের বিনিময় করা হলে পরিমাণে সমান সমান হতে হবে এবং হাতে হাতে বিনিময় করতে হবে। অর্থাৎ পক্ষদ্বয়ের পরস্পর পৃথক হবার পূর্বেই বিনিময়কৃত মাল হস্তান্তর করতে হবে। আর ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময়, করা হলে পরিমাণে কমবেশী করা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে, বাকীতে করা যাবে না। এ বিষয়ে রিবা আল ফাদল এর স্থলে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. বাই তাওলিয়া (البيع التولية) অর্থাৎ সমমূল্যে বা লাভবিহীন ক্রয় বিক্রয় করা। এতে কোন লাভও নেই। লোকসানও নেই। অর্থাৎ কোন জিনিস মুনাফা ব্যতীত ক্রয়মূল্যে বিক্রয় করাকে তাওরিয়া বা সমমূল্যে বিক্রি (Release at cost Price) বলে।

১১. বাই ওয়াদইয়াহ : অর্থাৎ লোকসানে বিক্রয় করা। এ পদ্ধতিতে বিক্রয়মূল্য ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম হবে।

১২. বাই মুসাওয়ামা : অর্থাৎ ক্রয় মুল্যে বিবেচনা না করে যে কোন মুল্যে বিক্রয় করা।

১৩. বাই মুকায়েসা : অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্যে কয় বিক্রয়। যেমন এ ব্যক্তি চাল দিল এবং অপর ব্যক্তি এর পরিবর্তে কাপড় দিল। এ পদ্ধতিতে রিবার অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

১৪. বাই মুতলাক : অর্থাৎ মূল্যের বিনিময়ে পণ্যের ক্রয় বিক্রয়। এটাই ক্রয় বিক্রয়ের সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধতম প্রথা। বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম ইত্যাদি বাই মুতলাক এর অন্তর্ভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. কিরায বা মুযারাবাত : কারো শুধুই মূলধন এবং কারো শুধুই শ্রমশক্তি নিয়োগ আর লভ্যাংশে উভয়েই শরীক থাকে।

বাই মুরাবাহা (البيع المرابحة) : লাভে ক্রয়-বিক্রয়

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

احل الله البيع وحرم الربوا-

আল্লাহ ব্যবসাকে (ক্রয়-বিক্রয়কে) হালাল করেছেন। আর হারাম করেছেন সুদকে।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্পতিতে ব্যবসা করা বৈধ।[২]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

وعن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشترى له به اضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى اضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذى استفضل من الاخرى فتصدق رسول الله بالدينار فدعاله ان يبارك له فى تجارته-

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কুরবানীর পশু খরিদ করার জন্যে এক দিনার দিয়ে তাকে বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দিনার দিয়ে একটি দুম্বা ক্রয় করলে এবং উহা দুই দিনারে বিক্রি করলেন। অতপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। আবার গিয়ে এক দিনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করলেন, অতপর পশু ও অতিরিক্ত দিনার এনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উহা দান করে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন যেন তার ব্যবসায়ে বরকত (লাভ) হয়।[৩]

এ হাদীস থেকে জানা যায় আপন কাজে উকিল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা এবং লাভে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ বা বৈধ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ব্যবসা অর্থাৎ পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাকে হালাল করেছেন। মুনাফা তখনই অর্জিত হবে যখন বিক্রয় পণ্যের ক্রয় মূল্য হতে অধিক হবে। যে কেউ বাই মুরাবাহা (Bai Murabaha) পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের অনুরোধে এ পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

বাই মুরাবাহা'র শরয়ী বিধান

১. ক্রয় বিক্রয়ের মাল মুদ্রার অংশ না হয়ে পণ্য (Commodity) হতে হবে।

২. যে মাল বিক্রয় করা হবে সে মালের বিক্রয় মূল্য মুদ্রার অংকে নির্ধারিত হতে হবে।

৩. দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকলে কোন মুদ্রায় বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করা হবে তা চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

---

১. সূরা বাকারা : ২৭৫।

২. সূরা নিসা : ২৯।

৩. সহীহ তিরমিযী ও আবু দাউদ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ক্রেতা ও বিক্রেতার (عاقدين) ইজাব ও কবুল দ্বারা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে। কারণ কোন ব্যক্তির (বিক্রেতার) কোন জিনিস বিক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ ব্যতীত এবং ক্রেতার ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। ইশারা বা কোন কর্মের মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি জ্ঞান করা যায়।

৫. বিক্রয়ের মালামাল (معقود عليه) প্রয়োজনীয় ও উপকারী হওয়া আবশ্যক।

৬. ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য অবশ্যই হালাল পণ্য হতে হবে যা ইসলামী শরীয়ায় নিষিদ্ধ নয়।

৭. যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের বাস্তব উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। (বাই সালাম অর্থাৎ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক মাসআলা)

৮. বিক্রয়ের মাল হস্তান্তরযোগ্য এবং ক্রেতার নিকট পরিচিত হতে হবে।

৯. বিক্রয়ের মাল অস্থাবর সম্পত্তি হলে এর উপর বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। কারণ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে তা দখল করার পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়। যে মালে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয়েছে সে মালের উপর অন্য কারো মালিকানা থাকতে পারবে না।

১০. জমি কিংবা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করার পর তা দখল করার পূর্বেই বিক্রয় করা যাবে।

১১. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি কোন নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্যে হতে পারবে না। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্যে হলে তা শুদ্ধ হবে না।

১২. মালের প্রকৃতি, পরিমাণ গুণাগুণ বিক্রয় মূল্য (Sale Price) ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট হতে হবে; নতুবা ক্রয় বিক্রয় বৈধ হবে না। কারণ এতে বিবাদ ও প্রতারণা হতে পারে।

১৩. ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার নিকট মালের মূল্য পরিশোধ এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার মালিকানায় বিক্রিত মালামাল হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হবে।

১৪. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবার জন্যে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বুদ্ধিমান হবে হবে। অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তবে বলেগ হওয়া শর্ত নয়।

১৫. ক্রয় বিক্রয়ে দু'টি পক্ষ অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা অবশ্যই থাকতে হবে। একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা হলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

১৬. ব্যাংকের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকতে হবে। যথা : পণ্যের বিক্রেতার, ব্যাংক(১ম ক্রেতা) এবং গ্রাহক (২য় ক্রেতা)

১৭. মুরাবাহা চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহক কিংবা গ্রাহকের নিজস্ব কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা গ্রাহকের কোন অংগ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতে পারবে না। কারণ এতে একই ব্যক্তি বিক্রেতা ও ক্রেতা হওয়ার মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

১৮. ব্যাংকের ক্ষেত্রে মুরাবাহা চুক্তির অধীনে নির্ধারিত পণ্যসামগ্রী অবশ্যই ব্যাংকের নামে ক্রয় করে দখলে আনতে হবে যাতে অন্তত: কিছু সময়ের জন্যে হলেও সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রীর উপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। কারণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের ওপর বিক্রেতার (ব্যাংক) মালিকানা থাকা শর্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ না দিয়ে যদি মুরাবাহার নামে নগদ অর্থ প্রদান করত: লেনদেনের শর্ত হিসাবে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হয় তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।

২০. মুরাবাহা পদ্ধতিতে প্রথম ক্রেতা (ব্যাংক) দ্বিতীয় ক্রেতার (গ্রাহকের) নিকট মাল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মালের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণকালে মালামালের ক্রয় মূল্যের সাথে পরিবহন খরচ, গুদাম ভাড়া, শুল্ক, ভ্যাট, পাহারাদারের মজুরী ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করতে পারবে। কিন্তু আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করার পর মালের যে মূল্য দাঁড়াবে তাকে মালের ক্রয় মূল্য (Purchase pirce) বলে উল্লেখ করা যাবে না।

২১. মুরাবাহা পদ্ধতিতে যে পণ্যটি বিক্রয় করা হবে তার প্রকৃত ক্রয় মূল্য মুনাফার পরিমাণ ও অন্যান্য খরচের চুক্তিপত্রে পৃথক ভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

২২. মাল যার নিকট বিক্রয় করা হবে অর্থাৎ ক্রেতা যদি মালের ক্রয় মূল্য, মুনাফা ও অন্যান্য খরচের পরিমাণ জানতে চায় তাহলে বিক্রেতা তা জানাতে বাধ্য থাকবে।

২৩. নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রের ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিক্রেতা মালের হস্তান্তর বন্ধ রাখতে পারবে।

২৪. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পরে গ্রাহক (ক্রেতা) কর্তৃক মালমালের মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংক জামানত হিসাবে বিক্রীত মালমাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এক্ষেত্রে মালামাল মূল্য গ্রাহকের নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

২৫. এ পদ্ধতিতে চুক্তি পরে যে লাভের পরিমাণ নির্ধারিত হবে, কোন অবস্থাতেই তার চেয়ে অধিক লাভ বা অধিক মুল্য আদায় করা যাবে না। নির্ধারিত লাভের অতিরিক্ত আদায় করা হবে তা সূদ হবে। কারণ ঋণের ওপর অতিরিক্ত কোন কিছু আদায় করা যায় না।

২৬. মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্যের মালিক হবে গ্রাহক (ক্রয় সূত্রে) কিন্তু ব্যাংক তার বিনিয়োগের জামানত স্বরূপ মুরাবাহা চুক্তির শর্তানুযায়ী গ্রাহণ কর্তৃক মূল্য পরিশোধ না কর পর্যন্ত ব্যাংক সরবরাহতব্য মালামালের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করত: তা ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

২৭. অতপর গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের পর এবং ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট পণ্য হস্তান্তরের পরে গ্রাহক আইনত: পণ্যের মালিকানা ও ব্যবহার করার অধিকার লাভ করবে।

২৮. গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা টাকা অর্থাৎ পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ব্যাংকের গুদামে রক্ষিত মালামাল অর্থাৎ গ্রাহকের জামানত বিক্রি করে ব্যাংক তার পাওনা আদায় করতে পারে।

২৯. ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হবার জন্যে সহায়ক এবং কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এরূপ যে কোন শর্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে যোগ করা যাবে। কোন পক্ষ উক্ত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি এক তরফাভাবে বাতিল করা যাবে।

৩০. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবার পর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে প্রথমে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট মালের মূল্য পরিশোধ করবে এবং মূল্য ব্যবহার করার পুর্বেই বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মালামাল হস্তান্ত র করবে।

৩১. নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মালামাল হস্তান্তর বন্ধ রাখতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতাকে প্রতারিত করেছে বলে দ্বিতীয় ক্রেতা পরে জানতে পারলে এবং তা প্রমাণিত হলে ইমাম আবু হানিফা (রা:) এর মতে প্রতারিত ব্যক্তি মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে মাল রাখতেও পারবে, অথবা ফেরতও দিতে পারবে। এ ব্যাপারে তার (দ্বিতীয় ক্রেতা) ইখতিয়ার থাকবে।

৩৩. কিন্তু মাল ফেরত দানের পূর্বেই দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট মাল নষ্ট হলে ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। তাকে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে মাল রাখতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসূফ (রাহ) এর মতে দ্বিতীয় ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থের প্রতারিত হয়েছে সে পরিমাণ মূল্য কম দিতে পারবে।

৩৪. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয় বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের কোন শর্ত না থাকলে ঐ ক্রয় বিক্রয় কোন পক্ষই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

৩৫. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রচলিত এবং ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থী নয় এমন যে কোন শর্ত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে আরোপ করা যাবে। যেমন মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত মালামাল হস্তান্তর করা হবে না, জিনিস বন্ধক রাখতে হবে, কারো জামিন হতে হবে ইত্যাদি।

৩৬. ক্রীত মালামাল ক্রেতার (ব্যাংকের) অধিকারে না আসা পর্যন্ত তা পুনরায় বিক্রি করা জায়েজ নয়। ক্রীত মালামাল ক্রেতা (ব্যাংক) প্রথমে নিজের দখলে আনয়ন করবে অতপর তা বিক্রি করবে।

বাই মুয়াজ্জাল (البيع الموجل) : বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়

পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে :

احل الله البيع-

আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন।[৪]

তবে এখানে সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয় তথা নগদ, বাকী ও অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। হাদীসের মাধ্যমেও বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعا له من حديد-

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা:) এক ইহুদীর নিকট হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য বাকীতে ক্রয় করেছিলেন এবং (মূল্য বাকী থাকায় উহার জন্যে) তাঁর লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন।[৫]

বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয়ের শর'য়ী বিধান ফিকাহর কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বাই মুয়াজ্জাল-এর শর'য়ী বিধান

১. এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয়ের মাল মুদ্রার অংশ না হয়ে পণ্য (Commodity) হতে হবে।

---

৪. সূরা বাকারা : ২৭৫।

৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

Dhaka University Institutional Repository

২. ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ না দিয়ে যদি বাই মুয়াজ্জাল এর নামে নগদ অর্থ প্রদান করত: লেনদেনের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হয় তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।

৩. মালের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, মালের বিক্রয়মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; নতুবা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। কারণ এতে ভবিষ্যতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ ও কলহের সৃষ্টি হতে পারে।

৪. যে মাল বিক্রয় করা হবে সে মালের বিক্রয় মূল্য মুদ্রার অংকে নির্ধারিত হতে হবে।

৫. দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকলে কোন মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হবে তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. ক্রেতা ও বিক্রেতার ইজাব ও কবুল দ্বারা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে। ইশারা বা কোন কর্মের মাধ্যমেও ক্রয় বিক্রয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা যায়।

৭. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময়ই বিক্রয় মূল্য পরিশোধের সময়সীমা স্পষ্টভাবে তথা মাস দিন ও তারিখসহ চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ যেমন রমজানের পর, হজের পর, মাল বিক্রয়ের পর এভাবে নির্ধারণ করা যাবে না।

৮. বিক্রয় মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্ত থাকলে তাও চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে কিস্তির সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।

৯. ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য অবশ্যই হালাল পণ্য হতে হবে যা ইসলামী শরীয়ায় নিষিদ্ধ নয়।

১০. যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা এবং সে পণ্যের বাস্তব উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে, হস্তান্তর যোগ্য হতে হবে এবং ক্রেতার নিকট পরিচিত হতে হবে।

১১. বিক্রয়ের মাল অস্থাবর সম্পত্তি হলে এর ওপর বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। বিক্রীত মালের ওপর বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কারো অধিকার থাকবে না।

১২. জমি কিংবা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করার পর তা দখল করার পূর্বেই বিক্রয় করা যাবে।

১৩. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবার জন্যে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তবে বালেগ হওয়া শর্ত নয়।

১৪. ক্রয় বিক্রয়ে দুটি পক্ষ থাকতে হবে। যথা ক্রেতা ও বিক্রেতা। একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা হতে পারবে না।

১৫. বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি পক্ষ থাকতে হবে। যথা পণ্যের বিক্রেতা, ব্যাংক (১ম ক্রেতা) এবং গ্রহখ (২য় ক্রেতা)।

১৬. বাই মুয়াজ্জাল চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহক কিংবা গ্রাহকের নিজস্ব কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা গ্রাহকের কোন অংশ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতে পারবে না। কারণ এতে একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা হওয়ায় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

১৭. ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাই মুয়াজ্জাল চুক্তির অধীনে নির্ধারিত পণ্যসামগ্রী অবশ্যই ব্যাংকের নামে ক্রয় করে দখলে আনতে হবে। যাতে অন্তত: কিছু সময়ের জন্যে হলেও সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রীর ওপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয়

Dhaka University Institutional Repository

বিক্রয় চুক্তি হবে। কারণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা থাকা শর্ত।

১৮. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্যে হতে পারবে না। একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্যে হলে তা শুদ্ধ হবে না।

১৯. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার কোন শর্ত না থাকলে ঐ ক্রয় বিক্রয় কোন পক্ষই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

২০. ক্রেতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্ব বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাওনা টাকার তাগাদা করতে পারে না।

২১. বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট দ্বিতীয় মালামাল আগে সরবরাহ করা হবে এবং ক্রেতা কর্তৃক মালের মূল্য পরিশোধ করা হবে ভবিষ্যতের একটি পূর্ব নির্ধারিত সময়ে। ক্রেতার নিকট মালামাল সরবরাহের পর মালের উপর ক্রেতার আইনগত: মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই মালামাল ব্যবহার করতে পারবে। আর মালামালের ক্রয় মূল্য ক্রেতার ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

২২. বাকীকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা মালের হস্তান্তর বন্ধ রাখতে পারবে না; বরং বিক্রেতাকে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তর করতে হবে।

২৩. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর বিক্রেতা (ব্যাংক) মালের বিক্রয় মূল্য অপর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পরিশোধের জন্যে ক্রেতাকে নির্দেশ দিতে পারবে।

২৪. এ পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয় মূল্য, লাভের পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ক্রেতাকে বলতে কিংবা চুক্তিপত্রের উল্লেখ করতে বিক্রেতা বাধ্য নয়। কেবল পণ্যের বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

২৫. ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হবার জন্যে সহায়ক এবং কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এরূপ যে কোন শর্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে যোগ করা যাবে। কোন পক্ষ উক্ত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করা যায়।

২৬. বিক্রয়ের মালামাল (معقوج عليه) প্রয়োজনীয় ও উপকারী হওয়া আবশ্যক।

২৭. বাই মুয়াজ্জাল অর্থাৎ বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততার জন্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে কোন জিনিস বন্ধক (Mortgage) নিতে পারবে।

২৮. বিক্রেতা (বন্ধক গ্রহীতা) বন্ধকী জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না; এবং ব্যবহার করার শর্তও করতে পারবে না। শুধুমাত্র দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী জিনিস পাওনাদার (বিক্রেতা) নিজের দখলে রাখতে পারবে।

২৯. বন্ধকী জিনিস দিয়ে কোন মুনাফা অর্জিত হলে তা প্রকৃত মালিকের প্রাপ্য হবে। বিক্রেতা (বন্ধক গ্রহীতার) তা ভোগ করতে পারবে না।

৩০. বন্ধকী মাল বিক্রেতার (বন্ধক গ্রহীতার) নিকট সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক নষ্ট হলে এর দায় দায়িত্ব বিক্রেতাকে (বন্ধক গ্রহীতাকে) বহন করতে হবে।

৩১. বন্ধকী মাল স্থাবর সম্পত্তি হলে এবং তা চুক্তি মোতাবেক ক্রেতার (বন্ধকদাতার) তত্ত্বাবধানে থাকলে, ক্রেতা (বন্ধকদাতা) বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি সাপেক্ষে চুক্তি মোতাবেক বন্ধকী জিনিস দিয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারবে এবং ক্ষতি সাধিত হলে এর দায় দায়িত্ব ক্রেতাকে (বন্ধক

Dhaka University Institutional Repository

দাতাকে) বহন করতে হবে। তবে ক্রেতা (বন্ধকদাতা) বন্ধকী জিনিস বিক্রি করতে পারবে না। করলে তা অবৈধ হবে।

৩২. বিক্রয় মূল্য পরিশোধের পূর্বে বন্ধকদাতার মৃত্যু হলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক লব্ধ মাল পাবার অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে। তবে বন্ধক লব্ধ মালের মূল্য যদি পাওনা টাকার চেয়ে বেশী হয় তাহলে অতিরিক্ত অর্থ বন্ধক গ্রহীতা মৃতের উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। আর যদি বন্ধক লব্ধ মালের মূল্য পাওনা টাকার চেয়ে কম হয় তাহলে যত টাকা কম হবে তা মৃতের উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। কারণ তা মৃতের ঋণ হিসেবে গণ্য।

৩৩. মৃতের উত্তরাধিকারীগণ বন্ধক গ্রহীতার পাওনা টাকা পরিশোধ করে বন্ধককৃত জিনিস ছাড় করে দিতে পারবে এবং বন্ধক গ্রহীতাও তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

৩৪. ক্রেতা আর্থিক অভাবের কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিলে তা বৈধ হবে। তবে বর্ধিত সময় সীমা উত্তীর্ণ হবার পূর্বে বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতাকে তাগাদা দিতে পারবে না।

৩৫. মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিত করা হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে বিক্রীত মালের ওপর অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য করা কিংবা বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে দেয়া যাবে না। যদি তা করা হয় তাহলে অতিরিক্ত অর্থ সুদ হবে। এ পদ্ধতিতে একবার বিক্রয় মুল্য নির্ধারণ করা হলে তা আর বর্ধিত করা যায় না। কারণ ক্রেতার নিকট মালের মূল্য ঋণ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আর ঋণের উপর অতিরিক্ত কিছু আদায় করার অর্থ হচ্ছে সুদ আদায় করা।

৩৬. ক্রেতা যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার পাওনা টাকা (বিক্রয় মূল্য) পরিশোধ না করে কিংবা পাওনা পরিশোধে টালবাহানা করে তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে।

৩৭. ক্রয়-বিক্রয়ে এরূপ বলা যাবে না যে, নগদ হলে এত টাকা আর বাকী হলে এত (বেশী) টাকা। এরূপ বলা হবে এবং সময়ের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত কিছু আদায করা হবে তা সুদ হবে।

৩৮. চুক্তিপত্রে বাই মুয়াজ্জাল নীতিমালার পরিপন্থি কোন শর্তারোপ করা যাবে না।

৩৯. ক্রীত মালামাল ক্রেতার দখলে না আসা পর্যন্ত তা পুনরায় বিক্রি করা জায়েজ নয়। ক্রীত দ্রব্য ক্রেতা প্রথমে নিজের দখলে আনবে। অতপর আবশ্যক বোধে তা বিক্রি করবে।

বাই সালাম (البيع السلم) : অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়

পবিত্র কুরআনের বলা হয়েছে :

يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه-

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্যে ঋণের আদান প্রদান কর তখন উহা লিপিবদ্ধ করে রেখো।[৬]

---

৬. সূরা বাকারা : ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ফুকাহায়ে কিরাম ও আয়াতকে বাই সালাম এর বৈধতার অনুকূলে পেশ করেছেন।

'বাই সালাম (Bai-Salam) অর্থাৎ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করা ইসলামে বৈধ। তবে এ জন্যে পণ্যে গুণাগুণ, পরিমাণ, মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকতে হবে। হাদীস শরীফে রয়েছে :

عن ابن عباس قال قدم رسول الله (ص) المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلث فقال من اسلف فى شيئ فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই, তিন বৎসরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করত। তা দেখে, রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন : 'যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাণ, নির্ধারিত ওজন এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্যে করে।'[৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা.) বলেছেন :

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে এবং হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এর যুগে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতাম।

বাই সালাম বৈধতার বিষয়ে বহু হাদীস রয়েছে। যে সকল সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুল মুজালিদ (রা.) মুহাম্মদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রা.) শাইবানী (রা.) আবুল বাখতারী (রা:) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ইবনে আবু আওফা (রা.) ও ইবনে আবু নাজীর (রা.) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

খাদ্য শস্য, কাপড় এবং যে সব জিনিসের পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা, প্রকৃতি ও ধরন নির্ধারণ করা যায় সেগুলোর বাই সালাম অর্থাৎ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় বৈধ। তবে পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, পণ্য সরবরাহের তারিখ ইত্যাদি অবশ্যই স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; যাতে ভবিষ্যতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি না হয়। জীবজন্তু, পশুপাখি, মণিমুক্তা ইত্যাদির অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় অধিকাংশ ফকীহগণের মতে বৈধ নয়। কারণ এগুলোর পরিমাণ ও গুণাগুন সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

কোন বাড়ি বা কৃষক যদি বাই সালাম পদ্ধতিতে পণ্যের অগ্রিম বিক্রয় মূল্য নিয়ে ধান, গম, সরিষা, ইক্ষু, শাকসবজি, ফলমূল কিংবা অন্য কোন ফসলের চাষাবাদ করে এবং পরবর্তীতে কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাকেই (কৃষককেই) সে ক্ষতির দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। ক্রেতা কোন দায় দায়িত্ব বহন করবে না। বিক্রেতা (কৃষক) ক্রেতাকে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পণ্যসামগ্রী সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকবে অথবা ক্রেতাকে পণ্যের মূল্য ফেরত দেবে। কারণ বাই সালাম পদ্ধতিতে ক্রেতা একটি নির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী একটি নির্ধারিত মুল্যে ক্রয়ের চুক্তিতে অগ্রিম মূল্য প্রদান করেছিল। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له وما تزهى قال حتى تحمر فقال رسول الله (ص) ارأيت اذا منع الله الثمرة بما ياخذ احدكم مال اخيه وقال الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه اخبرنى سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر باتمر-

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ফলের রং না আসা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, (ফলের) রং আসার অর্থ কি? তিনি বললেন, লোহিত বর্ণ ধারণ করা। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, আচ্ছা বল তো, আল্লাহ যদি ফলের উৎপাদন প্রতিরোধ

৭. সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

Dhaka University Institutional Repository

করেন তবে তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন অধিকারে (কিসের বিনিময়ে) তার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করবে। ইবনে শিহাব বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি উপযোগিতা সৃষ্টির পূর্বেই ফল ক্রয় করে এবং পরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মালিককে অর্থাৎ বিক্রেতাকে ঐ ক্ষতির দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। সালিম ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ফলে উপযোগিতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করো না এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছে খেজুর বিক্রি করো না।[৮]

এ পদ্ধতিতে মালের উৎপাদন খরচ, মালের ক্রয় মূল্য কিংবা লাভের পরিমাণ ক্রেতাকে জানানো বা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকা আবশ্যক নয়। কেবলমাত্র মালের বিক্রয় মূল্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করে তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করলেই চলে। এছাড়া বিক্রীত মাল ক্রেতার নিকট সরবরাহের সময়সীমা অবশ্যই নির্দিষ্ট থাকতে হবে। কোরআন, হাদীস ও ইজমার দ্বারা এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ প্রমাণিত।

এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যেই ঝুঁকি রয়েছে। উভয় পক্ষ যদি সৎ ও আদর্শবান না হয় তাহলে এ পদ্ধতিতে আর্থিক দুর্বলতা সুযোগ অধিক মূনাফা আদায়, প্রতারণা, সুদের অনুপ্রবেশ ঘটা ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে।

বাই সালাম-এর শর'য়ী বিধান

১. ক্রেতা ও বিক্রেতার ইজাব ও কবুল দ্বারা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বুদ্ধিমান ও ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তবে বালেগ হওয়া শর্ত নয়।

২. চুক্তিপত্র মালের বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হতে হবে।

৩. মূল্য নগদ অর্থে (In cash) কিংবা মালের দ্বারা পরিশোধ করা যাবে। মূল্য মালের দ্বারা পরিশোধযোগ্য হলে তা পরিমাপযোগ্য, না ওজনযোগ্য, না গণনাযোগ্য তার বিবরণ এবং পরিমাণ চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৪. মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধযোগ্য হলে তা কোন দেশীয় মুদ্রা তার উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. ক্রেতা বিক্রেতার নিকট পূর্বের কোন অর্থ (ঋণ) পাওনা থাকলে চুক্তিপত্রে তা মূল্য হিসেবে গণ্য করা যাবে।

৬. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময়ই মূল্য বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। নতুনা মজলিশ (স্থান) ত্যাগের সাথে সাথে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৭. চুক্তিপত্রে বিক্রীত মালের গুণাগুণ, শ্রেণী, প্রজাতি, পরিমাণ, অবস্থা, ধরন, সরবরাহের তারিখ, স্থান ইত্যাদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। যেন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা না থাকে, যা পরে বিতর্কের সৃষ্টি করতে না পারে।

৮. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে যে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হবে তা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বিক্রেতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

---

৮. সহীহ বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

৯. এ পদ্ধতিতে কেবল খাদ্য শস্য, কাপড় এবং ঐ সকল জিনিসের ক্রয় বিক্রয় বৈধ যেগুলো গুণাগুণ, অবস্থা, ধরন ও পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। জীবজন্তু, মণিমুক্ত ইত্যাদির অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়।

১০. যে মালের ক্রয় বিক্রয় চুক্তি হবে সে মাল ইসলামী শরীয়ায় অবশ্যই হালাল মাল হতে হবে।

১১. ক্রেতার নিকট মাল সরবরাহের সময়কাল সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ (যেমন রমযানের পরে, বর্ষার পরে, হজ্জের পরে ইত্যাদি) নির্ধারণ করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রা:) চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় হতে মাল হস্তান্তর পর্যন্ত কমপক্ষে একমাস সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। মাল সরবরাহের সময়কাল ক্রেতা বিক্রেতার পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১২. যে মালের অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে, চুক্তি সম্পাদনের সময় হতে মাল হস্তান্তরের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাজারে সে মাল সহজ লভ্য থাকতে হবে। মাল বাকী না রেখে তৎক্ষণাৎ হস্তান্তরের শর্ত করা হলে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

১৩. বিক্রীত মাল ক্রেতার নিকট সরবরাহের স্থানের নাম, সময়, পরিবহন খরচ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে যাতে পরবর্তীতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন বিতর্কের সূত্রপাত না হয়।

১৪. চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল ডেলিভারী দিলে ক্রেতা তা গ্রহণের অস্বীকৃত জানাতে পারবে না। তবে চুক্তিপত্রের শর্ত বহির্ভূত মাল ডেলিভারী দেয়া হলে বিক্রেতাকে শর্তানুযায়ী মাল ডেলিভারী দিতে বাধ্য করা যাবে।

১৫. চুক্তিপত্রে ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থি কোন শর্তারোপ করা যাবে না।

১৬. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় মুল্য পরিশোধের বিপরীতে বিক্রেতার নিকট থেকে Sceurity হিসেবে কোন জিনিস বন্ধ (Mortgage) রাখা যাবে।

১৭. বন্ধকী মাল সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ক্রেতার নিকট নষ্ট হলে এর দায় দায়িত্ব ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

১৮. ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তরের মেয়াদকালের মধ্যে মাল হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রেতার মৃত্যু হলে ক্রেতা বন্ধকলব্ধ মাল পাবার অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে। তবে বন্ধকলব্ধ মালের মূল্য ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী হলে ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য বিক্রেতার উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। ক্রেতা বন্ধকী জিনিসের কোনরূপ ব্যবহার করতে পারবে না।

১৯. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে ক্রেতা ও বিক্রেতার কোন পক্ষই একক ভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। তবে পারস্পরিক সম্মতিতে যে কোন পক্ষ চুক্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করতে পারে।

২০. মালামাল চুক্তিপত্রে বর্ণিত গুণাগুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী না হলে বা ত্রুটিযুক্ত হলে ক্রেতা ইচ্ছে করলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বহালও রাখতে পারবে, ইচ্ছে করলে বাতিলও করতে পারবে। কিন্তু মালের ত্রুটি যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা ক্রেতার অবহেলার কারণে হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

২১. যুক্তি সংগত কারণে কিংবা ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির আংশিক বাতিল করা হলে বিক্রেতা ক্রেতাকে বাতিলকৃত অংশের মূল্য ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

২২. বিক্রেতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

২৩. বাই সালাম পদ্ধতিতে কোন বস্তু অগ্রিম ক্রয় করার পর সে বস্তু ক্রেতা কর্তৃক হস্তগত করার পূর্বে অপরের নিকট বিক্রি করতে পারে না।

২৪. এ পদ্ধতিতে মালামাল সরবরাহের সময় যদি দেখা যায় যে, মালের পরিমাণ চুক্তিপত্র কিংবা পরিশোধিত মূল্যে তুলনায় বেশী তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে অতিরিক্ত মালের মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে অথবা অতিরিক্ত মাল ফেরত দেবে। আর যদি মালের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে বিক্রেতা ক্রেতাকে যতটুকু পরিমাণ মাল কম দিয়েছে ততটুকু মাল বা এর মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

২৫. ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হবার জন্য সহায়ক এবং কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এরূপ কোন শর্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে যোগ করা যাবে। কোন পক্ষ উক্ত শর্ত পুরণে ব্যর্থ হলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করা যাবে।

বাই মুদারাবা : উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

واخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله-

কিছু কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের (মুনাফা) সন্ধানে পৃথিবীতে বিচরণ করে।[৯]

মুদরাবা হচ্ছে ইসলামের একটি প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি। বিশ্বনবী (সা:) নবুয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বে হযরত খাদিজা (রা:) এর মূলধন দিয়ে এ ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। নবুয়্যতপ্রাপ্তির পরও তিনি এ ধরনের ব্যবসাকে বহাল রাখেন। অনেক সাহাবী পরস্পর এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করতেন।

এ পদ্ধতিতে মূলধন সরবরাহকারী এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। মূলধন ব্যবহারকারী অর্থাৎ উদ্যোক্তাও এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যবসার মুনাফা সাহিবুল মাল (মূলধন সরবরাহকারী) ও মুদারিবের (উদ্যোক্তার) মধ্যে এজমালি থাকে। অর্থাৎ ব্যবসার মুনাফা সাহিবুল মাল ও উদ্যোক্তার মধ্যে পারস্পরিক ও সম্মতিক্রমে মুনাফার অংশের হার হিসেবে (যেমন ৬০৮% : ৪০% : ৫০% : ৫০%; ৫৫%: ৪৫% ইত্যাদি হারে। পূর্বেই নির্ধারণ করতে হয়। মুনাফার হার পূর্বে নির্ধারণ করা না হলে মুনাফা সমান সমান হারে পাবে। তবে কোন পক্ষই মুনাফার টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট (যেমন বাৎসরিক ৪০০০/-, ৫০০০/-ইত্যাদি) করে নিতে পারবে না। এতে মুদারাবা বৈধ হবে না। আর যদি ব্যবসায় কোন লোকসান হয় তাহলে সম্পূর্ণ লোকসান মূলধনের মালিককে একাই বহন করতে হবে। মুদারিব কোন লোকসান বহন করবে না। মুদারিবের কোন কোন লোকসান বহন করার শর্ত থাকলে তা অবৈধ এবং চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কারণ লোকসান হচ্ছে মূলধনের হ্রাস বা ক্ষয়। তাই ব্যবসার সমস্ত লোকসান স্বাভাবিক ভাবেই সাহিবুল মালকেই বহন করতে হবে। এ পদ্ধতিতে মুদারিব কোন পারিশ্রমিক পায় না এবং পারিশ্রমিকের কোন শর্তও করা যায় না। ব্যবসায় মুনাফা অর্জিত হলে মুদারিব পূর্ব নির্ধারিত হারে মুনাফা পাবে, আর মুনাফা অর্জিত না হলে কিছুই পাবে না। তার শ্রম বৃথা যাবে। মুদারিব কষ্ট করে ব্যবসা পরিচালনা করেছে; অথচ সে কোন মুনাফা অর্জন করতে পারল না। তার শ্রম, মেধা, কষ্ট সবকিছুই বিফল হলো। প্রকারান্তরে শ্রম বৃথা যাওয়াই মুদারিবের

---

৯. সূরা মুযযাম্মিল : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসান। এ পদ্ধতিতে মুলধনের মালিক মুদারিবের নিকট থেকে প্রয়োজনবোধে (Security) স্বরূপ কোন কিছু বন্ধক রাখতে পারবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সৎ, আমানতদার ও আদর্শবান ব্যবসায়ীদের এ পদ্ধতিতে পুঁজির যোগান দিয়ে থাকে।

বাই মুদারাবার শ্রেণী বিভাগ

মুদারাবা দুই ভাবে বিভক্ত। যথা : (১) মুদারাবা মুতলাক (مضاربة مطلق) ও (২) মুদারাবা মুক্বাইয়াদা (مضاربة مقيدة)।

১. মুদারাবা মুতলাক : যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, সময়সীমা শ্রেণী, অংশীদারগণের সংখ্যা, ব্যবসার প্রকৃতি, পরিধি, কোথা হতে মাল ক্রয় করবে, কোথায় মাল বিক্রি করবে, কি মালের ব্যবসা করবে ইত্যাদি কোন কিছুই নির্দিষ্ট থাকে না তাকে 'মুদারাবা মুতলাক' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে সাহিবুল মাল মুদারিবকে মুদারিবের ইচ্ছামত অর্থাৎ মুদারিব যা ভাল মনে করে সে ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য অনুমতি প্রদান করে। এ পদ্ধতিতে মুদারিব (উদ্যোক্তা) যে কোন স্থানে, যে কোন পণ্যের স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এছাড়া ব্যবসায়িক স্বার্থে কর্মচারী নিয়োগ, অফিস ভাড়া, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। তবে মুদারিব সাহিবুল মাল অর্থাৎ মূলধনের মালিকের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার মূলধন মালের সাথে মিশাতে কিংবা মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসা করার জন্য অপরকে পুঁজি প্রদান করতে পারবে না। সাহিবুল মাল অনুমতি দিলে বা চুক্তি থাকলে পারবে।

২. মুদারাবা মুক্বাইয়াদা : যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, পরিধি. প্রকৃতি, সময়সীমা, শ্রেণী, অংশীদারগণের সংখ্যা, কার নিকট থেকে মাল ক্রয় করবে, কোথায় বিক্রি করবে, কি মালের ব্যবসা করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় কিংবা যে কোন একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তাকে মুদারাবা মুক্বাইয়াদা বলে। এ পদ্ধতিতে মুদারিবের ব্যবসায়িক পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী এবং পুঁজি মালিকের নির্দেশ মোতাবেক তাকে অবশ্যই ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। এর ব্যতিক্রম করা বৈধ নয়।

বাই মুদারাবার শর'য়ী বিধান

১. এ পদ্ধতিতে দু'টি পক্ষ থাকতে হবে। যথা সাহিবুল মাল (পুঁজির মালিক) এবং মুদারিব (ব্যবসা পরিচালনাকারী বা উদ্যোক্তা)। ইসলামী ব্যাংকের পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় 'মুদারিব' এবং একাউন্ট হোল্ডার অর্থাৎ অর্থ জমাদানকারী হয় 'সাহিবুল মাল'। আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় সাহিবুল মাল এবং ব্যাংকের গ্রাহক (বিনিয়োগ গ্রহীতা) হয় মুদারিব।

২. মুদারিবকে (উদ্যোক্তাকে) ব্যবসায় স্বীয় দায়িত্ব ও ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় মুদারাবা চুক্তিও দুই পক্ষের পারস্পরিক ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি) দ্বারা সম্পাদিত হবে।

৩. এ পদ্ধতিতে মূলধনের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হবে হবে এবং মূলধনের মালিককে সম্পূর্ণ মূলধন মুদারিবের পূর্ণ দখলে অবশ্য প্রদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মূলধন অবশ্য নগদ মুদ্রার অংশ হতে হবে। অথবা মূলধন এমন জিনিস হতে হবে যা অংশীদারী কারবারের মূলধন হতে পারে।

৫. এ পদ্ধতিতে পুঁজির মালিক বা পুঁজি সরবরাহকারীকে বলা হয় সাহিবুল মাল ও রাব্বুর মাল এবং উদ্যোক্তা বা ব্যবসা পরিচালনাকারীকে বলা হয় মুদারিব। সাহিবুল মাল এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। আবার মুদারিব এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে।

৬. মূলধনের মালিক ও মুদারিবের মধ্যে ব্যবসার মুনাফার অংশ (৬০% : ৪০% : ৭০% : ৩০%: ৪৫% : ৫৫% : ইত্যাদি হারে) পারস্পারিক সম্মতিক্রমে পুর্বেই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কিন্তু কোন পক্ষই মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে (যেমন বাৎসরিক বা মাসিক ৬০০০/-, ৮০০০/-, ২০০০০/-) ইতাদি নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে না। টাকার অংশ এরূপ নির্দিষ্ট করা হলে তা সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে। মুনাফার অংশ পূর্বে নির্ধারণ করা না হলে উভয় পক্ষই সমান সমান হারে মুনাফা লাভ করবে। অন্যথায় ক্রয় বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

৭. এ পদ্ধাতিতে মূলধনের মালিক সরবরাহকৃত মূলধনের ওপর অগ্রিম কোন মুনাফা ধার্য করতে পারবে না; বরং ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হবে তা মালিক ও উদ্যোক্তার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করা যাবে।

৮. এ পদ্ধতিতে পুঁজির মালিক (সাহিবুল মাল) কিংবা তার মনোনীত কোন ব্যক্তি উদোক্তার সাথে স্বশরীরে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং অংশগ্রহণ করার জন্য কোন শর্তও করতে পারবে না। শর্ত করা হলে মুদারাবা চুক্তি ফাসিদ হবে। তবে প্রয়োজনে বিভিন্ন পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিতে পারবে।

৯. ঋণের দ্বারা মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। যেমন - ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে বলে, তোমার নিকট আমার প্রাপ্য ঋণ দ্বারা মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হও তাহলে তা বৈধ হবে না।

১০. এ পদ্ধতিতে ব্যবসার মূলধন মুদারিবের হস্তগত হবার পর এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করার পূর্ব পর্যন্ত মুদারিব মুলধনের আমানতদার হিসেবে গণ্য হবে, ব্যবসায়ে মুলধন বিনিয়োগ করার পর মুদারিব মূলধন সরবরাহকারীর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে এবং ব্যবসায়ে লাভের অংশীদার হবে।

১১. এ পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের মুনাফার হার নির্দিষ্ট না করে একপক্ষের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা নির্ধারণ করা হলে কিংবা মূলধন সরবরাহকারী বা তার কোন প্রতিনিধি ব্যবসায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করার শর্ত করা হলে মুদারাবা চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

১২. ব্যবসা পরিচালনার যাবতীয় খরচ এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ গমন করা হলে এর যুক্তিসংগত খরচ মুদারিব ব্যবসা হলে প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ ব্যবসা থেকে খরচ করবে।

১৩. মুদারাবা মুতলাক পদ্ধতিতে মুদারিব ব্যবসা পরিচালন, প্রকল্প গ্রহণ, লোক নিয়োগ, অফিস ভাড়া ও ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ এখতিয়ার ভোগ করবে। কিন্তু মুদারাবা মুক্বাইয়াদা এর ক্ষেত্রে মুদারিবকে রাব্বুল মাল এর নিদেশ মোতাবেক এবং চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. মুদারিব সাহিবুল মালের অনুমতি ব্যতীত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। অনুমতি সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করা হলে তা শিরকাতুল ওয়াজুহ এর নীতিমালা অনুযায়ী উভয়ের সম্মিলিত মুলধন হিসেবে গণ্য হবে।

১৫. মুদারাবা মুতলাক পদ্ধতিতে মুদারিব সাহিবুল মাল এর অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার মূলধন নিজের মালের সাথে মিশাতে, অন্যকে মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ করতে কিংবা মুদারাবা চুক্তিতে অন্যকে ব্যবসা করতে দিতে পারবে না। সাহিবুল মাল অনুমতি দিলে পারবে। এছাড়া মুদারাবা মুক্বাইয়াদা পদ্ধতিতে তো পারবেই না; বরং এ পদ্ধতিতে মুদারিবকে সাহিবুল মাল এর নির্দেশ মত এবং চুক্তিপত্রের শর্তানুয়ায়ী কারবার পরিচালনা করতে হবে।

১৬. সাহিবুল মাল এর অনুমতি সাপেক্ষে তার দেয়া মুলধনের সাথে মুদারিব তার নিজের মূলধন যোগ করলে অর্জিত মুনাফাকে উভয়ের মূলধনের হার অনুযায়ী ভাগ করা হবে। প্রথমে মুদারিব নিজের যোগকৃত মূলধনের মুনাফার অংশ পাবে। অতপর সাহিবুল মাল এর দেওয়া মূলধনের মুনাফার অংশ চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের ভাগ করা হবে।

১৭. সাহিবুল মাল কর্তৃক ব্যবসায়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হলে মেয়াদ শেষ হবার সংঙ্গে সংঙ্গেই মুদারাবা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। এ পদ্ধতিতে পুনরায় ব্যবসা করলে আবার নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

১৮. মুদারিব চুক্তি বহির্ভুত কোন কাজ করলে, অর্থ আত্মসাৎ করলে, অসৎ পথ অবলম্বন করলে, অত্যাধিক মূল্যে মাল ক্রয় করলে কিংবা ব্যবসায়ে প্রচলিত রীতির বিপরীত কাজ করলে এবং তা প্রমাণিত হলে কিংবা স্বীকাররোক্তি করলে সে ব্যবসায়ের মুনাফা হতে বঞ্চিত হবে, লোকসান বহন করবে এবং ব্যবসার কোন ক্ষতি সাধিত হলে এর জন্যে দায়ী থাকবে। এক্ষেত্রে সাহিবুল মাল প্রয়োজনবোধে মুদারিবকে বরখাস্ত ও করতে পারবে।

১৯. চুক্তি মোতাবেক মুনাফা ভাগ করে নেযার পর কারবার চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এরপর পুনরায় নুতন চুক্তি করে কারবার আরম্ভ করার পর আংশিক বা সম্পূর্ণ মূলধন নষ্ট হলে প্রথম মুনাফা ফেরত দিতে হবে না।

২০. ব্যবসায় কোন লোকসান হলে তা পূর্বে অর্জিত মুনাফা হতে পূরণ করা হবে, যদি তা ইতোমধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করা না হয়ে থাকে। যদি ভাগ করা হয়ে থাকে তাহলে পূর্বের যার যার অর্জিত মুনাফা ফিরিয়ে দিতে হবে না, বরং সম্পূর্ণ লোকসান মূলধন হতে বিয়োগ করা হবে।

২১. লোকসানের পরিমাণ পূর্বের অর্জিত মুনাফার চেয়ে অধিক হলে অধিক পরিমাণটুকু মূলধন হতে বিয়োগ করা হবে যদি পূর্বের মুনাফা ভাগ করা না হয়ে থাকে। অর্জিত মুনাফা ভাগ করা হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ লোকসান মূলধন হতে বিয়োগ করা হবে। কোন অবস্থঅতেই মুদারিব লোকসান বহন করবে না এবং পারিশ্রমিক ও দাবী করতে পারবে না। তার শ্রম বৃথা যাবে।

২২. এ পদ্ধতিতে মুদারিবে লোকসান বহন করার কিংবা পারিশ্রমিক পাওয়ার শর্ত করা যাবে না। কারণ এ পদ্ধতিতে মুদারিবের লোকসান বহন করা কিংবা পারিশ্রমিকের শর্ত করা যায় না।

২৩. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবার ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী সমস্ত মুনাফা লাভ করবে এবং মুদারিব শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং সে তার যুক্তিসংগত মজুরী প্রাপ্ত হবে। তবে মজুরীর পরিমাণ চুক্তিপত্রে বর্ণিত মুনাফার অধিক হবে না। এছাড়া মুনাফা অর্জিত না হলে মুদারিব কোন পারিশ্রমিক পাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. মূলধনের মালিক অথবা মুদারিব (উদ্যোক্তা) যদি মৃত্যুবরণ করে কিংবা স্থায়ীভাবে পাগল হয় কিংবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে (মুরতাব হয়ে যায়) তাহলে বাই মুদারাবা চুক্তির অবসান ঘটবে।

২৫. সাহিবুল মাল (মুলধনের মালিক)হয়ে মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারগণ মুদারাবার মূলধন ও লাভ লোকসান প্রাপ্য হবে।

২৬. মুদারিব যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, ব্যবসার মূলধনের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

২৭. চুক্তিপত্রে মুদারাবা নীতিমালার পরিপন্থি কোন শর্তারোপ করা হলে তা বেধ হবে না।

২৮. এ পদ্ধতিতে অর্থের নিরাপত্তা ও মুদারিবের বিশ্বস্ততার জন্যে প্রয়োজনে মুদারিবের নিকট হতে পারস্পারক আলোচনার ভিত্তিতে জায়গা জমি, দালান কোটা, ঘরবাড়ী, কিংবা অন্যান্য সম্পদ বন্ধক রাখা যায়।

বাই মুশারাকা : শিরকাত অংশীদারী কারবার

বিশ্বনবী (সা:) এর আবির্ভাবকালে গোটা আরব জাহানে এ ধরণের কারবারের প্রচলন ছিল। নব্যুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ধরণের কারবারকে বহাল রাখেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم-

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না; তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ।[১০]

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে :

عن ابى هريرة (رض) رفعه قال ان الله عز وجل يقول انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا اخنانه خرجت من بينهما-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নাম করে বললেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয় হই, যে যাবত না তার একেঅন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আমি তাদের মধ্যে হতে সরে পড়ি।[১১]

এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ে অংশীদারগণের মুলধন এবং লাভ সম্মান সমান অথবা কমবেশি হতে পারে। তবে প্রত্যেকের লাভের হার (যেমন ৪০%: ৬০%, ৫০%: ৫০%, ৭০% : ৩০ ইত্যাদি হারে) পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পূর্বেই নির্ধারিত হতে হবে। কিন্তু কোন অংশীদার তার লাভের পরিমান নির্দিষ্ট (যেমন মাসিক বা বাৎসরিক ২০,০০০/-, ২৫,০০০/- ৩০,০০০/- ইত্যাদি) করে গ্রহণ করতেপারবে না আর লোকসান হলে কারবারের লোকসান অবশ্যই মূলধনের আনুপাতিক হারে বহন করতে হবে। এছাড়া কোন অংশীদার তাদের দেয়া মুলধনের উপর অগ্রিম মুনাফা ধার্য ও আদায় করতে পারবে না। বরং

---

১০. সূরা আন নিসা : ২৯।

১১. আবু দাউদ।

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করা হবে। আর লোকসান মূলধনের আনুপাতিক হারে অবশ্যই বহন করতে হবে।

বাই মুশারাকা বা শিরকাতের শ্রেণীবিভাগ

বাই মুশারাকা প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা :

ক. শিরকাতুল মিল্ক (شركة الملك) অর্থাৎ মালিকানায় অংশীদারিত্ব। ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি, দালান কোটা বা অন্য কোন স্থাবর অস্থাবর জিনিসের মালিকানায় কোনরূপ চুক্তি ব্যতীত অংশীদার হওয়াকে 'শিরকাতুল মিলক' বলে।

খ. শিরকাতুল আক্দ (شركة العقد) অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। ক্রয় বিক্রয় বা ব্যবসা চুক্তির অংশীদার হওয়াকে 'শিরকাতুল আকদ' অথবা 'শিরকাতুল উকুদ' (شركة العقود) বলে। 'শিরকাতুল আকদ' আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :

১. শিরকাতুল মুফাওয়াদা (شركة مفاوضة) অর্থাৎ সম-অংশীদারী কারবার;

২. শিরকাতুল ইনান (شركة العنان) অর্থাৎ অসম-অংশীদারী কারবার;

৩. শিরকাতুল সানাই (شركة الصنائع) অর্থাৎ পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার, একে 'শিরকাতুল আ'মাল' (شركة الاعمال) অর্থাৎ শ্রমভিত্তিক অংশীদারিত্ব এবং 'শিরকাতুল আবদান' (شركة الابدان) অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম ভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলা হয়। এবং

৪. শিরকাতুল ওয়াজুহ (شركة الوزوه) অর্থাৎ সুনামভিত্তিক অংশীদারী কারবার।

'শিরকাতুল আকদ'-এর বিকল্প শ্রেণীবিভাগ

'শিরকাতুল আকদ'কে বিকল্পভাবে ৩ (তিন) শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. শিরকাতুল আমওয়াল : (شركة الاموال) অর্থাৎ পুঁজিভিত্তিক অংশীদারিত্ব; (এটি শিরকাতুল মুফাওয়াদা ও শিরকাতুল ইনান এর বিকল্প নাম)।

খ. শিরকাতুল আ'মাল : (شركة الاعمال) অর্থাৎ শ্রমভিত্তিক অংশীদারিত্ব। একে শিরকাতুল সানাই' এবং 'শিরকাতুল আবদান'ও বলা হয়।

গ. শিরকাতুল ওয়াজুহ : (شركة الوجوه) অর্থাৎ সুনামভিত্তিক, অংশীদারিত্ব। উপরের ৩ (তিন) টির প্রত্যেকটিকে আবার ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- শিরকাতুল মুফাওয়াদা অর্থাৎ সম-অংশীদারি কারবার এবং

-শিরকাতুল ইনান অর্থাৎ অসম-অংশীদারী কারবার।

এ হিসাবে 'শিরকাতুল আকদ'কে মোট ৬ (ছয়) ভাগে বিভক্ত করা যায়' যথা :

১. শিরকাতুল আমওয়াল বিল মুফাওয়াদা (شركة الاموال بالمفاوضة) অর্থাৎ সম পুঁজিভিত্তিক অংশীদারী কারবার;

২. শিরকাতুল আমওয়াল বিল ইনান (شركة الاموال بالعنان) অর্থাৎ অসম পুঁজিভিত্তিক অংশীদারী কারবার;

Dhaka University Institutional Repository

৩. শিরকাতুল আ'মাল বিল মুফাওয়াদা (شركة العمال بالمفاوضة) অর্থাৎ সম-শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবার;

৪. শিরকাতুল আ'মাল বিল ইনান (شركة الاعمال بالعنان) অর্থাৎ অসম শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবার।

৫. শিরকাতুল ওয়াজুহ বিল মুফাওয়াদা (شركة الوجوه بالمفاوضة) অর্থাৎ সম সুনাম ভিত্তিক অংশীদারী কারবার এবং অসম সুনাম ভিত্তিক অংশীদারী কারবার।

শিরকাতুল মিল্‌ক বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব

কোনরূপ চুক্তি ব্যতীত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোন জিনিসে উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে মালিকানায় অংশীদারিত্ব লাভ করাকে শিরকাতুল মিল্‌ক (شركة الملك) বলে যেমন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পরিত্যাক্ত স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তিতে যে উত্তরাধিকার লাভ করে তা হচ্ছে 'শিরকাতুল মিল্‌ক এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ইসলামী আইন মোতাবেক উত্তরাধিকারীগণ মালিকানা লাভ করে থাকে। তাই একে বলা হয় 'শিরকাতুল মিল্‌ক (মালিকানায় অংশীদাত্বি)। এরূপ অংশীদারিত্বে পরস্পরের অনুমতি ব্যতীত একে অন্যের অংশ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

এছাড়া দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রে মিলে কোনরূপ পূর্ব চুক্তি ব্যতীত কোন কিছু ক্রয় করে (ক্রয়সূত্রে) মালিকানায় অংশীদারিত্ব লাভ করলে তাকেও বলা হয় 'শিরকাতুল মিলক)'। কিন্তু ক্রয় বিক্রয়ে মালিকানা ও লাভ লোকসানের ক্ষেত্রে কোন চুক্তি (আকদ عقد) সম্পাদিত হলে তাকে বলা হবে 'শিরকাতুল আকদ' বা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। কেউ কেউ ক্রয় বিক্রয়ে লাভ লোকসান নির্ধারণ এবং মালিকানা চুক্তি ভিত্তিক হলেও তা 'শিরকাতুল মিলক' এর অন্তর্ভুক্ত বলে মত পোষণ করেছেন। তাদের মতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চুক্তিভিত্তিক যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে কোন জিনিস ক্রয় করলে যেহেতু জিনিসটি অংশীদারগণের সবার যৌথ মালিকানাধীন থাকে অর্থাৎ জিনিসটির উপর অংশীদারগণের প্রত্যেকেরই নির্ধারিত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেহেতু এ ধরণের যৌথ মালিকানাধীন ক্রয় বিক্রয় বা কারবারকেও 'শিরকাতুল মিলক' বলে আখ্যায়িত করা যায়।

তবে এটি প্রকৃতপক্ষে অংশীদার কারবারের আসল পদ্ধতি নয়। আসল পদ্ধতি হচ্ছে শিরকাতুল আকদ। অর্থাৎ 'শিরকাতুল আকদ বিল মুফাওয়াদা' এবং 'শিরকাতুল আকদ বিল ইনান।

শিরকাতুল মুফাওয়াদা বা সম-অংশীদারী কারবার

যে অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ তাদের মূলধন, লাভ-লোকসান, ব্যবসায়ে শ্রমদান, দায়িত্ব, কর্তব্য, ঋণ পরিশোধ, ব্যবসার প্রকৃতি, পরিধি ইত্যাদি সকল বিষয়ে সম-অংশীদারিত্বের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় তাকে 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা' (شركة المفاوضة) বলে। এ ধরনের অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ পরস্পরের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে গণ্য হয়। শিরকাতুল মুফাওয়াদায় একে অন্যের পক্ষে জামিনদার ও দায়ী বিধায় সকল অংশীদারগণের ধর্ম (Religion) এক হতে হবে। কারো কারো মতে ধর্ম এক হওয়া শর্ত নয়।

যারা এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে তাদেরকে চুক্তিপত্রে 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা' (شركة المفاوضة) শব্দটি অর্থাৎ ব্যবসায়িক সকল বিষয়ে 'সম দায়-দায়িত্ব ও অধিকার' উল্লেখ করতে হবে। এ ধরণের অংশীদারী

Dhaka University Institutional Repository

কারবার থেকে ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে কেউ কোন জিনিসগ্রহণ করতে পারে না; গ্রহণ করলে এর জন্যে তাকে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

শিরকাতুল মুফাওয়াদা-এর শর'য়ী বিধান

১. শিরকাতুল মুফাওয়াদার কারবারের মুলধন, লাভ লোকসান, ব্যবসায়ে শ্রম দান, দায়িত্ব, কর্তব্য, ঋণ পরিশোধ করবারের প্রকৃতি, পরিধি ইত্যাদি সকল বিষয়ে প্রত্যেক অংশীদারের সম অধিকার থাকবে।

২. দুই বা ততোধিক বালেগ, দায়িত্ব সচেতন, সুস্থ মস্তিষ্ক ও স্বাধীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (স্মমতি) এর ভিত্তিতে এ ধরণের করবারের চুক্তি সম্পাদিত হবে। মুসলমান ও কাফির; সাবালেগ ও নাবালেগের মধ্যে এ পদ্ধতি বৈধ নয়। কারো মতে অংশীদারদের ধর্ম এক হওয়া শর্ত নয়।

৩. এ পদ্ধতিতে মুলধন নগদ মুদ্রা অথবা অংশীদারী কারবারে ব্যবহৃত হয় এমন জিনিস (যেমন টাকা পয়সা, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি) হতে হবে। এ ধরণের মুলধন ব্যতীত অংশীদারী কারবারের চুক্তি সম্পাদন বৈধ হবে না।

৪. সকল অংশীদারী কারবারের প্রত্যেক অংশীদারের কারবারে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অধিকার আছে, কিন্তু প্রত্যেক অংশীদারের জন্য কারবারের সক্রিয় অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য নয়।

৫. এ পদ্ধতিতে কারবারের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে 'শিরকাতুল মুপাওয়াদা' (সম-অংশীদারিত্ব) শব্দটি অর্থাৎ ব্যবসায়িক সকল বিষয়ে দায় দায়িত্ব ও অধিকার সমান বলে উল্লেখ করতে হবে।

৬. এ ধরণের অংশীদারী কারবার থেকে ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে কেউ কোন জিনিস গ্রহণ করলে এর জন্যে তাকে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কারণ তা তার নিজের মাল হিসেবে গণ্য হবে।

৭. এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ একে অন্যের জামিন ও দায়ী বিধান অংশীদারগণের সবাইকে একই ধর্মের লোক হতে হবে।

৮. অংশীদারগণের দেয়া সমানুপাতিক মূলধন যৌথ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

৯. এ পদ্ধতিতে সকল অংশীদার সমান সমান হারে লাভ লোকসান বহন করবে। কেননা প্রত্যে অংশীদারেরই মূলধন সমান থাকে। তবে লাভ কমবেশি হারে নেয়ার শর্ত করতেপারবে এবং এ ক্ষেত্রে তা 'শিরকাতুল ইনান বিন নাফউন' (অর্থাৎ মুনাফায় অসম-অংশীদারিত্ব) হবে। কিন্তু লোকসান অবশ্যই মুলধনের অনুপাতে বহন করতেহবে। কমবেশি করে লোকসান বহন করার শর্ত করা যাবে না। কোন অংশীদার নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন মাসিক বা বাৎসরিক ৫০০০, ৭,০০০, ১০,০০০/- টাকা ইত্যঅদি)লাভ নেয়ার শর্ত করতে পারবে না এরূপ করা হলে তা সুদ হবে।

১০. কোন অংশীদার মাল বিক্রি করলে মালের ত্রুটি কারণে ক্রেতা তা যে কোন অংশীদারের নিকট ফেরত দিতে পারবে। আবার কোন অংশীদার মাল ক্রয় করলে মালের ত্রুটির কারণে তা যে কোন অংশীদার বিক্রেত কে ফেরত দিতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. কারবারে যদি সকল অংশীদারগণের মূলধন সমান সমান থাকে এবং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অংশীদারের শ্রম দেয়ার চুক্তি করা হয় তাহলে তারা মূলধনের জন্যে মুনাফার অংশ পাবে এবং শ্রমের জন্যে পৃথব পারিশ্রমিকও লাভ করবে।

১২. কারবারে সকল অংশীদারগণের মূলধন সমান সমান এ অবস্থায় কোন অংশীদারের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দেয়ার শর্ত করা হলে তা বৈধ হবে না।

১৩. অংশীদারগণ অংশীদারী কারবার বিলুপ্ত করলে কারবারের নগদ অর্থ এবং আদায়যোগ্য ঋণ প্রত্যেক অংশীদারগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। কারো ভাগে আদায়যোগ্য ঋণ এবং কারো ভাগে নগদঅর্থ দিলে তা শুদ্ধ হবে না।

১৪. এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ একে অন্যেল প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ একজন অংশীদারের উপর যদি দেনা ধার্য হয় কিংবা ব্যবসায়িক কোন বিষয়ে দাযী হয তাহলে এর জন্যে অন্য অংশীদারগণও জামিন বা দায়ী হবে।

১৫. শিরকাতুল মুফাওয়াদায় অংশীদারগণ যেমন পরস্পরের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে গণ্য হয়, তেমনি ব্যবসায়েল বিনিয়োগকৃত অর্থের ক্ষেত্রেও পরস্পরের আমানতদার এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ প্রত্যেকের নিকট আমানত হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত অর্থের কোনক্ষতিবা নষ্ট হলে এক অংশীদার অপর অংশীদারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্ত করা হলে তা অবৈধ হবে।

১৬. শিরকাতুল মুফাওয়াদা ব্যতীত সকল প্রকার অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ কেবল পরস্পরের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং একজন অপরজনের পক্ষে মাল ক্রয় বিক্রয়, বকেয়া আদায়, পাওনা পরিশোধ ইত্যাদি সকল কাজ করতে পারবে। কিন্তু শিরকাতুল মুফাওয়াদার ন্যায় প্রত্যেক অংশীদার পরস্পরের জামিনদার হিসেবে গণ্য হবে না।

১৭. কারবারের লোকসান প্রত্যেককেই নিজ নিজ মূলধনের অংশের অনুপাতে বহন করবে। তবে কোন অংশীদারের অসততা, অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে বিনিয়োগকৃত অর্থের ক্ষতি সাধিত হলে এবং প্রমাণিত হলে কিংবা স্বীকারোক্তি করলে সে দায়ী হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৮. কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার সম্পত্তি বন্ধক দিতে, কাউকে ঋণ, দিতে, স্বীয় ইচ্ছামত খরচ করতে, বিদেশ সফর করতে, সম্পদ ক্রয় বিক্রয় করতে, দোকান বা অফিস ভাড়া নিতে কিংবা অন্যদের সাথে অংশীদারী ব্যবসার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না। এরূপ করলে এবং ব্যবসায় কোন ক্ষতি বা লোকসান হলে এর জন্যে দায়ী হবে এবং অন্যান্য অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে।

১৯. অংশীদারগণের সংখ্যা দুইজন হলে এবং একজনের মৃত্যু হলে কিংবা পাগল হয়ে গেলে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু অংশীদারগণের সংখ্যা দুইজনের অধিক হলে একজন বা কম সংখ্যক অংশীদারের মৃত্যুতে বা পাগল হওয়াতে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে না।

Dhaka University Institutional Repository

শিরকাতুল ইনান বা অসম-অংশীদারী কারবার

অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের প্রত্যেকের মূলধন, লাভ, ব্যবসা পরিচালনায় শ্রমদান, দায়িত্ব,কর্তব্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে কিংবা যে কোন একটি বিষয়ে দায়দায়িত্ব ও অধিকার সমান সমান না হলে কম বেশি হলে অথবা মূলধন বা শ্রমদান এর যে কোন একটিতে অংশীদার হলে তাকে 'শিরকাতুল ইনান' (شركة العنان) অর্থাৎ অসম-অংশীদারী কারবার বলে।

এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ পরস্পরের কেবল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়, জামিনদার হিসেবে নয়। শিরকাতুল মুফাওয়াদা কারবারের চুক্তি সম্পাদন বৈধ হবার জন্যে যে ধরণের মূলধন হতে হয়, শিরকাতুল ইনান পদ্ধতিতে অংশীদারী চুক্তি বৈধ হবার জন্যেও সে ধরণের মূলধন হতে হয়। এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণের মূলধনে কম বেশি হওয়া, কিংবা মূলধন সমান রেখে মুনাফায় কম বেশি হওয়া কিংবা ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব কম বেশি হওয়া জায়েজ আছে। ব্যবসায়ের মূলধন, শ্রম, লাভ কিংবা দায়িত্বের যে কোন একটিতে অসম হলেই তা শিরকাতুল ইনান এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পদ্ধতিতে ব্যবসার লাভ পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। প্রত্যেকের মূলধন সমপরিমান হলেও এ পদ্ধতিতে লাভের হার কম বেশি করা যায়। প্রত্যেকের মূলধন সমপরিমাণ হলেও এ পদ্ধতিতে লাভের হার কম বেশি করা যায়। কিংবা ব্যবসার মূলধন, দায়িত্ব, কাজের দক্ষতা ইত্যাদির মান অনুযায়ী লাভের হার নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু ব্যবসায়ের কোন লোকসান হলে তা অবশ্যই মূলধনের অনুপাতে প্রত্যেক অংশীদারকে (যারা মূলধন দিয়েছে) বহন করতে হবে। এর ব্যতিক্রম শর্ত করা যাবে না।

শিরকাতুল ইনান-এর শরয়ী বিধান

১. দুই বা ততোধিক বালেগ, দায়িত্ব সচেতন ও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির পারস্পরিক ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি) এর ভিত্তিতে এ ধরণের কারবার চুক্তি সম্পাদিত হবে।

২. সকল অংশীদারগণকে একই ধর্মের অনুসারী হওয়া শর্ত নয়।

৩. এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ একে অন্যের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে।

জামিনদার হিসেবে নয়। অর্থাৎ একজন অংশীদার যদি ব্যবসায়িক কোন বিষয়ে ঋণী বা দায়ী হয় তাহলে অপর অংশীদার এর জন্যে দায়ী হবে না।

৪. কারবারের মূলধন, লাভ, শ্রম দান, ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি সকল বিষয়ে বা যে কোন একটি বিষয়ে অংশীদারগণের দায় দায়িত্ব কম বেশী হবে।

৫. এ পদ্ধতিতে কারবারের লাভ চুক্তির শর্তঅনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে (যেমন ৪০%, ৬০%, ৭০%, ৩০%, ৫০% : ৫০% ইত্যাদি হারে) অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ করা হবে। লাভের হার সমান সমান বা কম বেশী হতে পারে। তবে কোন অংশীদারই নির্ধাতির ভাবে (যেমন মাসিক বা বাৎসরিক ৩০০০, ৫০০০, ৬০০০ টাকা ইত্যাদি) মুনাফা পাবার শর্ত করতে পারবে না। এরূপ শর্ত করা হলে চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

৬. কারবারে কোন লোকসান হলে অংশীদারগণকে নিজ নিজ মুনাফনের অনুপাতে লোকসান বহন করতে হবে। মূলদনের অনুপাত অপেক্ষা কমবেশী করে লোকসান বহন করার শর্ত করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৭. এ পদ্ধতিতে কারবারের মূলধন শিরকাতুল মুফাওয়াদার ন্যায় নগদ মুদ্রা, অথবা অংশীদারী করবারে ব্যবহৃত হয় এমন জিনিস হতে হবে। প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ সমান সমান বা কমবেশী হলে পারবে।

৮. কোন অংশীদার নিজের বা পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় জিনিস অংশীদারী কারবার হতে গ্রহণ করলে তা তার নিজের মাল হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৯. অংশীদারী কারবারের মূলধন অংশীদারগণের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

১০. এরূপ অংশীদারী কারবারে কারবারের চুক্তি যদি ফাসিদ হয় তাহলে অর্জিত মুনাফা মূলধনের অনুপাতে বণ্টন করা হবে। এক্ষেত্রে মুনাফার হার কমবেশী শর্ত থাকলেও তা গ্রহণ যোগ্য হবে না। আর লোকসান হলে তাও মূলধনের অনুপাতে বহন করতে হবে।

১১. অংশীদারী কারবার পরিচালনার যাবতীয় খরচ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী অংশীদারী করবার হতে বহন করা হবে।

১২. অংশীদারগণ যে কোন বৈধ মালের ব্যবসা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। ব্যবসার মূলধন যে অংশীদারের হাতে থাকবে সে ব্যবসার মালামাল নগদ কিংবা বাকীতে ক্রয় করতে পারবে। কিন্তু যার হাতে মূলধন থাকবে না সে ব্যবসার কোন মাল ক্রয় করতে পারবে না। ক্রয় করলে তা নিজের জন্যে ক্রয় করেছে বলে গণ্য হবে।

১৩. অংশীদারগণ কোন অংশীদারকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দিলে সে স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবসা পরিচানা করতে পারবে। এতে ব্যবসার কোন লোকসান হলে সে নিজে এককভাবে দায়ী হবে না। লোকসান সকল অংশীদারকেই বহন করতে হবে। তবে পরিচালনাকারী অংশীদারের অসততা, অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে ব্যবসায় কোন ক্ষতি হলে সে দায়ী হবে এবং অন্যান্য অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৪. অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের কারবারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ব্যবসা পরিচানায় সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে কিন্তু কারবারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য না।

১৫. অংশীদারগণ তাদের কাজের প্রকৃতি, পরিমাণ, দায়িত্ব, ঝুঁকি ইত্যাদির ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে চুক্তি মোতাবেক ব্যবসা থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবে।

১৬. ব্যবসায়ে যদি সকল অংশীদারদের সমান মূলধন না থাকে কিন্তু মুনাফার সমান সমান হার লাভ করার চুক্তি করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে। এবং এ অবস্থায় যার মূলধনের পরিমাণ কত তার যদি বিনা পারিশ্রমিক শ্রম দেয়ার শর্ত করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। তবে যার মূলধন বেশী তার বিনা পারিশ্রমিকের শ্রম দেয়ার শর্ত করা হলে তা বৈধ হবে না। এবং এ অবস্থায় মূলধনের অনুপাতে মুনাফা বণ্টন করতে হবে।

১৭. অংশীদারগণ অংশীদারী কারবার বিলোপ করলে কারবারের নগদ অর্থ এবং আদায় যোগ্য ঋণ প্রত্যেক অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কারো ভাগে আদায়যোগ্য ঋণ এবং কারো ভাগে নগদ অর্থ দিলে তা শুদ্ধ হবে না।

১৮. অংশীদারগণের সংখ্যা দুই জন হলে এবং একজনের মৃত্যু হলে কিংবা পাগল হলে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু অংশীদারগণের সংখ্যা দুইজনের অধিক হলে এবং একজন বা কমসংখ্যক অংশীদারের মৃত্যু হলে বা পাগল হলে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. কারবারের মুনাফায় তিন ভাবে অংশীদারিত্ব লাভ করা যায়। মুলধন বিনিয়োগ করে, শ্রম বিনিয়োগ করে অথবা কারবার পরিচানার দায়িত্ব বহন করে। কেউ যদি কারবারে এ শর্তে অংশীদার নিয়োগ করে যে, মুনাফা অর্ধেক বা একটি নির্ধারিত হার তাকে দিবে আর বাকী অংশ নিজে রাখবে তাহলে তা বৈধ হবে।

২০. কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার সম্পদ বন্ধক দিতে, কাউকে ঋণ দিতে, স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবসা পরিচালনা করতে, বিদেশ সফর করতে কিংবা অন্যদের সাথে অংশীদারী ব্যবসার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না। অনুমতি দিলেই কেবল পারবে।

২১. অংশীদারী কারবারে চুক্তি পত্রের শর্তঅনুযায়ী অংশীদার পরিচালকগণ কারবার পরিচালনা করতে করতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় কারবারের কোন লোকসান বা ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শিরকাতুস সানাই বা পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার

একই পেশার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পেশাভিত্তিক কাজ করে লাভ-লোকসানে অংশীদার হবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে 'শরকাতুস সানাই' (شركة الصنائع) বা পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার বলে। যেমন দুই বা ততোধিক রাজমিস্ত্রী এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হল যে, তারা উভয়ে কাজ সংগ্রহ করে কাজ করবে এবং মজুরী সকলে নির্ধারিত হারে ভাগ করে নিবে। এরূপ চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করা কে বলা হয় 'শিরকাতুস সানাই'। এ পদ্ধতিতে শিরকাতুল আ'মাল (شركة الاعمال) অর্থঅৎ শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবার এবং শিরকাতুল আবদান (شركة الابدان) অর্থাৎ শারিরীক শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবারও বলা হয়।

শর'য়ী বিধান

১. চুক্তিবদ্ধ অংশীদারদের কেউ কোন কাজ সংগ্রহ করলে তা করে দেয়া তার এবং তার অংশীদারদের সকলের উপর ওয়াজিব (যদি কারো কোন শর'য়ী ওযর বা ভিন্ন চুক্তি না থাকে)

২. এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ পরস্পরের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে।

৩. অর্জিত মুনাফা বা পারিশ্রমিক চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

৪. প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফা বা পারিশ্রমিক সমান সমান বা কমবেশী হতে পারবে। পারিশ্রমিক কাজের পরিমাণ, প্রকৃতি, ঝুঁকি, এবং দায়িত্বের মাত্রার অনুপাতে নির্ধারণ করা হবে এবং তা চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করা হবে।

৫. অংশীদারগণের প্রত্যেকে সমপরিমাণ কাজ করবে না কিন্তু মুনাফা সমপরিমাণ লাভ করবে এরূপ চুক্তি করা বৈধ।

৬. অংশীদারগণ চুক্তি মোতাবেক ব্যক্তিগত ভাবে অথবা সমষ্টিগত ভাবে নিয়োগকর্তার নিকট সংশ্লিষ্ট কাজের জন্যে দায়বদ্ধ থাকবে। অংশীদারদের কাজের দায় দায়িত্ব সমানও হতে পারে, অসমানও হতে পারে।

৭. অংশীদারগণের প্রত্যেকে চুক্তির শর্তঅনুযায়ী ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সমষ্টিগত ভাবে নিয়োগ কর্তার নিকট মজুরী দাবী করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. চুক্তি মোতাবেক নিয়োগকর্তা যে কোন অংশীদারকে মজুরী প্রদান করে বরখাস্ত করতে পারবে।

৯. নিয়োগকর্তা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হলে কিংবা কোন অংশীদার কর্তৃক মাল নষ্ট হলে এর জন্যে চুক্তিবদ্ধ সকল অংশীদার নিজ নিজ দায়িত্বের অনুপাতে দায়ী হবে।

শিরকাতুল ওয়াজুহ বা সুনামভিত্তিক অংশীদারী কারবার

অংশীদারী কারবারে দুই বা ততোধিক অংশীদার যদি এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা নগদ পুঁজি বিনিয়োগ করবে না বা করতে পারবে না; বরং পুঁজি ব্যতীত স্বীয় সুনাম, পরিচিতি, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে বাকী পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে নগদ বিক্রয় করবে এবং এতে যে লাভ লোকসান হবে তা প্রত্যেকে পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নিবে তাহলে এ ধরনের চুক্তিকে 'শিরকাতুল ওয়াজুহ' (شركة الوجوه) বলা হয়। প্রত্যেক অংশীদার ক্রীত মালে চুক্তি মোতাবেক নিজ নিজ অংশ অনুপাতে মালের মূল্য এবং লোকসানেও অংশীদার হবে। চাই তারা সবাই একত্রে মিলে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করুক বা একজনে ক্রয় করুক। লোকসানের ব্যাপারে চুক্তিপত্রে নিজ নিজ অংশ অনুপাতের ব্যতিক্রম কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না। অর্থাৎ মুনাফার হার চুক্তিপত্রে সমান সমান বা কম-বেশী করা যাবে কিন্তু লোকসান হলে প্রত্যেকেই স্বীয় মূলধন দায়িত্ব ও চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নিজ নিজ অংশ অনুপাতে বহন করবে।

শর'য়ী বিধান

১. এ পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয় বিক্রয়ে অংশীদারদের দায়দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহনের অনুপাতে মুনাফার আর নির্ধারিত হবে।

২. প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফার হার চুক্তিপত্রে সমান সমান বা কম বেশী করে নির্ধারণ করা যাবে এবং চুক্তি মোতাবেক মুনাফা বণ্টন করা হবে।

৩. লোকসানের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশ অনুপাতে লোকসান বহন করবে। মাল একজনে ক্রয় করুক বা সবাই একত্রে মিলে ক্রয় করুক। এর বিপরীত শর্ত করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. যে মাল ক্রয় করা হয়েছে সে মালে অংশীদারগণ চুক্তি মোতাবেক অংশীদারদের অংশ অনুপাতে মালের মূল্যের জন্যে দায়ী হবে।

৫. মালের ক্রয় বিক্রয়, প্রকৃতি, মুনাফা বণ্টন, লোকসান বহন ইত্যাদি যাবতীয় কিছু চুক্তি মোতাবেক সম্পন্ন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইজারা বা ভাড়া

ইজারা (اجارة) শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাড়া দেয়া, কেরায়া দেয়া, মজুরিতে দেয়া, ইজারা দেয়া ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় মুনাফা অর্জনের জন্যে কিংবা কোন কিছুর বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি স্বত্ত্ব ত্যাগ ব্যতীত নির্ধারিত সময়ের জন্যে কাউকে ব্যবহার করার ক্ষমতা কিংবা উপকার লাভের মালিকানা হস্তান্তর করাকে 'ইজারা' (اجارة) বা ভাড়া বলে। যেমন - বাসা, বাড়ী, জায়গা জমি, যানবাহন, (বাস, ট্রাক, রিক্সা, অটোরিক্সা, নৌকা) ইত্যাদি নির্ধারিত সময় বা নির্ধারিত কাজের জন্যে নির্ধারিত মুনাফার ভিত্তিতে ইজারা (Lease) বা (Rent) ভাড়া দেয়া। ইজারা ইসলামী শরীয়ায় বৈধ। আরবীতে ইজারাদাতাকে বলা হয় موجر (মুজির) এবং ইজারা গ্রহীতাকে বলা হয় مستجر (মুস্তাজির)।

ঘর বাড়ী, অফিস, দোকান ইত্যাদির উজরতকে (ভাড়া/ পারিশ্রমিক) সাধারণ, ভাড়া বা কেরায়া বলে। মানুষের উজরতকে সাধারণত, মজুরী বা পারিশ্রমিক বলে। একটু উন্নত হলে বলে বেতন। আর জমিনের উজরতকে সাধারণ, বলা হয় ইজরা। এগুলো সবই হচ্ছে নির্ধারিত কোন জিনিস বা অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের বা কাজের জন্য ব্যবহার ক্ষমতা হস্তান্তর করা। আরবী ভাষায় এ ধরনের সমস্ত কারবারকে 'ইজারা' বলে। যিনি ইজারা বা ভাড়া দেন অর্থাৎ যিনি সম্পদের মালিক তাকে বলা হয় ইজারাদাতা (Leassor) এবং যার নিকট ইজারা বা ভাড়া দেয়া হয় তাকে বলা হয় ইজারাগ্রহীতা বা ইজারাদার (Leassee) বা ভাড়াটিয়া।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) বলেন, সাহাবী সাবেত ইবনে যাহ্হাক (রা.) মনে করেন যে :

ان رسول الله صلى عليه وسلم امر بالمواجرة وقال لا باس بها-

রাসূলুল্লাহ (স.) ইজারার আদেশ দিয়েছেন। সাবেত (রা.) বলেন, ইজারাতে কোন আপত্তি নেই।[১২]

এ পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে ইজারা বা ভাড়া নির্ধারণ করা যায়। যেমন :

ক. সময়ের উপর ভিত্তি করে, কোন জিনিস যদি নির্ধারিত সময়ের জন্যে ইজারা বা ভাড়া দেয়া হয় তাহলে সময়েল ভিত্তিতে ঐ জিনিসের উপর ভাড়া নির্ধারণ করা যায়।

খ. কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে : যে জিনিস ইজারা বা ভাড়া দেয়া হবে তা কিধরনের কাজে ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে ভাড়া বা মুনাফা নির্ধারণ করা যায়।

গ. স্থানের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে : ভাড়াকৃত জিনিস যদি বহু দূরে নেয়া হয় তাহলে রাস্তার দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ভাড়া নির্ধারণ হতে পারে।

ইজারা বা ভাড়া-এর শর'য়ী বিধান

১. ইজারাদাতা ও ইজারা গ্রহীতার পারস্পরিক ইজার (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি) দ্বারা ইজারা বা ভাড়া চুক্তি সম্পাদিত হবে।

২. ভাড়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে, নতুবা ইজারা শুদ্ধ হবে না।

৩. যে মাল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ, ভাড়া নির্ধারণেও সে ধরনের মাল হতে হবে।

---

১২. মিশকাত।

Dhaka University Institutional Repository

৪. যে কাজ মুবাহ্ বা শরীয়া সম্মত, কাজ সম্পন্ন করতে পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে, প্রতিনিধি নিযুক্ত করার সুযোগ আছে এরূপ কাজের ইজারা বৈধ।

৫. ইজারা বা ভাড়া চুক্তিতে ইজারার/ ভাড়ার সময়সীমা, কাজের ধরণ, প্রকৃতি, ব্যবহারের পরিধি ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. ইজারা বা ভাড়ার মাল নগদ মুদ্রা হতে পারবে না ; বরং এমন মাল হতে হবে যার ক্রয় বিক্রয় বৈধ।

৭. ইজারা/ ভাড়া চুক্তি সম্পাদিত হলেই ভাড়া আদায় করা যাবে না। হয় চুক্তিতেই অগ্রিম ভাড়া দেয়ার শর্ত থাকবে অথবা ভাড়াটিয়া অগ্রিম ভাড়া দিয়ে দিবে অথবা চুক্তিবদ্ধ কাজ সমাধা হতে হবে অথবা ভাড়া দেয়ার সময়সীমা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে এবং চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ভাড়া আদায় করা হবে।

৮. যে সকল শর্তের কারণে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায় সে সকল শর্ত আরোপে ইজারা/ ভাড়া চুক্তিরও বাতিল হয়ে যাবে।

৯. ইজারাদাতা ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে কারোর মৃত্যু হলে ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

১০. চুক্তি সম্পাদনের পর কিন্তু ভাড়াকৃত জিনিস ব্যবহারের পূর্বেই উভয় পক্ষের চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে।

১১. ইজারা/ ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের পর ভাড়াটিয়া যদি ভাড়াকৃত জিনিস ব্যবহার না করে কিংবা চুক্তিও বাতিল না করে তাহলে ভাড়াটিয়া চুক্তি মোতাবেক ভাড়া দিতে বাধ্য থাকবে।

১২. ভাড়াকৃত জিনিস চুরি হলে, নষ্ট হলে কিংবা ক্ষতিসাধিত হলে এর কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না। অবশ্য তা যদি ভাড়াটিয়ার অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে হয়ে থাকে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়।

নিলামে ক্রয় বিক্রয়

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشترى هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذتهما بدرهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه-

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) (উটের পিঠে বিছানোর) একটি চট (মোটা কাপড়) এবং একটি কাঠের পাত্র বিক্রয়ের ইচ্ছা করেন এবং তিনি বলরেন, কে এই চট ও পাত্রটি ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এ দু'টি এক দিরহামে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। নবী (স.) বললেন, কে এক দিরহামের বেশী দিবে? কে এক দিরহামের বেশী দিবে? এক ব্যক্তি তাঁকে দুই দিরহাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে জিনিস দু'টি ক্রয় করল।[১৩]

উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় নির্ধারিত যে কোন পণ্য সামগ্রী নিলামে অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রি করা যায় এবং মুনাফা অর্জন করা যায়।

---

১৩. সহীহ তিরমিযী।

Dhaka University Institutional Repository

নিলামে ক্রয়-বিক্রয়ের শর'য়ী বিধান

১. বিক্রিতব্য পণ্য সামগ্রী বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে এবং তা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে।

২. বিক্রিতব্য পণ্য সামগ্রীর ক্রয় মূল্যে মুদ্রার অংকে প্রস্তাব করলে তা কোন দেশী মুদ্রা তার উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. ক্রেতা ও বিক্রেতার ইজাব ও কবুল দ্বারা নিলাম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং উজাব ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে।

৪. যে ব্যক্তি অধিক মূল্য প্রস্তাব করবে সে-ই পণ্য ক্রয়ের অধিক হকদার বিবেচিত হবে।

৫. ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য সামগ্রী অবশ্যই ইসলামী শরীয়ায় হালাল গণ্য হতে হবে।

ইসতিসনা বা শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন

ইসতিসনা (استصناع) শব্দটি সানউন (صنع) শব্দ হতে উৎপত্তি। সানউন অর্থ হচ্ছে তৈরী করা, নির্মাণ করা, উৎপাদন করা, প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করে দেয়ার জন্য কোন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে 'ইসতিসনা' (استصناع) বলে। যে ব্যক্তি নির্মাণ বা উৎপাদন করে তাকে বলা হয় 'সানি' (صانع) অর্থাৎ শ্রমিক বা কারিগর। যে ব্যক্তি নির্মাণ বা উৎপাদন করায় তাকে বলা হয় 'মুসতাসনি' (مستصنع)। আর যে জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করা হয় তাকে বলে 'মাসনু' (مصنوع)। ইসলামের শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। শুধুমাত্র বৈধই নয় বরং ইসলাম দিয়েছে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

كنت ارعى على قراريط لاهل مكة-

আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম। (কিরাত হচ্ছে এক দিরহামের বার ভাগের এক ভাগ, দিরহাম চার আনার সামান্য বেশী)।[১৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। ১. যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুত দিয়ে তা ভঙ্গ করেছে; ২. যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে উহার মূল্য গ্রহণ করেছে এবং ৩. যে ব্যক্তি মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করে তার নিকট হতে পূর্ণ কাজ আদায় করেছে, অথচ তার মজুরি আদায় করেনি।[১৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

শ্রমিককে তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দাও।[১৬]

এভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা দিয়েছেন এবং শ্রমিকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।

---

১৪. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

১৫. সহীহ বুখারী।

১৬. ইবনে মাযাহ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসতিসনার শর'য়ী বিধান

১. কোন ব্যক্তি শ্রমিক বা কারিগরকে কোন নির্ধারিত জিনিস নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্মাণ বা উৎপাদন করে দেয়ার প্রস্তাব করলে এবং শ্রমিক সে প্রস্তাব সমর্থন করলে শ্রমের ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে।

২. নির্মিত বা উৎপাদিত জিনিসের নাম, পরিমাণ, গুণাগুণ, প্রকৃতি, নির্মাণের সময়সীমা ইত্যাদি চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সানি ও মুসতাসনির মধ্যে কোন বিরোধ দেখা না দেয়।

৩. যে সব জিনিস আদেশের মাধ্যমে নির্মাণ ও উৎপাদন করার রীতি নীতি প্রচলিত আছে, সে সব জিনিস নির্মাণ ও প্রস্তুত করে দেয়ার আদেশ প্রদান করা হলে তা চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

৪. যে সব জিনিস আদেশের মাধ্যমে নির্মাণ বা উৎপাদন করার রীতিনীতি নেই, সে সব জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করার আদেশ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে এবং চুক্তির সময় সীমা অবশ্য উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. চুক্তি বা আদেশের মাধ্যমে যে চুক্তি হয় সে ক্ষেত্রে অগ্রিম মূল্য প্রদানের কোন বাধ্য বাধকতা নেই। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধাতির হবে। প্রস্তুতকৃত মালের মূল্য বা মজুরী চুক্তি মোতাবেক অগ্রিম প্রদান করা যায়, কিংবা মালামাল সরবরাহের পরেও পরিশোধ করা যায়।

৬. চুক্তি বা আদেশের মাধ্যমে যে চুক্তি হয় সে ক্ষেত্রে অগ্রিম মূল্য প্রদানের কোন বাধ্য বাধকতা নেই। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারিত হবে। প্রস্তুতকৃত মালের মূল্য বা মজুরী চুক্তি মোতাবেক অগ্রিম প্রদান করা যায়, কিংবা মালামাল সরবরাহের পরেও পরিশোধ করা যায়।

৭. চুক্তি সম্পাদনের পর কোন পক্ষই একক ভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। উভয় পক্ষের সম্মতিতে পারবে।

৮. নির্মিত বা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী চুক্তি বা আদেশ মোতাবেক না হলে ক্রেতা অর্থাৎ আদেশদাতার চুক্তি বহাল রাখার বা বাতিল করার অধিকার থাকবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আল ওয়াদিয়া

আল ওয়াদিয়া (الوديعة) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আমানত, কোন কিছু রাখা বা ছেড়ে দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ব্যবহার করার অনুমতি দানসহ হেফাজতের জন্যে কোন জিনিস কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট আমানত রাখা বা গচ্ছিত রাখা। গচ্ছিত জিনিসের প্রকৃত মালিকানা মালিকেরই থাকে। আর যার নিকট জিনিসটি গচ্ছিত বা আমানত রাখা হয় তিনি হলেন হেফাজতকারী বা আমানতদার এবং জিনিসটি তিনি মৌলিকত্বে কোন পরিবর্তন না করে মালিকের নিকট হতে সাময়িকভাবে ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করেন। এক্ষত্রে আমানতের জিনিস বা অর্থ আমানতদারীর নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং ব্যবহার করার অনুমতি দানসহ স্বেচ্ছায় কারো নিকট কোন কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখাকে বলা হয় 'আল ওয়াদিয়া'।

আল ওয়াদিয়া ও আমানতের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আল ওয়াদিয়ায় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত। কিছু আমানতে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত নয়। ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকতেও পারে, আবার নাও

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারে। তাই প্রত্যেক ওয়াদিয়াকে আমানত বলা যায়। কারণ ওয়াদিয়া শব্দের অর্থ আমানত শব্দের ভিতর রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক আমানতকে ওয়াদিয়া বলা যায় না। পবিত্র কুরআনে আমানত ও ওয়াদিয়ার জন্যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'আমানত'ই ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলামের আমানতদারীর ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

ان الله يامركم ان تودوا الامنت الى اهلها-

নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও।[১৭]

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে :

يايها الذين امنوا لا تخونو الله والرسول وتخونوا امنتكم وانتم تعلمون-

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না; আর খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।[১৮]

কারো দায়িত্বে যদি কোন আমানত থাকে তাহলে এর হেফাজত করা এবং প্রাপককে তা যথাযথভাবে পৌছে দেয়া উচিত। আমানতদারীর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন :

لا ايمان لمن لا امانة له-

যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে :

রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন মুনাফিকদের লক্ষণ বলতে গিয়ে বলেছিলেন– 'যার মধ্যে চারটি লক্ষণ রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। আর তা হচ্ছে ১. তার নিকট কোন আমানত রাখলে সে তা খেয়ানত করে, ২. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪. সে যখন কারো সাথে ঝগড়া করে গালি গালাজ করে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

والذين هم لا منتهم وعهدهم رعون- والذين هم بشهدتهم قائمون- والذين هم على صلاتهم يحافظون- اولئك فى جنت مكرمون-

যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যারা তাদের নিজনিজ সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।[১৯]

ইসলামী ব্যাংক সমূহ আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে চলতি হিসাব খোলার মাধ্যমে জনগণের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করে পুঁজি গঠন করে থাকে।

আল ওয়াদিয়ার শর'য়ী বিধান

১. আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থাৎ ব্যবহার করার অনুমতি লাভসহ রক্ষিত মাল বা অর্থ গ্রহীতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

---

১৭. সূরা আন নিসা : ৫৮।

১৮. সূরা আনফাল : ২৭।

১৯. সূরা মা'আরিজ : ৩২-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবহার করার অনুমতি লাভসহ রক্ষিত আমানত পূর্ণভাবে হিফাজত করার পরও চুরি হলে কিংবা নষ্ট হলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ ঋণ সর্বাবস্থায় পরিশোধ যোগ্য।

৩. (আল ওয়াদিয়া ব্যতীত) আমানতের মাল পূর্ণভাবে হিফাজত করার পরও যদি তা নষ্ট বা চুরি হয়, তাহলে এর জন্য আমানতদারীকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হয় না। আমানতদারী কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না। তবে কেউ যদি বিনা শর্তে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয় তবে তা জায়েজ আছে। তবে আমানতদারের অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অযত্নের কারণে আমানতের মাল নষ্ট বা চুরি হলে আমানতদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

৪. (আল ওয়াদিয়া ব্যতীত) আমানতদার যদি আমানতকারী অনুমতি নিয়ে আমানতের মাল ২য় ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখে তাহলে তা বৈধ হবে। এক্ষেত্রে ২য় ব্যক্তির নিকট যদি মাল নষ্ট বা চুরি হয় তাহলে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে আমানতকারীর বিনা অনুমতিতে ২য় ব্যক্তির নিকট মাল গচ্ছিত রাখলে এবং তা নষ্ট বা চুরি হলে আমানতকারীকে আমানতদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

৫. আমানতকারী আল ওয়াদিয়াহ কিংবা আমানতের মাল ফেরত চাইলে আমানতদার তৎক্ষনাৎ তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে (যদি শর'য়ী কোন ওযর না থাকে)। ফেরত দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি ফেরত দেয়া না হয় এবং এরপর মাল নষ্ট হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৬. আমানতের মাল জমা দেয়া ও ফেরত নেয়ার জন্যে যানবাহন, মজুরী ও আনুষঙ্গিক খরচ আমানতকারী বহন করবে কিন্তু ঋণ ফেরতক দেয়ার আনুষঙ্গিক খরচ ঋণ গ্রহীতা বহন করবে।

৭. ব্যবহার করার অনুমতি লাভসহ রক্ষিত অর্থ বা মাল ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করলে অর্জিত মুনাফার অংশ আমানতকারীকে দিতে হবে না এবং দেয়ার শর্তও করা যাবে না। যদি শর্ত মোতাবেক কিছু দেয়া হয় তাহলে তা সুদ হবে। কারণ শর্ত মোতাবেক ঋণের অতিরিক্ত কিছু দেয়াই সুদ। তবে বিনা শর্তে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছু দিয়ে দেয় তাহলে তা সুদ হবে না।

আল ওয়াদিয়া ও আমানতের মধ্যে পার্থক্য

আল ওয়াদিয়া	আমানত
১. ব্যবহার করার অনুমতি লাভসহ কেউ কোন অর্থ বা জিনিস অন্যের নিকট হতে জমা রাখলে তাকে বলা হয় 'আল ওয়াদিয়া'।	১. ব্যবহার করার অনুমতি লাভ ব্যতীত কেবল হিফাজতের জন্যে কেউ কোন মাল বা জিনিস অন্যের নিকট হতে জমা রাখলে তাকে বলা হয় 'আমানত'।
২. আল ওয়াদিয়ায় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত। প্রত্যেক ওয়াদিয়াকে আমানত বলা যায়। কারণ ওয়াদিয়া শব্দের অর্থ আমানত শব্দের ভিতরই রয়েছে।	৩. আমানতের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত নয়। ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। প্রত্যেক আমানতকে ওয়াদিয়া বলা যায় না। কারণ আমানত শব্দটি ব্যাপকার্থক শব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবহার করার অনুমতি সহ আমানত রাখা হলে তা আমানতদারের নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়।	৪. আমানতের মাল সর্বাবস্থায় আমানতদারের নিকট আমানত হিসেবে গণ্য হয়।
৪. ব্যবহার কররা অনুমতি লাভসহ কোন অর্থ বা জিনিস জমা রাখলে এবং পরে তা নষ্ট বা চুরি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ ঋণ সর্বাবস্থায় পরিশোধ যোগ্য।	৫. আমানতের জিনিস চুরি বা নষ্ট হলে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী (ওয়াজীব) নয়। তবে বিনা শর্তে কেউ যদি কোন ক্ষতিপূরণ স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয় তাহলে তা বৈধ হবে।
৫. আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থাৎ ব্যবহার করার অনুমতির ভিত্তিতে জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ করে কোন মুনাফা অর্জন করলে মুনাফার কোন অংশ জমাকারীকে দিতে হয় না। কারণ ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত মোতাবেক অতিরিক্ত কিছু দেয়া হলে তা সুদ হবে।	৬. আমানতকারীর অনুমতি ব্যতীত আমানতের কোন প্রকার ব্যবহার করা যায় না; বরং যা আমানত রাখবে হুবহু তাই ফেরত দিতে হবে। এছাড়া আমানতকারীর অনুমতিতে ব্যবহার করা হলে তা আর আমানত হিসেবে থাকে না; বরং ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

ঋণ দান সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের উপদেশ

১. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্যে ঋণের আদান প্রাদন কর তখন উহা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায় সংগত ভাবে লিখে দেয়।[২০]

২. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল।[২১]

৩. এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা অর্থাৎ উত্তম ঋণ দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।[২২]

৪. যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয় বিধেয়। আর যদি তোমরা মাফ করে দাও তবে তা হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।[২৩]

৫. হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামত দিবসের দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তি দেন, সে যেন অক্ষম ঋণীর সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ কর্তন করে দেয়।[২৪]

---

২০. সূরা বাকারা : ২৮২।
২১. সূরা তাগাবুন : ১৭।
২২. সূরা হাদীদ : ১১।
২৩. সূরা বাকারা : ২৮০।
২৪. সহীহ মুসলিম।

Dhaka University Institutional Repository

৬. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তির অন্য কারো উপর প্রাপ্য থাকে, সে যদি ঋণ গ্রহীতাকে কিছু দিনের জন্যে সময় দেয় তাহলে সে প্রতি দিনের বিনিময়ে সাদাকাহ বা দান খয়রাত করার সওয়াব লাভ করবে।[২৫]

ঋণ অনাদায়ীদের প্রতি বিশ্বনবী (সা.)-এর হুশিয়ারী

১. হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর পথে শহীদ হই, উদ্দেশ্য থাকে নেকী লাভ করা এবং পশ্চাদ পদ না হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হই, তবে আল্লাহ আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন কি? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর ঐ ব্যক্তি চলে যেতে লাগলে পিছন হতে রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে ডেকে বললেন, (শোন) কিন্তু ঋণ মাফ হবে না। জিব্রাঈল (আ.) এখন এসে আমাকে এ কথাই বলে গেলেন।[২৬]

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, শহীদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করা হয় কিন্তু ঋণ মাফ করা হয় না।[২৭]

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে বক্তি পরিশোধ করার নিয়তে ঋণ গ্রহণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ঋণ পরিশোধের সামর্থ দান করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে ঋণদাতার মাল আত্মসাৎ করার নিয়তে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন।[২৮]

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে কি? যদি বলা হত যে, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় নিজে ঐ জানাযায় শরীক না হয়ে অন্যদেরকে বলে দিতেন তোমরা তোমাদের সাথীরা জানাযা পড়ে নাও।[২৯]

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি (মৃত্যুর পর তার মর্যাদা লাভে) বাধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ঋণের দ্বারা, যে যাবত না তার পক্ষ হতে পরিশোধ করে দেয়া হয়।[৩০]

৬. হযরত শারীদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, (ঋণ পরিশোধে) সক্ষম ব্যক্তি টালবাহানা করলে তাকে লজ্জিত করা এবং শাস্তি প্রদান করা জায়েজ হয়।[৩১]

৭. হযরত সাওবান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু হবে এ অবস্থায় যে, সে অহঙ্কার হতে মুক্ত, খেয়ানত হতে মুক্ত এবং ঋণ হতে মুক্ত, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩২]

---

২৫. মিশকাত।
২৬. সহীহ মুসলিম।
২৭. সহীহ মুসলিম।
২৮. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।
২৯. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।
৩০. মিশকাত।
৩১. আবূ দাউদ ও নাসায়ী।
৩২. সহীহ তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ সে আল্লাহ পাকের কসম, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, আবার শহীদ হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, আবার শহীদ হয়েছে অথচ তার উপর ঋণ ছিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে যাবৎ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।[৩৩]

৯. হযরত সুহাইবুল খাইর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নিয়তে ঋণ গ্রহণ করল যে, সে আর ঋণদাতাকে ফেরত দিবে না। সে আল্লাহ পাকের দরবারে চোর হিসেবে সাক্ষাত লাভ করবে।[৩৪]

১০. হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষ যখন ঋণগ্রস্থ হয় তখন কথা বলতে গিয়ে সে মিথ্যা বলে এবং প্রতিজ্ঞা করলে তা ভঙ্গ করে।[৩৫]

১১. হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া মহাপাপগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় পাপ হল ঋণগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করা এবং তা পরিশোধ করার উপযুক্ত সম্পত্তি রেখে না যাওয়া।[৩৬]

১২. হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের কাউকে ঋণ দেয়, ঋণী ব্যক্তি যেন তাকে উপহার না দেয়।[৩৭]

১৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ ঋণ দেয় এবং ঋণী ব্যক্তি যদি ঋণদাতাকে কোন উপহার দেয় অথবা কোন প্রাণীর উপর আরোহন করার, তা গ্রহণ করো না এবং তার উপর আরোহন করো না। যদি এর পূর্বে এমন হয়ে থাকে তাতে দোষ নেই।[৩৮]

আল কুরআন ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে হারাম ঘোষণা করে মানুষকে এ নির্দেশনাই প্রদান করছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে একই নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। উপরোল্লিখিত বিনিয়োগের শরয়ী বিধানের আলোচনা এ চিত্রই তুলে ধরেছে। এ বিধান অনুসরণ করে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করলে সর্বক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন সম্ভব।

---

৩৩. মিশকাত।

৩৪. ইবনে মাযাহ।

৩৫. সহীহ বুখারী।

৩৬. আবু দাউদ।

৩৭. সহীহ বুখারী।

৩৮. ইবনে মাযাহ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : ছয়
ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগের গুরুত্ব

ইসলামী ব্যাংক, ডিপোজিট হিসাবে গৃহীত অর্থ সাধারণত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ ডিপোজিটরদেরকে এবং বাকী অংশ ব্যাংকের মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু ব্যাংক যদি বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, তবে ডিপোজিটরদের পাশাপাশি নিজেও মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়। মুনাফা থেকে বঞ্চিত ডিপোজিটরগণ যদি তাদের অর্থ তুলে নেন, তবে ব্যাংক অর্থাভাবে বিনিয়োগের ক্ষমতা হারায় এবং পরিণতিতে তার অস্তিত্বের প্রশ্ন দেখা দেয়। কাজেই বিনিয়োগ হচ্ছে ব্যাংকের প্রাণশক্তি। ভালো বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংক তার মুনাফা বৃদ্ধি করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। ব্যাংক সাধারণত তার ডিপোজিটের ৭০-৭৫% বিনিয়োগ করে থাকে। মোট জমার ৪% ক্যাশ আকারে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এবং ১৬% অন্যান্য সিকিউরিটির আকারে জমা রাখার বাধ্যবাধকতা আছে। দৈনন্দিন লেন-দেনের জন্য অবশিষ্ট অর্থ হাতে রাখতে হয়।[১]

বিনিয়োগ ও ঋণের পার্থক্য

ঋণ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Loan. কিন্তু বিনিয়োগ শব্দের প্রতিশব্দ হল Investment. ঋণ ও বিনিয়োগকে কেউ কেউ একইরূপে মনে করে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় ঋণকে قرض (ক্বারদ) বলে। ঋণ বা Loan হল এমন এক লেনদেন যাতে শর্ত থাকে যে, যে পরিমাণ অর্থ বা যে দ্রব্য বা যে বস্তুটি ঋণ বা ক্বারদ দেয়া হবে, সে পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য বা ঐ বস্তুটিই ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে শর্ত মোতাবেক কোন এক সময় ফেরত দিবে।

এ জাতীয় ঋণকে ইসলাম 'ক্বারদে হাসানা' বা কল্যাণকর ঋণ বলেছে। কাজেই ঋণ কোন খারাপ জিনিস নয় বা নিষিদ্ধ লেনদেনও নয়। কিন্তু এ কল্যাণকর ঋণকেই প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদ যুক্ত করে অকল্যাণকর ও হারাম ঋণে পরিণত করেছে। ঋণের লেনদেনে আসলের উপর যদি 'অতিরিক্ত কিছু' ধার্য করা হয় তবে ঐ 'অতিরিক্ত কিছু'কেই সুদ বলে। সেই 'অতিরিক্ত কিছু' অর্থও হতে পারে, দ্রব্যও হতে পারে, সেবাও হতে পারে। কাজেই ঋণের ক্ষেত্রে অর্থ, দ্রব্য বা বস্তু অপরিবর্তিত অবস্থায় ঋণদাতার কাছে ফেরত আসে। ঋণের ক্ষেত্রে অর্থ থেকে দ্রব্যে বা দ্রব্য থেকে অর্থে রূপান্তরের কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই আমরা বলতে পারি, সমপরিমাণ ফেরত দেয়ার শর্তে কাউকে নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন কিছু ব্যবহার করতে দেয়ার নাম হচ্ছে ঋণ। ঋণের উপর শর্ত হিসাবে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলে তাকে সুদ বলা হয়। ঋণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত দ্রব্য অথবা অর্থ পরিবর্তিত না হয়েই ঋণদাতার কাছে ফেরত আসতে পারে। প্রদত্ত ঋণের অর্থ কোন দ্রব্য অথবা দ্রব্য কোন অর্থে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে ঋণদাতার কোন সম্পর্ক থাকে না। ঋণদাতা কেবল সুদের আশায়ই ঋণ দিয়ে থাকেন। ঋণের অর্থের রূপান্তরিত ব্যবহার, ঐ ব্যবহার থেকে লাভ বা ক্ষতির সাথে তিনি জড়িত নন। কাজেই ঋণের অর্থের ব্যবহার সম্পর্কিত কোন ঝুঁকিও তিনি বহন করেন না। ঋণের অর্থ ব্যবহার করার জন্য ঋণদাতাকে কোন শ্রম ও মেধা ব্যয় করতে হয় না। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্রব্যে এবং বিনিয়োগকৃত দ্রব্য

---

১. এ.এম.এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : হেলেনা পারভীন, ২য় সং, ২০০৪, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থে রূপান্তরিত হয়ে বিনিয়োগদাতার কাছে লাভ বা ক্ষতিসহ ফেরত আসে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ বা দ্রব্যের রূপান্তরের সাথে বিনিয়োগদাতা জড়িত বিধায় তাকে রূপান্তরের মাধ্যমে লাভ বা ক্ষতির ঝুঁকিও বহন করতে হয়। লাভের আশায় তাকে বিনিয়োগের সঠিক ব্যবহারের জন্য মেধা ও শ্রম ব্যয় করতে হয়।[২]

ঋণ যে কোন ক্ষেত্রে দেয়া যায় কিন্তু বিনিয়োগ সাধারণত উৎপাদন ও ব্যবসায়িক খাতে হয়ে থাকে। ঋণদাতা ঋণের বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে, কিন্তু বিনিয়োগদাতা বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা আশা করেন তবে কখনও কখনও ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কাজেই অর্থ বা দ্রব্যের রূপান্তর এবং ঐ রূপান্তরের সাথে জড়িত ঝুঁকি বহনের দায়িত্বের বিচারে ঋণ ও বিনিয়োগ কখনও এক হতে পারে না। বিনিয়োগ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। তবে বাংলাদেশে বিনিয়োগের যে সকল পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে তার একটি আলোচনা তুলে ধরা হচ্ছে। তার পূর্বে বিনিয়োগের আরো যে সকল পদ্ধতিতে হতে পারে তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হলো।

২. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে :[৩]

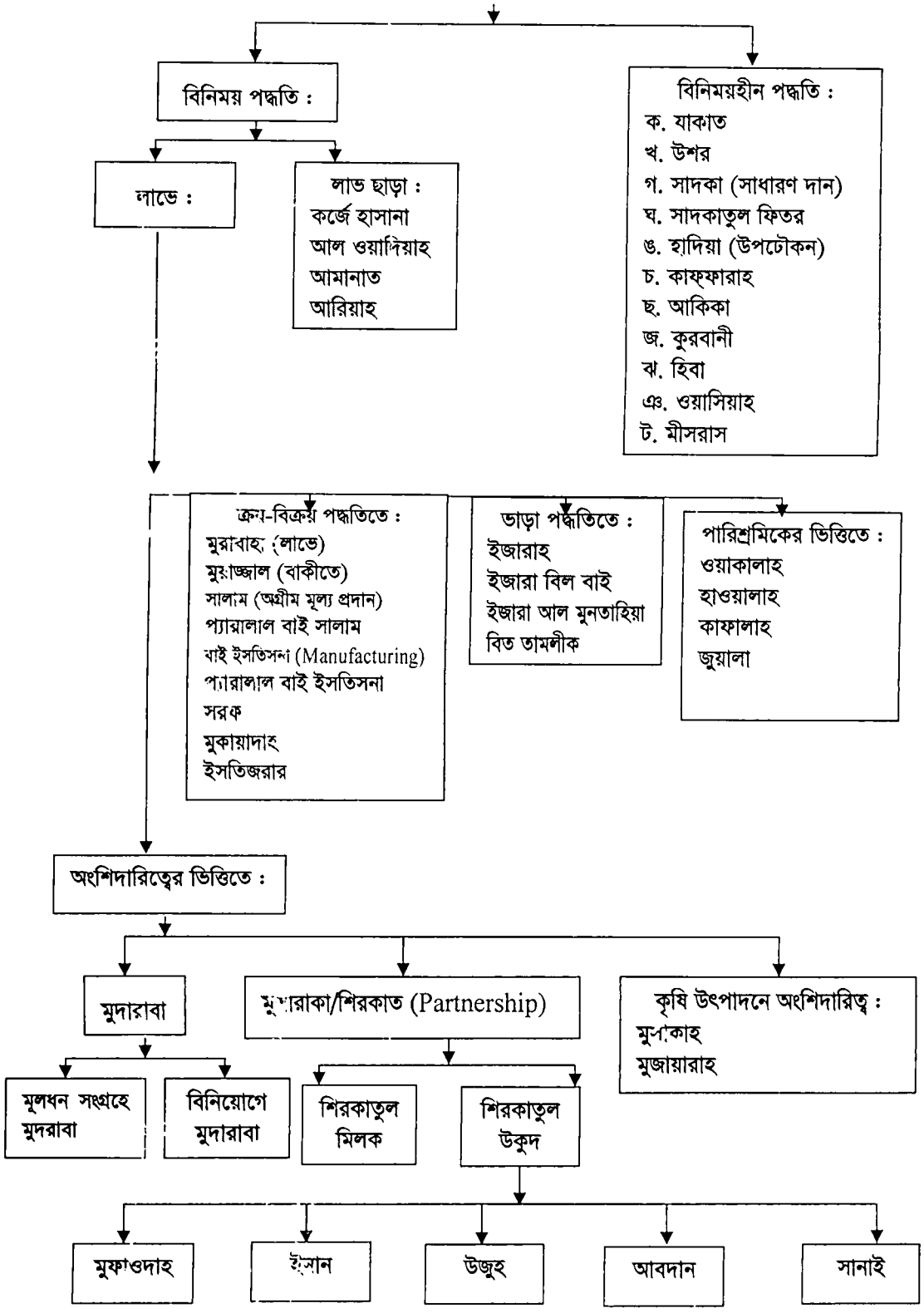

৩. সূত্র : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগে ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রকারভেদ

১. বাণিজ্যিক : ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এ জাতীয় বিনিয়োগ করা হয়।

২. শিল্প বিনিয়োগ : শিল্পকারখানার মেশিনপত্র, যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য এ জাতীয় বিনিয়োগ প্রদান করা হয়।

৩. কৃষি বিনিয়োগ : কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয়ের জন্য এ বিনিয়োগ প্রদান করা হয়।

৪. আমদানি বিনিয়োগ : আমদানিকারকগণকে আমদানিকৃত দ্রব্যের বিপরীতে যে বিনিয়োগ প্রদান করা হয় তাকে আমদানি বিনিয়োগ বলা হয়। ইসলামী ব্যাংক এমপিআই বা মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট নামে এ বিনিয়োগ দিয়ে থাকে।

৫. রপ্তানী বিনিয়োগ : বিদেশে কোন দ্রব্য রপ্তানী করার ক্ষেত্রে ব্যাংক যে আর্থিক সহায়তা দেয় তা এর আওতায় পড়ে। সাধারণত মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স নামে ইসলামী ব্যাংক এ বিনিয়োগ দিয়ে থাকে।

৬. ভোগ্য পণ্য বিনিয়োগ : সরাসরি ভোগের জন্য ইসলামী ব্যাংক, মুরাবাহা বা বাই-মোয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ভোগ্য পণ্য ক্রয় করার জন্য বিনিয়োগ প্রদান করতে পারে।

৭. বিবিধ প্রকল্প বিনিয়োগ : ডাক্তার বিনিয়োগ, গাড়ি বিনিয়োগ ইত্যাদি প্রকল্পেও ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ সুবিধা দিয়ে থাকে।

সময়ের ভিত্তিতে বিনিয়োগের প্রকারভেদ

১. স্বল্প মেয়াদী : সর্বোচ্চ ১২ মাস পর্যন্ত সময়ের বিনিয়োগকে স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ বলে।

২. মধ্যম মেয়াদী : ১ বছরের বেশী কিন্তু ৫ বছরের কম সময়ের বিনিয়োগকে মধ্যম মেয়াদী বিনিয়োগ বলে।

৩. দীর্ঘ মেয়াদী : ৫ বছরের উর্ধ্বে যেসব বিনিয়োগ তাকে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ বলে।

জামানতের ভিত্তিতে বিনিয়োগের প্রকারভেদ

১. জামানতবিহীন : বিনিয়োগের বিপরীতে যখন কোন জামানত থাকে না কেবল বিনিয়োগ গ্রহীতার ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয় তখন তাকে জামানতবিহীন বিনিয়োগ বলে।

২. জামানতযুক্ত : বিনিয়োগ গ্রাহক যখন ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার পাশাপাশি এ পরিমাণ প্রাথমিক ও/অথবা সহযোগী জামানত প্রদান করেন যার বাজার মূল্য বিনিয়োগের সমান অথবা বেশী তখন ঐ বিনিয়োগকে জামানতযুক্ত বিনিয়োগ বলে।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ ও ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংক এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে না, বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফার পাশাপাশি যাতে সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখে।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

১. বাই-মুরাবাহা
২. বাই-মুয়াজাল
৩. বাই-সালাম
৪. ইসতিস্না

খ. অংশীদারিত্ব পদ্ধতি

১. মুদারাবা
২. বাই-মুশারাকা

গ. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচপিএসএম) : মালিকানায় অংশীদারিত্ব বা শিরকাতুল মিল্ক্-এর ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয় করা।

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে যে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তা আলোচনার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা দরকার। তাই নিচে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রভারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন–মূল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি।

মূল্য নির্ধারণের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়

মূল্য নির্ধারণের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়কে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় :

১. বাই আল-আমানাহ ও
২. বাই আল মুসাওয়ামা।

Dhaka University Institutional Repository

বাই আল-আমানাহ

বাই আল-আমানাহর ক্ষেত্রে বিক্রেতা মালামালের ক্রয়মূল্য, আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদির ঘোষনা দেয়। বিক্রেতার এই ঘোষণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশ্বাসই এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তি, তাই একে বাই আল-আমানাহ বলা হয়।

বাই আল-আমানাহ আবার তিন প্রকারের হতে পারে :

ক. বাই-মুরাবাহা

খ. বাই-তাওলিয়া এবং

গ. বাই-ওয়াদইয়াহ

ক. বাই-মুরাবাহা

আরবী ربح শব্দ থেকে মুরাবাহা শব্দের উৎপত্তি। ربح শব্দের অর্থ সম্মত মুনাফা। কাজেই মুরাবাহা শব্দের সাথে মুনাফা শব্দটি জড়িত অর্থাৎ মুনাফা বা লাভ ছাড়া বাই-মুরাবাহা হয় না। কাজেই নগদে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই-মুরাবাহা বলে।

খ. বাই-তাওলিয়া

এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রয়মূল্যের সাথে কোনো লাভ যুক্ত থাকে না বরং বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্যের সমান হয়ে থাকে। এখানে বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ঘোষণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ক্রেতা শুধু বিক্রেতার ক্রয়মূল্য দিয়ে মালামাল কিনতে রাজি হয়। অর্থাৎ, এ পদ্ধতির বিক্রয়ে কোনো লাভ-লোকসান নেই।

গ. বাই-ওয়াদইয়াহ

এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ঘোষণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে মালামাল কিনতে রাজি হয়। কাজেই এ পদ্ধতিতে বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম হয়। অর্থাৎ, এ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা লোকসানে বিক্রি করে।

২. বাই আল-মুসাওয়ামা

এ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। অর্থাৎ, এখানে বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ঘোষণা বা তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সরাসরি দর কষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতা লাভ-লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন মনে করে না।

নিম্নের রেখাচিত্রের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের উপরোক্ত প্রভারভেদ দেখানো হলো:

Dhaka University Institutional Repository

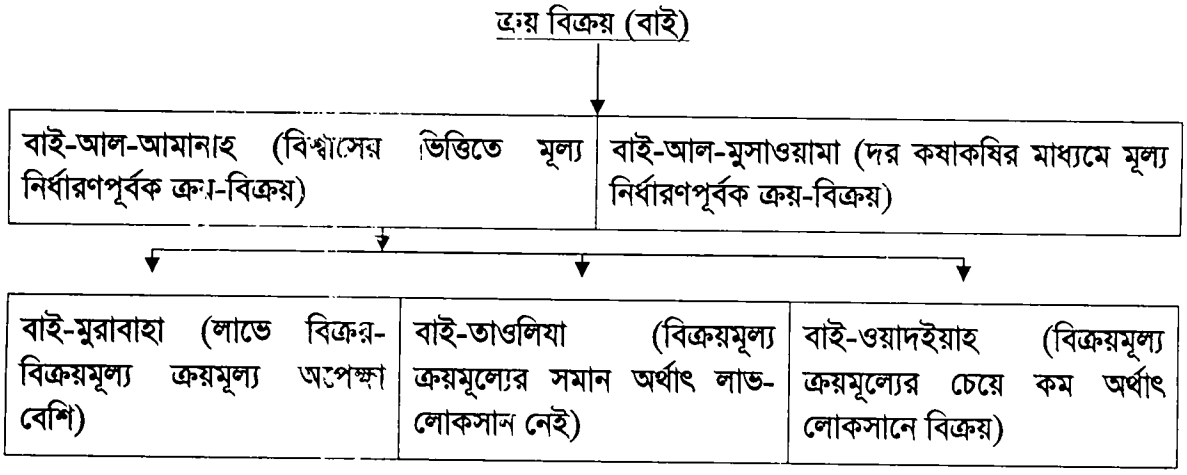

মূল্য পরিশোধের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়

মূল্য পরিশোধের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে। যেমন :

১. বাই বিন্-নক্দ : এই পদ্ধতিতে মালের মূল্য নগদে অর্থাৎ তাৎক্ষণিক পরিশোধিত হয়ে থাকে।

২. বাই বিল আজল : এ পদ্ধতিতে মালের মূল্য বাকিতে পরিশোধিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ মূল্য বিলম্বিত হয় এবং ভবিষ্যৎ কোনো নির্ধারিত তারিখে অথবা কিস্তিতে পরিশোধিত হয়ে থাকে।[৪]

এখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে যে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

বাই-মুরাবাহা বা চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়

বাই-মুরাবাহার অর্থ

বাই-মুরাবাহা শব্দ দুটি بيع এবং ربح শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। بيع শব্দটির অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং ربح শব্দটির অর্থ সম্মত মুনাফা। কাজেই বাই-মুরাবাহার অর্থ– সম্মত মুনাফায় বিক্রয়। মুরাবাহা (مرابحة) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে লাভ দেওয়া, ফায়দা দেওয়া ও উপকার করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় কোন মাল ক্রয় করার পর কিছু মুনাফা করে অর্থাৎ ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের অংকে যোগ করে বিক্রয় করাকে বলা হয় 'বাই-মুরাবাহা' (البيع المرابحة)। কোন ব্যক্তি কোন মাল কারো নিকট হতে যে মূল্যে ক্রয় করেছে তা অপেক্ষা অধিক মূল্যে অর্থাৎ ক্রয়মূল্যের সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের অংশ যোগ করে অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করাকে বাই মুরাবাহা (Bai Murabaha) বলে। ইংরেজিতে বাই মুরাবাহা (Bai Murabaha)-কে বলা হয় To sale at cost plus profit অর্থাৎ লাভে বিক্রয় অথবা Contract sale on profit অর্থাৎ চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়।[৫]

---

৪. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব, প্রয়োগ, পদ্ধতি*, ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ২০০৪।

৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে, ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাই-মুরাবাহার সংজ্ঞা

নগদে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই মুরাবাহা বলে।

বাই-মুরাবাহার প্রকারভেদ

মূল্য পরিশোধের দিক দিয়ে বাই মুরাবাহা দুই প্রকার। যথা-

১. বাই মুরাবাহা বিন্ নক্দ্ এবং

২. বাই-মুরাবাহা বিল্ আজল

বাই-মুরাবাহা বিন্ নক্দ্ : যে সমস্ত বাই-মুরাবাহার স্থিরকৃত বা সম্মত মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধিত হয় তাকে বলা হয় বাই-মুরাবাহা বিন্ নক্দ।

বাই-মুরাবাহা বিল আজল : যে সমস্ত বাই-মুরাবাহার স্থিরকৃত বা সম্মত মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত করা হয় তাকে বলা হয় বাই-মুরাবাহা বিল্ আজল।

লেনদেনকারী পক্ষের দিক দিয়ে বাই-মুরাবাহা দুই প্রকার। যথা :

১. সাধারণ বাই-মুরাবাহা

২. আদেশ এবং প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই-মুরাবাহা

সাধারণ বাই-মুরাবাহা

যে বাই-মুরাবাহা লেনদেনে শুধু বিক্রেতা ও ক্রেতা দুটি পক্ষ থাকে যেখানে বিক্রেতা কোনো ক্রেতার অনুরোধ ছাড়াই একজন সাধারণ ব্যসায়ী হিসাবে বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করে নিজ মালিকানা ও দখলে রেখে আগত ক্রেতাদের কাছে আনুষঙ্গিক খরচ ও ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত মুনাফা যোগ করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক বিক্রি করে, তাকে সাধারণ বাই-মুরাবাহা বলে।

আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই-মুরাবাহা

এ ধরনের বাই-মুরাবাহায় সাধারণত ক্রেতা, বিক্রেতা এবং মধ্যস্থতাকারী তিনটি পক্ষ থাকে। ক্রেতা যখন কোনো ব্যবসায়ীর কাছে নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য যায় কিন্তু তার কাছে যদি ঐ পণ্যের মজুত না থাকে তবে তিনি অন্য কোনো ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার কাছ থেকে ঐ পণ্য সংগ্রহ/ক্রয় করে আগত ক্রেতার নিকট আনুষঙ্গিক খরচ ও ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করার প্রস্তাব দিতে পারে অথবা ঐ ক্রেতা ঐ নির্দিষ্ট পণ্য অন্য কোনো ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার কাছ থেকে সংগ্রহ/ক্রয় করে উপরোক্ত শর্তে তার কাছে বিক্রয় করার প্রস্তাবসহ ক্রয়ের অঙ্গীকার করে : যে বিক্রেতার কাছে উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী মালের মজুত থাকে না এবং অন্যের কাছ থেকে ক্রয়/সংগ্রহ করে বিক্রি করে সে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত বাই-মুরাবাহা পদ্ধতির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কোনো প্রকার বাই-মুরাবাহার ক্ষেত্রে লাভ কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অংক অথবা ক্রয়মূল্যের নির্দিষ্ট শতকরা হারও হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বাই মুরাবাহার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. এ পদ্ধতিতে তিনিটি পক্ষ থাকে– ব্যাংক, বিক্রেতা (যার নিকট থেকে ব্যাংক মাল ক্রয় করে) এবং ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক যার নিকট ব্যাংক মাল বিক্রয় করে)।

২. বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে তার চাহিদানুযায়ী মাল ক্রয়ের অঙ্গীকারসহ উক্ত নির্ধারিত মাল ক্রয়পূর্বক তার নিকট বিক্রয় করার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করে।

৩. বিনিয়োগ গ্রাহককে অঙ্গীকার অনুযায়ী ব্যাংকের নিকট থেকে মাল ক্রয় করে নিতে হয়; অন্যথায় ব্যাংকে ক্ষতিপূরণ দিতে বিনিয়োগ গ্রাহক বাধ্য থাকে।

৪. অঙ্গীকার পালনে বাধ্য করার অথবা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে নগদ/সহায়ক জামানতসহ যে কোনো ধরনের জামানত মুরাবাহা চুক্তি স্বাক্ষরের আগে অথবা পরে নেয়া যায়।

৫. বিনিয়োগ গ্রাহকের প্রস্তাব বিবেচনার আগে তার ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, সুনাম ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাংক খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে।

৬. বিনিয়োগ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী মালামাল কেনার আগে বাজারে মালের কাটতি, মূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদির ব্যাপারেও ব্যাংক খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে।

৭. মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদনের সময় মালের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে।

৮. বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট মালামাল বিক্রয় এবং সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত মালামালের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে। বিক্রয় এবং সরবরাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যাবতীয় ঝুঁকি বিনিয়োগ গ্রাহকের ।

৯. চুক্তি অনুযায়ী মালামাল বিনিয়োগ অথবা তার প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট তারিখে এবং নির্ধারিত স্থানে সরবরাহ করতে হয়।

১০. ব্যাংক ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে মালামাল বিক্রয় করে। ক্রয়মূল্য এবং লাভ স্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে হয়।

১১. চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করা যায় না।

১২. ব্যাংক ক্রয়-মূল্যের সাথে পরবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে মোট ক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এই ক্রয়-মূল্যের উপর চুক্তিকৃত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে।

১৩. চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক মালামাল সংরক্ষণের জন্য গুদাম ভাড়া, গুদাম কর্মচারীদের বেতন, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি খরচ আনুপাতিক হারে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করতে পারে।

১৪. বিনিয়োগ গ্রাহক সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে সব মালামাল একসাথে সরবরাহ নিতে পারেন; আবার কিস্তিতে আনুপাতিক মূল্য পরিশোধ করে আংশিক মালামালও নিতে পারেন।

১৫. বিনিয়োগকৃত মালামালের মালিকানা বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থাকে।

১৬. চুক্তিবদ্ধ বিনিয়োগ গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামালের সরবরাহ নিতে ও মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন।

১৭. বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর হয়ে যাবার পর আর কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদনযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাই-মুয়াজ্জাল বা বাকি মূল্যে বিক্রয়

বাই-মুয়াজ্জলের অর্থ

বাই-মুয়াজ্জাল শব্দ দুটি আরবী بيع এবং اجل শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। بيع শব্দটির অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং اجل শব্দটির অর্থ নির্ধারিত সময়। কাজেই বাই-মুয়াজ্জল শব্দটির অর্থ ভবিষ্যতে কোনো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্তে বাকি মূল্যে বিক্রি। বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় লাভে হতে পারে, সমমূল্যে হতে পারে, আবার লোকসানেও হতে পারে। যদি লাভে হয়ে থাকে তাহলে তাকে বলা হয় মুরাবাহা বাই মুয়াজ্জাল। বাই মুয়াজ্জাল বলতে সাধারণত মুরাবাহা বাই-মুয়াজ্জালকেই বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ক্রেতাকে আগে বিক্রীত মাল সরবরাহ করা হয় এবং ক্রেতা কর্তৃক মালের মূল্য পরিশোধ করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে। ইসলামে বাই মুয়াজ্জাল অর্থাৎ বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ।

বাই-মুয়াজ্জালের সংজ্ঞা

ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই-মুয়াজ্জাল বলে।

বাই-মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে তাদের চাহিদানুযায়ী মাল ক্রয়ের অঙ্গীকারসহ উক্ত নির্ধারতি মাল ক্রয়পূর্বক তাহার নিকট বাকি মূল্যে বিক্রয় করার জন্য ব্যাংকে অনুরোধ করে।

২. অঙ্গীকার অনুযায়ী ব্যাংকের নিকট থেকে মাল ক্রয় করে নিতে অন্যথায় ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দিতে বিনিয়োগ গ্রাহক বাধ্য থাকে।

৩. অঙ্গীকার পালনে বাধ্য করার অথবা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে নগদ সহায়ক জামানতসহ যে কোনো ধরনের জামানত বাই-মুয়াজ্জাল স্বাক্ষরের আগে অথবা পরে নেয়া যায়।

৪. বিনিয়োগ গ্রাহকের প্রস্তাব বিবেচনার আগে তার ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, সুনাম ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাংক খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে।

৫. বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তি সম্পাদনের সময় মালের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে।

৬. বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট মালামাল বিক্রয় এবং সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত মালামালের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে থাকে এবং সরবরাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যাবতীয় ঝুঁকি বিনিয়োগ গ্রাহকের।

৭. চুক্তি অনুযায়ী মালামাল বিনিয়োগ গ্রাহক অথবা তার প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট তারিখে এবং নির্ধারিত স্থানে সরবরাহ করতে হয়।

৮. ব্যাংক ক্রয়ের চেয়ে অধিক মূল্যে মালামাল বিক্রয় করে। তবে মুরাবাহার মত ব্যাংক ক্রয়মূল্য এবং লাভ বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট প্রকাশ করে না।

৯. চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করা যায় না।

১০. ব্যাংক ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. গ্রাহক চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করেন।

১২. ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে তার উপর পূর্ণ মালিকানা নিশ্চিত করার পর বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে এবং চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রাহককে উক্ত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে।

১৩. চুক্তিপত্রে উল্লিখিত নির্ধারিত পণ্য গ্রাহকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া হয়।

১৪. বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর হয়ে যাবার পর আর কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদনযোগ্য নয়।

বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জালের মধ্যে পার্থক্য[৬]

বাই -মুরাবাহা	বাই মুয়াজ্জাল
১. নগদ অথবা বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে।	১. শুধু বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।
২. ক্রয়মূল্য/ উৎপাদন ব্যয়ের সাথে নির্ধারিত মুনাফাসহ মালামাল বিক্রি হয়।	২. মুনাফা ছাড়া এমনকি ক্রয়মূল্য/ উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামেও মালামাল বিক্রি হতে পারে।
৩. ক্রয়মূল্য/উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে জানাতে হয়।	৪. ৩. ক্রয়মূল্য/ উৎপাদন ব্যয় ও লাভ ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে জানানো জরুরী নয়। শুধু মোট বিক্রয়মূল্য জানালেই চলে।

বাই-সালাম বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

বাই-সালামের অর্থ

বাই-সালাম শব্দ দুটি আরবী بيع এবং سلم শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। بيع শব্দটির অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং سلم শব্দটির অর্থ অগ্রিম। কাজেই (البيع السلم) শব্দদ্বয়ের অর্থ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। একে বাই সালাফ (البيع السلف)-ও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ক্রেতা কর্তৃক মালের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। আর বিক্রেতা কর্তৃক মাল ক্রেতার নিকট সরবারাহ বা হস্তান্তর করা হয় ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।

বাই-সালামের সংজ্ঞা

ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রীর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে বাই-সালাম বলে।

---

৬. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব, প্রয়োগ, পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

বাই-সালামের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী বাই-সালাম এমন এক ধরনের অর্থায়ন পদ্ধতি যেখানে দ্রব্য-সামগ্রীর অস্তিত্ব ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। যদি দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রির জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে বাই-সালাম হবে না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে বাই-মুরাবাহা অথবা বাই- মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা যেতে পারে।

২. তহবিলের অভাবে যাতে উৎপাদন বিঘ্নিত না হয় সেজন্য সাধারণত এ পদ্ধতিতে শিল্প ও কৃষিপণ্যের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থায়ন করে উৎপাদনের গতিকে সচল রাখা হয় ।

৩. পণ্য সরবরাহের নিরাপত্তার জন্য বিক্রেতার কাছ থেকে অথবা তার পক্ষে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে সহায়ক, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য জামানত নেয়া যায়।

৪. ফানজিবল (Fungible) দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাই-সালাম হয়ে থাকে। ফানজিবল (Fungible) দ্রব্য বলতে ঐ সকল দ্রব্যকে বোঝায় যা ওজন, পরিমাপ অথবা গণনা করা যায় এবং যার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং একটিকে অপরটি থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলাদা করা যায় না। নষ্ট হওয়ার ফলে এ ধরনের দ্রব্যকে অন্য দ্রব্য দ্বারা স্থলাভিষিক্ত করা যায়। কাজেই কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা নমুনার কৃষিজাত পণ্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট কৃষিখামারের উৎপাদিত পণ্যের উপর বাই-সালাম হয় না। কারণ, সকল কৃষিজাত পণ্য আল্লাহর দান। এখানে মানুষের কোনো হাত নেই। তাই কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বা নমুনার পণ্যসামগ্রী উৎপাদন নাও হতে পারে। আবার কোনো নির্দিষ্ট খামারেও চুক্তিকৃত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন না-ও হতে পারে অথবা উৎপাদিত হলেও তোলার আগে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ জন্য এ ধরনের কৃষিপণ্যের উপর বাই-সালাম হয় না।

৫. পৃথক প্রতিনিধিত্ব চুক্তির মাধ্যমে বিক্রেতা তথা বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রেতার পক্ষে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে।

বাই সালামের শর্তাবলী

১. শরীয়াহর নীতি অনুযায়ী বাই-সালামের অন্যতম শর্ত হচ্ছে চুক্তি। এ পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ হয়ে থাকে। কাজেই ভবিষ্যতে বিরোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'জন মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে সূরা আল বাক্বারাহর ২৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও...। দু'জন সাক্ষী রাখো, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা।'

২. পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, এককপ্রতি দাম, মোট দাম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. পণ্য সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৪. মালের পরিবহন, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোনো শর্ত থাকে তবে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. চুক্তি সম্পাদনের সময় মালামালের সম্পূর্ণ মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালামালের সরবরাহ কিস্তিতে অথবা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে এককালীন দেয়া-নেয়া যেতে পারে।

৭. বিক্রেতা চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে সে অগ্রিম গ্রহীতা সম্পূর্ণ অথবা আনুপাতিক আংশিক মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

৮. এ পদ্ধতিতে শুধু মোট মূল্যের উল্লেখ থাকলেই চলে। উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা পৃথকভাবে দেখানো জরুরী নয়।

প্যারালেল (Parallel) সালাম[৭]

যদি সালাম চুক্তির বিক্রেতা চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহের জন্য তৃতীয় কোনো বিক্রেতার সাথে প্রথম চুক্তির অনুরূপ মালামাল সংগ্রহের জন্য অন্য একটি পৃথক সালাম চুক্তি সম্পাদন করে তবে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে Parallel সালাম বলে।

ইস্‌তিস্‌না বা আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়

ইস্‌তিস্‌নার অর্থ

ইস্‌তিস্‌না শব্দটি আরবী صنع শব্দ থেকে এসেছে। صنع শব্দের অর্থ শিল্প। সুতরাং ইসতিস্‌নার অর্থ কোনো উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করা অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী তৈরি করে বিক্রি করা।

ইস্‌তিস্‌নার সংজ্ঞা

অগ্রিম অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ অনুমোদিত পণসামগ্রী তৈরি করে বিক্রয় করাকে অথবা মূল্য পরিশোধের উপরোক্ত শর্তানুযায়ী কোনো উৎপাদনকারীর/বিক্রেতার কাছে থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করাকে ইসতিসনা বলে।

প্যারালেল (Parallel) ইসতিসনা[৮]

যদি চুক্তিপত্রে এমন কোনো শর্ত না থাকে যে ফরমায়েশকৃত মালামাল বিক্রেতা নিজেই তৈরি করবে তবে বিক্রেতা তা সরবরাহের জন্য তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট চুক্তিকৃত মালামালের অনুরূপ মালামাল সংগ্রহ বা বানিয়ে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে (Parallel) ইসতিসনা বলে। সাধারণত প্রথম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য (Parallel) ইসতিসনা প্রয়োজন হয়।

---

৭. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৮. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসতিসনা চুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. ইসলামী শরীয়তে সালামের ন্যায় ইসতিসনা আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি, যেখানে মালামালের অস্তিত্ব ছাড়াই বেচাকেনা সংঘটিত হয়ে থাকে। যদি বিক্রির জন্য মালামাল প্রস্তুত থাকে সেক্ষেত্রে শরীয়াহ অনুযায়ী বেচাকেনা বৈধ হবে না। তখন বাই-মুয়াজ্জাল বা বাই-মুরাবাহার মাধ্যমে বেচাকেনা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

২. এ পদ্ধতিতে মালামালের সরবরাহ বিলম্বিত হয়ে থাকে এবং মূল্য পরিশোধও বিলম্বিত হতে পারে। বাই-সালামের ন্যায় তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ জরুরী নয়। তবে মূল্য অগ্রিম বা কিস্তিতেও পরিশোধিত হতে পারে।

৩. উৎপাদন ব্যয়নির্বাহের জন্য এ পদ্ধতিতে অনেক সময় মালামালের মূল্য অগ্রিম প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪. এ পদ্ধতিতে ক্রেতা অনেক সময় কোনো ভবিষ্যতে নির্ধারিত তারিখে অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ পায়।

৫. মালামালের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মূল্যের লেনদেন হয়ে থাকলে অথবা উৎপাদন কাজ শুরু হয়ে থাকলে কোনো পক্ষই চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

ইসতিসনার শর্তাবলী

১. শরীয়াহর নীতি অনুযায়ী ইসতিসনার অন্যতম শর্ত হচ্ছে চুক্তি। এ পদ্ধতিতে আদেশের ভিত্তিতে মালামাল তৈরি করে নেয়া হয় বা বানানো হয়। এ পদ্ধতিতে মালামালের সরবরাহ বিলম্বিত হয় এবং মূল্য পরিশোধ তাৎক্ষণিক, বিলম্বে, অথবা কিস্তিতে হতে পারে। কাজেই ভবিষ্যতে বিরোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'জন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, এককপ্রতি দাম, মোট দাম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. পণ্য সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৪. মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধিত না হলে, পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৫. মালের পরিবহন, বীমা, শুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোনো শর্ত থাকে তবে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালামালের সরবরাহ কিস্তিতে অথবা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে এককালীন দেয়া-নেয়া যেতে পারে।

৭. বিক্রেতা চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে সে অগ্রিম সম্পূর্ণ অথবা আনুপাতিক আংশিক তূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

৮. এ পদ্ধতিতে শুধু মোট মূল্যের উল্লেখ থাকলেই চলে। উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা পৃথকভাবে দেখানো জরুরি নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাই সালাম ও বাই ইসতিসনার মধ্যে পার্থক্য

বাই সালাম	বাই ইসতিসনা
১. চুক্তি সম্পাদনের সময় সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধিত হয়।	১. নির্ধারিত মূল্য অগ্রিম এককালীন, মেয়াদের মধ্যে যে কোনো সময় এককালীন অথবা কিস্তিতে, মেয়াদের পরে ভবিষ্যতে কোনো নির্ধারিত সময়ে এককালীন অথবা মোদের পরে নির্ধারিত কিস্তিতে ইত্যাদি যে কোনোভাবে চুক্তির শর্তানুযায়ী মূল্য পরিশোধিত হতে পারে।
২. মালামাল সব সময় উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন ছাড়া মালামাল অন্য উপায়ে সংগ্রহ করেও সরবরাহ করা যায়।	২. ফরমায়েশ অনুযায়ী মালামাল তৈরি করে সরবরাহ করতে হয়।
৩. চুক্তি একবার কার্যকরী হলে তা কোনো পক্ষ এককভাবে বাতিল করতে পারে না।	৩. উৎপাদন শুরুর পূর্বে যে কোনো পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে।
৪. মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরি।	৫. মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরি নয়।

বিনিয়োগ গ্রাহককে মালামাল ক্রয়ের জন্য 'ক্রয় প্রতিনিধি' নিয়োগ

বাই পদ্ধতির মূল বিষয় হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যাংক মালামাল ক্রয় করে তা বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যার কারণে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে সরাসরি মালামাল ক্রয় করা কঠিন হয়ে পড়ে :

ক. ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মালামাল ক্রয়ের সময় মালামালের গুণগত মান, মূল্য ইত্যাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সঠিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। এছাড়া অভিজ্ঞতার কারণে ব্যবসায়ীরা বিশেষ বিশেষ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে থাকে। ব্যাংক কর্মকর্তাদের বাস্তব এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাবে তাদের দ্বারা এ ধরনের কাজ করতে গেলে গ্রাহক এবং সর্বোপরি ব্যাংক বিভিন্ন সমস্যা ও বাস্তব ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

খ. অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পণ্য বিভিন্ন বাজার/এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে দর কষাকষির মাধ্যমে কিনতে হয়, যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

গ. অনেক বিক্রেতা নগদ টাকা ছাড়া ডিডি/পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে মালামাল বিক্রয় করতে চায় না। তাই ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে নগদ টাকা নিয়ে বাজারে/বিভিন্ন এলাকায় যাওয়া আসা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

ঘ. অনেক সময় একাধিক ছোট ছোট পণ্য বিভিন্ন দোকান থেকে নগদ টাকায় কিনতে হয়, যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

এ অবস্থায় মালামাল ক্রয়ের জন্য কিছু শর্তাপেক্ষে বিনিয়োগ গ্রাহককে সমস্যাযুক্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করার জন্য কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু শর্ত নিচে উল্লেখ করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রথমে গ্রাহক ক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করে। অতঃপর ইজাব ও কবুল (অর্থাৎ বাই-মুরাবাহা/বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তিপত্র পূরণ)-এর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত দামে গ্রাহক নিজের জন্যে তা ক্রয় করে নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকের দু'টি বৈশিষ্ট্যের একটিকে অন্যটি হতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ, কখনও সে একজন গ্রাহক এবং কখনও একজন প্রতিনিধি। যতক্ষণ পর্যন্ত সে একজন গ্রাহক এবং কখনও একজন প্রতিনিধিরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর প্রতিনিধিত্বের বিধান বলবৎ থাকে। অতঃপর যখন সে ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মালামাল ব্যাংক হতে ক্রয় করে, তখন থেকে উক্ত মালামালের মালিকানা ও ঝুঁকি গ্রাহককেই বহন করতে হয়।

২. শাখার আওতাবহির্ভূত স্থান এবং স্থানীয় বিক্রেতা হতে খুচরা মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রেই শুধু গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহক/প্রতিনিধির ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট শাখার একজন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন করার পর এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ফাইলে সংরক্ষণ করে।

৩. পদ্ধতি :

ক. গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও গ্রাহক কতৃক উক্ত মঞ্জুরী পত্রে স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর যাবতীয় প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদিত হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী আবেদনপত্র নেয়া হয়।

খ. গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর গ্রাহককে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের জন্য কতৃত্ব প্রদানপূর্বক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী নিয়োগপত্র দেয়া হয়।

গ. মালামাল ক্রয়ের জন্য গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করে সরবরাহকারী/বিক্রেতার অনুকূলে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ডিডি প্রতিনিধির নিকট যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকারের মাধ্যমে হস্তান্ত র করা হয়। প্রয়োজনে মালামালের ক্রয়মূল্য ব্যাংকের নিকট রক্ষিত প্রতিনিধির হিসাবে ক্রেডিট করা যেতে পারে অথবা যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকারপূর্বক প্রতিনিধিকে নগদ অর্থও প্রদান করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বাস্তবতার দিকে লক্ষ রেখে শাখা ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ঘ. ক্রয়ের পর প্রতিনিধি পূর্বস্থিরীকৃত স্থানে মালামাল মজুত করে অনতিবিলম্বে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট মালামালের পজেশন ও ক্রয় সংক্রান্ত প্রমাণাদি যেমন ক্যাশমেমো/চালান, পরিবহন রশিদ, বীমাপত্র ইত্যাদি হস্তান্তর করে। অতঃপর ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রাহককে মালামাল হস্তান্তরপূর্বক পার্চেজ শিডিউল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলপত্রে তার স্বাক্ষর নেয়।

ঙ. সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি/দলিলাদি শাখার গ্রাহকের ফাইলে যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকা আবশ্যক।

বাই আল-ইনা

বাই আল-ইনা এমন এক ধরনের কারবার, যেখানে বাস্তবিক কোনো ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না; বরং ক্রয়-বিক্রয় দেখিয়ে বা ক্রয়-বিক্রয়ের ভান করে সুদ বা রিবার লেনদেন করা হয়। ধরা যাক, 'ক' নামক

Dhaka University Institutional Repository

কোনো ব্যক্তির নগদ এক হাজার টাকার প্রয়োজন। সে 'খ' নামক কোনো ব্যক্তির কাছে তাঁর এই প্রয়োজনের বিষয়টি জানিয়ে এক হাজার টাকা এক বছর পর পরিশোধের শর্তে ধার নেয়ার প্রস্তাব দিল। 'খ' এ প্রস্তাবে রাজি কিন্তু সমস্যা হলো, তারা জানে নগদ এক হাজার টাকা ধার দিয়ে এক বছর পর এক হাজার টাকার অতিরিক্ত অর্থের লেনদেন করলে তা সুদ বা রিবা হয়ে যাবে এবং এটা ঘৃণিত অপরাধ। আবার এক হাজার টাকা এক বছর পর কিছু লাভ না দিয়ে আসলেও চলে না। অথচ 'ক' এর টাকাটা খুবই প্রয়োজন এবং 'খ' এরও ইচ্ছা যে সে 'ক'-কে টাকাটা দেবে। তাই উভয়ই অতিরিক্ত অর্থের লেনদেনটিকে হালাল বা বৈধ করার জন্য একটি উপায় বের করল। পরামর্শ অনুযায়ী 'খ' কিছু পণ্যসামগ্রী বাকি মূল্যে অর্থাৎ বাই-মুয়াজ্জাল বা বাই-মুরাবাহা বিল-আজল পদ্ধতিতে এক হাজার একশত টাকায় এক বছর পর পরিশোধের শর্তে বিক্রয় করল। কিছুক্ষণ পর 'ক' আবার ঐ একই পণ্যসামগ্রী 'খ'-এর নিকট এক হাজার টাকায় নগদে বিক্রি করল। ফলে 'খ'-এর পণ্যসামগ্রী 'খ'-এর নিকট চলে আসল এবং 'ক' এক হাজার টাকা নগদে পেয়ে গেল। এক বছর পর 'ক' বাকি মূল্য এক হাজার একশত টাকা 'খ'-কে পরিশোধ করল অর্থাৎ 'খ' এক হাজার টাকার অতিরিক্ত একশত টাকা পেয়ে গেল।

উপরে বর্ণিত তথাকথিত ক্রয়-বিক্রয় বাই আল-ইনার পর্যায়ভুক্ত এবং তথাকথিত একশত টাকা লাভ সুদ বা রিবা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বাই আল-ইনা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

এ জন্য আমাদেরকে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন এ ধরনের কোনো লেনদেনে কখনও আমরা জড়িয়ে না পড়ি।

মুদারাবা বা স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে মুনাফা ভাগাভাগিতে বিনিয়োগ

মুদারাবার ভিত্তি

> অন্যরা ভ্রমণ করবে পৃথিবীতে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে।[৯]

পবিত্র কোরআন শরীফের উক্ত আয়াত মুদারাবার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত।

মুদারাবার অর্থ

আরবী ضرب শব্দ থেকে মুদারাবা مضارب শব্দের উৎপত্তি। ضرب শব্দের অর্থসমূহের মধ্যে ভ্রমণ একটি। জমিনে পদাঘাত করা। চলাফেরা করা, বিচরণ করা ইত্যাদিও এর অর্থ। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে ব্যবসার উদ্দেশে ভ্রমণকে মুদারাবার মৌলিক বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বাই মুদারাবা (البيع المضاربة) হচ্ছে একপ্রকার অংশীদারী কারবার। অর্থাৎ, চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফার অংশীদারিত্ব। এ পদ্ধতিতে একপক্ষ ব্যবসার মূলধন অর্থাৎ পুঁজি সরবরাহ করে, আর অপরপক্ষ ঐ মূলধন ব্যবহার করে স্বীয় শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফার অংশীদারিত্ব লাভ করে। এভাবে একজনের পুঁজি ও অন্যজনের দৈহিক শ্রম, মেধা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তাই মুদারাবা।

মূলধনের মালিক অর্থাৎ মূলধন সরবরাহকারীকে বলা হয় সাহিবুল মাল (صاحب المال) বা রাব্বুল মাল (رب المال) এবং মূলধন ব্যবহারকারী অর্থাৎ উদ্যোক্তাকে বলা হয় মুদারিব (مضارب)।[১০]

---

৯. সূরা আল-মুযযাম্মিল : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোক্তা বা ব্যবসা পরিচালনাকারী যেহেতু পৃথিবীতে পদচারণা করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে তাই হানাফী ও হাম্বলী মাজহাবের ফকীহ অর্থাৎ ইসলামী আইনবিদগণ এ পদ্ধতির কারবারের নাম দিয়েছেন মুদারাবা। অন্য মাজহাবে কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন 'কিরাদ' (قراض) বা ধারে ব্যবসা এবং পুঁজির মালিককে বলা হয়েছে 'মুকারিদ'।

মুদারাবার সংজ্ঞা

যে কারবারে একপক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে এবং চুক্তি অনুযায়ী লাভ নেয় অথবা দ্বিতীয় পক্ষের অবহেলাজনিত কারণ ছাড়া সমুদয় আর্থিক ক্ষতি মূলধন যোগানদাতা বহন করে তাকে মুদারাবা বলে। এ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংককে বলা হয় 'সাহিব আল-মাল' এবং গ্রাহককে বলা হয় 'মুদারিব'।

পবিত্র কুরআন শরীফের উক্ত আয়াত মুদারাবা ব্যবসার ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত।

মুদারাবার প্রকারভেদ

চুক্তির ভিত্তিতে মুদারাবা ব্যবসা প্রধানত দুই প্রকার হতে পারে। যথা-

১. সাধারণ (Unrestricted) মুদারাবা বা আল-মুদারাবা আল-মুতলাক : যে মুদারাবা ব্যবসায়ে মুদারিবকে কোনরূপ শর্ত আরোপ ছাড়াই সাহিব আল-মাল কর্তৃক ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হয় তাকে সাধারণ (Unrestricted) মুদারাবা বা আল-মুদারাবা আল-মুতলাক বলা হয়।

২. বিশেষ (Restricted) মুদারাবা বা আল-মুদারাবা আল-মুকাইয়েদা : যে মুদারাবা ব্যবসায়ে মুদারিবের কোনরূপ অযাচিত চাপ প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সাহিব আল-মাল ব্যবসায়ের ধরন, মেয়াদ, স্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেয় তাকে বিশেষ (Restricted) মুদারাবা বা আল-মুদারাবা আল-মুকাইয়েদা বলা হয়।

মুদারাবার শর্তাবলী

চুক্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. মুদারাবা চুক্তিতে দুইটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ সাহিব আল-মাল হিসাবে ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ মূলধন যোগান দেয় এবং অপর পক্ষ মুদারির হিসাবে তার শ্রম, মেধা ও সময় বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করে।

২. মুদারাবা চুক্তির উভয় পক্ষেরই প্রতিনিধি নিয়োগ অথবা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার আইনগত যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকতে হবে। কারণ, মুদারাবা চুক্তিতে একপক্ষ অপরপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে এবং অপরপক্ষকে তার প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ দেয়।

৩. সাধারণ নীতি অনুযায়ী মুদারাবা চুক্তি নিম্নোক্ত দুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত পক্ষদ্বয়ের যে কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী বিলোপ করতে পারে।

ক. মুদারির কর্তৃক ব্যবসা ইতোমধ্যে শুরু করা হয়ে থাকলে। এক্ষেত্রে চুক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষ মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তি টানতে পারে না।

---

১০. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

খ. চুক্তির মেয়াদ কি হবে তা স্থির করে উভয় পক্ষ সম্মতি দিলে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোনো পক্ষ এককভাবে মুদারাবা চুক্তি বিলোপ সাধন করতে পারে না।

৪. মুদারাবা একটি বিশ্বস্ততার চুক্তি। তাই মুদাবির বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে মুদারাবা মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে বিধায় সে তার অবহেলা, অব্যবস্থা, অসদাচরণ, চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে লোকসান হলে তার জন্য দায়ী হয় না।

মূলধন সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. মুদারাবা মূলধন নগদ অর্থে দেয়া উচিত। তবে নির্দিষ্ট বাস্তব সম্পদও মুদারাবা ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের মূল্য মুদারাবা মূলধন হিসাবে বিবেচিত হয়। কোনো দক্ষ মূল্যায়নকারী কর্তৃক অথবা পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে নিতে হয়।

২. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের মূলধনের পরিমাণ, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হয়, যাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।

৩. সাহিব আল-মালের কাছে মুদাবির বা অন্য কারোও দেনা মুদারাবা ব্যবসায় মূলধন হিসাবে বিবেচিত হয় না।

৪. মূলধন সম্পূর্ণ অথবা ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে চুক্তির শর্তানুযায়ী পর্যায়ক্রমে মুদারিব তার ইচ্ছামাফিক মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

৫. মুদারাবা ব্যবসায়ে লাভ হলে তা ভোগ করার অধিকার সাহিব আল-মাল ও মুদারিব উভয়ের। কোনো একজনকে বাদ দিয়ে অপরজন একা লাভ নিতে পারে না।

জামানত সংক্রান্ত শর্তাবলী

পুঁজির যোগানদাতা বা সাহিব আল-মাল মুদারিবের কাছ থেকে পর্যাপ্ত ও আদায়যোগ্য জামানত নিতে পারে; তবে শর্ত থাকে যে, মুদারিবের অবহেলা, অব্যবস্থা, চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে জামানত কার্যকরী করা যাবে না।

লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. ভবিষ্যতে বিরোধ এড়ানোর জন্য মুনাফা বন্টনের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে মুনাফা বণ্টনের অনুপাত নির্ধারিত হয়।

২. চুক্তি সম্পাদনের সময় মুনাফা বণ্টনের অনুপাত নির্ধারিত হয়। তবে পরবর্তী যে কোন সময় পক্ষগণের সম্মতিতে এ অনুপাত পরিবর্তন করা যায়।

৩. যদি চুক্তিতে মুনাফা বণ্টনের অনুপাতের উল্লেখ না থাকে তবে পক্ষদ্বয় দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী (যেমন– সমান সমান) মুনাফাও ভাগাভাগি করবে। যদি মুনাফা বণ্টনের অনুপাত সুনির্দিষ্ট না থাকে এবং কোনো প্রচলিত প্রথাও না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তি শুরুতেই বাতিল বলে গণ্য হয় এবং মুদারিব যে শ্রম বিনিয়োগ করে তার জন্য সে সাধারণ বাজার দর অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মুদারাবা ব্যবসায়ের মূলধন অক্ষত অবস্থায় না থাকলে মুনাফার স্বীকৃতি দেয়া বা দাবি করা যায় না।

৫. চলমান (continuous) মুদারাবা কারবারে যদি ক্ষতি হয় তবে তা পরবর্তী বছরসমূহে স্থানান্তর পূর্বক ভবিষ্যতে লাভ থেকে পূরণ করতে হবে। কিন্তু মুদারাবা চুক্তি যদি চলমান না হয় তবে কোনো চুক্তির অধীনে লোকসান হলে তা পরবর্তী চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কারবারে স্থানান্তরিত করা যায় না। মোট কথা, মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তিতে ব্যবসায়ের চূড়ান্ত ফলাফলের উপর মুনাফা বণ্টন নির্ভর করে। চূড়ান্ত হিসাবান্তে যদি লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয় তবে প্রকৃত ক্ষতি সাহিব আল-মালের মূলধন থেকে বাদ যাবে। যদি মুদারিবের অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, অসদাচরণ, চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে ক্ষতি হয় তবে একজন ট্রাস্টি হিসাবে মুদারিব উক্ত ক্ষতির জন্য দায়ী হয় না। যদি লাভ-ক্ষতির পরিমাণ সমান সমান হয় তবে সাহিব আল-মাল তার মূলধন অক্ষত অবস্থায় অর্থাৎ লাভ-লোকসান ছাড়াই ফেরত পাবে এবং মুদারিব কোনো লাভের অংশ পাবে না। যদি ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ বেশি হয় তবে প্রকৃত লাভ চুক্তি অনুযায়ী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে।

মুশারাকা

মুশারাকা (مشاركة) শব্দটির মূলে রয়েছে শিরকাত (شركة) -যার অর্থ হচ্ছে শরীক বা অংশীদার হওয়া। যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মূলধন ও লাভ লোকসানে অংশীদার হবার চুক্তিতে একত্রে কারবার পরিচালনা করে তাকে 'বাই মুশারাকা' (البيع المشاركة) বা শিরকাত (Bai Musharakah/Shirkat) বলে। এ পদ্ধতিকে বাংলায় অংশীদারী বা যৌথ করবার বলা হয়। সমসাময়িক অর্থনীতিবিদগণ ও ব্যাংকারদের মধ্যে মুশারাকা শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে শিরকাত শব্দের তুলনায় মুশারাকা শব্দটির অর্থ সীমিত।

পরিভাষায় শিরকাত

আইনের ভাষায় কোনো ব্যবসায়ে দুই বা ততধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মিলনই শিরকাত। সুতরাং বলঅ যায়, দুই বা ততধিক ব্যক্তি বা প্রাতষ্ঠানের মধ্যে প্রতষ্ঠিত অংশীদারিত্বই শিরকাত।

শিরকাতের প্রকারভেদ

শিরকাত প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে :

১. শিরকাত আল-মিল্ক (চুক্তিবিহীন) এবং

২. শিরকাত আল-আক্দ (চুক্তিভিত্তিক)

শিরকাত আল-মিল্ক (চুক্তিবিহীন)

উত্তরাধিকার, উইল, দান অথবা অন্য কোনো ঘটনার ফলে কোনো সম্পত্তির উপর দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে শিরকাত আল-মিলক বলে। যৌথ মালিকগণ তাদের স্ব-স্ব অংশ অনুযায়ী ঐ সম্পত্তি অথবা ঐ সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় ভোগ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শিরকাত আল-মিল্ককে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

ক. শিরকাত আল-মিল্ক বিল ইখতিয়ার ও

খ. শিরকাত আল-মিল্ক বিল জাবার।

শিরকাত আল-মিল্ক বিল ইখতিয়ার

বিভাজ্য হওয়া সত্ত্বেও যদি যৌথ মালিকগণ তাদের সম্পত্তি ভাগাভাগি না করে একত্রে রাখে তবে তাকে শিরকাত আল-মিল্ক বিল ইখতিয়ার বলা হয়।

শিরকাত আল-মিল্ক বিল জাবার

যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ অবিভাজ্য হওয়ায় মালিকগণ উক্ত সম্পদ যৌথ মালিকানায় রাখতে বাধ্য। এ ধরনের শিরকাতকে শিরকাত আল মিল্ক বিল জাবার বলা হয়।

শিরকাত আল-আক্দ (চুক্তিভিত্তিক)

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথ পুঁজি বিনিয়োগ ও কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত লাভ/ক্ষতি ভোগ/বহনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে শিরকাত আল-আক্দ বলা হয়।

শিরকাত আল-আক্দকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. শিরকাত আল-মুফাবাদা

খ. শিরকাত আল-ইনান

গ. শিরকাত আল-আবদান এবং

ঘ. শিরকাত আল-উজূহ

শিরকাত আল মুফাবাদা

যে অংশীদারী কারবারের সকল অংশীদার সাবালক হয়, সকলে সমপরিমাণ মূলধন যোগান দেয় প্রত্যেকে কারবার ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব সমভাবে বহন করে এবং এভাবেই লাভ-ক্ষতির ভাগীদার হয় তাকে শিরকাত আল-মুফাবাদা বলা হয়। এ ধরনের কারবারে অংশীদারগণ প্রত্যেকে অপর সকলের পক্ষে কাজ করে এবং সকলে যৌথ ও পৃথকভাবে কারবারের দায়-দায়িত্ব বহন করে।

শিরকাত আল-ইনান

এ ধরনের অংশীদারী কারবারে সকল অংশীদারের সাবালক হওয়া জরুরি নয়। এমনকি প্রত্যেকের সমপরিমাণ মূলধন যোগান দেয়া এবং সমভাবে লাভ-ক্ষতির ভাগীদার হওয়া কোনো পূর্বশর্ত নয়। অংশীদারগণ অন্য অংশীদারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে এবং তারা যৌথভাবে কারবারের দায়-দায়িত্বের জন্য দায়ীও হয় না।

অর্থাৎ, শিরকাত আল-ইনান এমন এক ধরনের অংশীদারী চুক্তি যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অংশীদার হিসাবে প্রত্যেকে সম্মত মূলধন যোগান দেয়, চুক্তির শর্তানুযায়ী কারবারের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে এবং অর্জিত লাভ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয় অথবা লোকসান হলে স্ব স্ব মূলধন অনুপাতে বহন করে।

শিরকাত আল-আবদান

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো প্রকার মূলধন যোগান না দিয়ে শুধু তাদের মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কারবার পরিচালনা করে অর্জিত আয় পূর্বস্থিরীকৃত অনুপাতে ভাগাভাগী করে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে শিরকাত আল-আবদান বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি দুইজন দর্জি এভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, তারা একত্রে তাদের খরিদ্দারদের কাজ করে দেবে এবং অর্জিত মজুরী একটি যৌথ তহবিলে জমা রেখে তা চুক্তির শর্তানুযায়ী ভাগাভাগী করে নেবে; তবে তা শিরকাত আল-আবদান হবে। এ ধরনের কারবারকে 'শিরকাত-উত-তাকাব্বুল' বা 'শিরকাত-উস-সানাই'-ও বলা হয়।

শিরকাত আল-উজূহ্

মর্যাদাবান, দক্ষ, বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি কোনো মূলধন যোগান না দিয়ে তাদের উক্ত গুণাবলীর প্রেক্ষিতে বাকি মূল্যে মালামাল ক্রয় করে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং অর্জিত মুনাফা পূর্বনির্ধারিত হারে ভাগাভাগি করে নেয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় তাহলে ঐ কারবার শিরকাত আল-উজূহ্ নামে অভিহিত। রেখাচিত্রের মাধ্যমে এখানে শিরকাতের প্রকারভেদ দেখানো হলো[১১] :

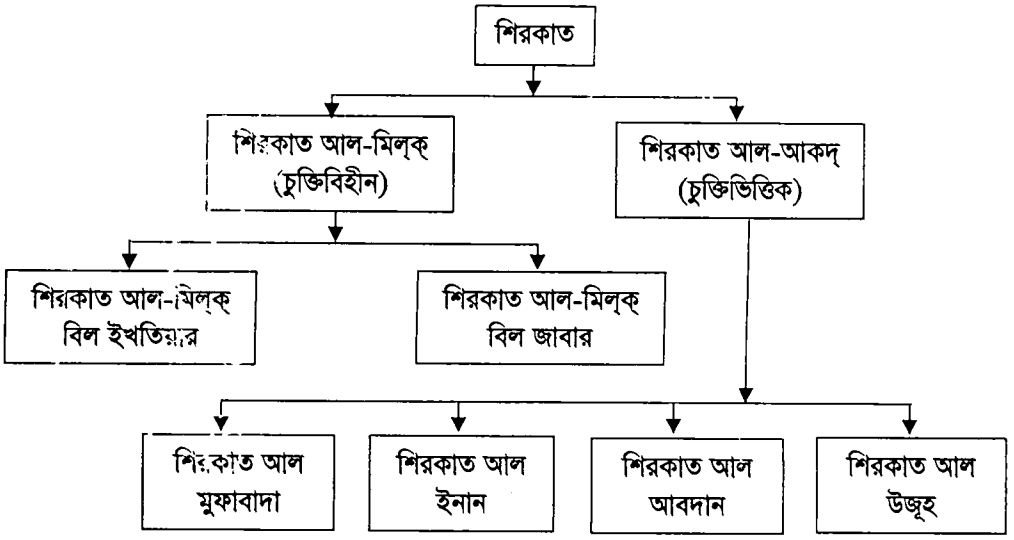

উপরোক্ত সকল অংশীদারিত্ব শিরকাত নামে অভিহিত। মুশারাকা এর কার্যক্রম শিরকাত আল-ইনান এর কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই সমসাময়িক মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ শিরকাত আল-ইনানকে মুশারাকা নামে ইসলামী অর্থায়ন তথা ব্যাংকিং-এর একটি পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত করেছেন। তাই মুশারাকা ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি অর্থায়ন পদ্ধতি হিসাবে শিরকাত আল-ইনান থেকে বেশি পরিচিত এবং প্রাসঙ্গিক। বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নিচে মুশারাকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

---

১১. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকা

মুশারাকা مشاركة একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসার উদ্দেশ্যে মুলধন যোগান দেয়, কেউ কেউ অথবা সকলে একত্রে কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে চুক্তি অনুযায়ী লাভ নেয় অথবা লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করে।

মুশারাকার প্রকারভেদ

মুশারাকা দুই প্রকার হতে পারে। যথা :

১. স্থায়ী (Permanent) মুশারাকা এবং

২. ক্রমহ্রাসমান (Diminishing) মুশারাকা।[১২]

১. স্থায়ী (Permanent) মুশারাকা

এ ধরনের মুশারাকায় ব্যাংক গ্রাহকের সাথে সম অথবা অসম পরিমাণ মূলধন যোগান দেয়, বাৎসরিক মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয় বা লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করে এবং চুক্তির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকে না। তাই এ ধরনের মুশারাকাকে চলমান মুশারাকা বলেও অভিহিত করা হয়। যদিও এ ধরনের কারবার বিলুপ্তি (Liquidation) পর্যন্ত চলতে পারে, তথাপি কোনো অংশীদার ইচ্ছা করলে তার অংশ বিলুপ্তির আগেও হস্তান্তর করতে পারে।

২. ক্রমহ্রাসমান (Diminishing) মুশারাকা

এটা একটি বিশেষ ধরনের মুশারাকা, যেখানে চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ব্যাংকের মুনাফার অংশ পরিশোধের সাথে সাথে সম্পদের উপর ব্যাংকের অংশও পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের মালিকানা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং সাথে সাথে গ্রাহকের মালিকানা বাড়তে থাকে। চুক্তির মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকের শেয়ার মূলধনকে কিছুসংখ্যক একক বিভক্ত করা হয় এবং গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে প্রত্যেকটি একক ক্রয় করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এভাবে ক্রয়ের ফলে গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মেয়াদান্তে গ্রাহক সম্পদের বা ব্যবসার সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জন করে।

যে সমস্ত সম্পদ থেকে নিয়মিত আয় হওয়া সম্ভব সে সমস্ত ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি উপযোগী। এ পদ্ধতিতে সম্পদের উপর গ্রাহকের পূর্ণ মালিকানা অর্জন সম্ভব বিধায় এটা গ্রাহককে উৎসাহিত করে।

মুশারাকার শর্তাবলী

১. চুক্তি : মুশারাকা কারবারের মূল ভিত্তি হচ্ছে চুক্তি। আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী চুক্তি দুইজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে বিরোধের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চুক্তিতে সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে।

২. মূলধন :

---

১২. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক. অংশীদারগণ সম অথবা অসমভাবে মূলধন যোগান দিতে পারে।

খ. মূলধন নগদে অথবা সম্পদেও দেয়া যায়। তবে সম্পদে দিলে সম্পদের মূল্য কোনো দক্ষ পেশাদার মূল্যায়নকারী দ্বারা মূল্যায়ন করে অংশীদারদের সম্মতিতে নির্ধারিত হতে হয়। এই নির্ধারিত মূল্যই সংশ্লিষ্ট অংশীদারের শেয়ার মূলধন হিসাবে বিবেচিত হবে।

গ. অংশীদারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন একটি একক তহবিল ও সত্তা হিসাবে পরিগণিত হয়।

ঘ. 'লাভের জন্য ঝুঁকি' এই নীতির উপর ভিত্তি করে মুশারাকা কারবার পরিচালিত। তাই কোনো অংশীদার অপর অংশীদারের মূলধনের নিরাপত্তা দিতে পারে না।

৩. অংশীদারদের ক্ষমতা : যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন সাপেক্ষে যাতে অন্যান্য অংশীদারের স্বার্থহানি না হয় এবং কোনো প্রকার অবহেলা, অসদাচরণ, চুক্তির পরিপন্থী কোনো কাজ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক অংশীদারের মুশারাকার সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির অধিকার আছে।

৪. ব্যবস্থাপনা : সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক অংশীদার মুশারাকা কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সম্মত হলে যে কোনো একজন অথবা সুনির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে কারবার পরিচালনায় কোনো বাধা নেই।

যদি সকলে কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল বিষয়ে একে অপরের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেকের কাজ সকলের কাজ হিসাবে পরিগণিত হয়।

৫. লাভ :

ক. লাভ পরিমাপযোগ্য হতে হবে, অন্যথায় লাভ বণ্টনের সময় অথবা চুক্তির বিলুপ্তির সময় বিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

খ. অর্জিত লাভের উপর মুনাফা বণ্টনের অনুপাত প্রয়োগ হবে। মূলধনের উপর কোনো নির্ধারিত হার অথবা কোনো নির্ধারিত বা অনির্ধারিত অংক (যেমন– প্রতি বৎসর মূলধনের ৫% অথবা ২০,০০০/= টাকা) মুনাফা বণ্টনের ভিত্তি হতে পারে না।

গ. চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারগণের মধ্যে অর্জিত লাভ মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হতে পারে।

ঘ. কোনো সক্রিয় অংশীদারের মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত অন্যদের তুলনায় বেশি হতে পারে।

ঙ. সকল অংশীদার সক্রিয় হলেও তাদের মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত কম-বেশি হতে পারে।

৬. লোকসান : কারবারের লোকসান সকল অংশীদারের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হয়।

৭. বিলোপ সাধন :

ক. উদ্দেশ্য অর্জিত হলে মুশারাকার বিলুপ্তি ঘটে।

খ. চুক্তির শর্তানুযায়ী কোনো অংশীদার যে কোনো সময় অন্য অংশীদারদের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মুশারাকার বিলোপ ঘটাতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে অথবা কোনো অংশীদার বিকৃত মস্তিষ্ক, উন্মাদ, পাগল, কাণ্ডজ্ঞানহীন বা এ রকম হলে এবং কারবার পরিচালনায় অযোগ্য বিবেচিত হলে মুশারাকা কারবারের বিলুপ্তি ঘটে।

ঘ. যদি কোনো অংশীদার কারবারের বিলোপসাধন চায় যখন অন্যরা কারবার চালু রাখার পক্ষপাতি, তখন পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কারবার চালু রাখা যেতে পারে।

মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যে পার্থক্য

মুশারাকা	মুদারাবা
১. সকল অংশীদার মূলধন যোগান দেয়।	১. শুধু সাহিব আল-মাল মূলধন যোগান দেয়।
২. সকল অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।	২. শুধু মুদারির কর্তক কারবার পরিচালিত হয়। সাহিব আল-মালের কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের কোনো অধিকার নেই।
৩. সকল অংশীদার মূলধন অনুপাতে লোকসান বহন করে।	৩. সাধারণত মুদারিব কোনো আর্থিক ক্ষতি বহন করে না। কারবারের যাবতীয় লোকসান একমাত্র সাহিব আল-মাল বহন করে। মুদারিবের শুধু তার শ্রম ও সময় নষ্ট হয়। তবে মুদারিবের অবহেলা, অসদাচরণ, অব্যবস্থাপনা, চুক্তি ভঙ্গ প্রভৃতি কারণে লোকসান হলে তা মুদারিবকেই বহন করতে হয়।
৪. সাধারণ অংশীদারগণের দায় সীমাহীন। এ জন্য সম্পদের চেয়ে অতিরিক্ত দায় প্রত্যেক অংশীদারকে আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়। তবে যদি সকল অংশীদার একমত হয় যে, কোনো অংশীদার কোনো ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না, তবে অতিরিক্ত দায় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা অংশীদারকেই বহন করতে হয়।	৪. যদি সাহিব আল-মাল মুদারিবকে তার পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি না দেয় তবে তার (সাহিব আল-মাল-এর) দায় তার মূলধনের মধ্যে সীমিত থাকে।
৫. মুশারাকার সকল সম্পদ অংশীদারগণের যৌথ মালিকানায় পরিগণিত হয়। সুতরাং লাভ না হলেও সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির (যদি হয়) সুবিধা সকলে পেয়ে থাকে।	৫. মুদারিব শুধু ব্যবসায়ে লাভের ভাগীদার, তাই সে সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির কোনো অংশ পায় না। এটা সাহিব আল-মালের প্রাপ্য।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল্-মিল্ক্

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল মিলক একটি বিশেষ ধরনের চুক্তি। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে শিরকাত, ইজারা এবং বিক্রয় এই তিনটি পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছে। আমরা এখন উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

শিরকাত-উল্-মিল্ক্

শিরকাত শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব। শিরকাত-উল-মিলক এর অর্থ মালিকানায় অংশীদারিত্ব। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে যৌথ মালিকানা অর্জনের নিমিত্তে মূলধন বিনিয়োগ করে কোনো সম্পদ অর্জন করে তখন তাকে শিরকাত উল মিলক বলে। এ ধরনের কারবারে সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হয় এবং লোকসান হলে তা তারা মূলধন অনুপাতে বহন করে।

ইজারা

ইজারা শব্দটি আরবী শব্দ اجر (Ajr) বা اجرة (Ujrat) থেকে এসেছে। যার অর্থ প্রতিদান, আয়, মজুরি, ভাড়া ইত্যাদি। ইজারা এমন এক ধরনের চুক্তি, যেখানে ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা দুটি পক্ষ থাকে। এ পদ্ধতিতে ভাড়াগ্রহীতা সুনির্দিষ্ট ভাড়া প্রদানপূর্বক ভাড়াদাতার মালিকানাধীন সম্পদ থেকে সেবা/সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ এটা একটি ভাড়া চুক্তি, যেখানে ভাড়াদাতার মালিকানাধীন কোনো নির্দিষ্ট সম্পদ স্থিরকৃত মেয়াদে নির্ধারিত ভাড়ায় গ্রহীতার নিকট ভাড়া দেয়া হয়।

বিক্রয়

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে নির্দিষ্ট মালামাল বা সম্পদের মালিকানা ও দখল বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয় তাকে বিক্রয় বলে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিলক পদ্ধতির বিনিয়োগের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া যায় :

যে পদ্ধতিতে দুটি পক্ষ সম অথবা অসম মূলধন যোগান দিয়ে কোনো সম্পত্তির মালিকানা অর্জনপূর্বক পরস্পর সম্মতিক্রমে ভাড়া ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে একপক্ষের অংশ অন্যপক্ষের নিকট ভাড়া দেয় ও বিক্রয় করে, তাকে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল্-মিলক্ বলে। অর্থাৎ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল্-মিলক্ পদ্ধতিতে পক্ষদ্বয় (ব্যাংক এবং বিনিয়োগ গ্রাহক) সম অথবা অসম পরিমাণ মূলধন যোগান দিয়ে কোনো সম্পদ ক্রয়পূর্বক তার উপর যৌথ মালিকানা অর্জন করে এবং সম্পদ থেকে অর্জিত অনুপাতে বহন করে। সম্পদের উপর কোনো অংশীদার (ব্যাংক)-এর ভাড়া দেয়া হয়। সবশেষে ব্যাংক তার অংশ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কিস্তিতে অথবা কিছু কিছু করে পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। ভাড়ার পরিমাণ কমতে থাকে। এক সময় গ্রাহক সম্পদের পুরো মালিক হয়ে যায় এবং তখন আর ব্যাংক কোনো ভাড়া পায় না।

এভাবে দেখা যাচ্ছে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত উল মিলক তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা :

১. যৌথ মালিকানায় ক্রয়।

২. ভাড়া প্রদান/গ্রহণ।

৩. বিক্রয় এবং মালিকানা হস্তান্তর।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত উল মিলক পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. এ পদ্ধতিরতে চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ অনুপাতে পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যাংক এবং বিনিয়োগ গ্রাহক যৌথ মালিকানায় নির্ধারিত সম্পদ ক্রয় করে।

Dhaka University Institutional Repository

২. অংশীদারগণ সম্মত হলে ক্রয়কৃত সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন তাদের যে কোনো একজন অথবা তৃতীয় পক্ষের নামে করা যায়।

৩. এ পদ্ধতিতে সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভাড়া দেয়া হয়।

৪. চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় ব্যাংক গ্রাহকের কাছে সম্পদ বিক্রি করে না অথবা গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে সম্পদ ক্রয় করে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ পর্যায়ক্রমে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করার অঙ্গীকার করে এবং গ্রাহকও ঐ সম্পদ নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

৫. গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অংশ কিস্তিতে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমশ কমতে থাকে এবং গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় তার পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হয়।

৬. ব্যাংকের মালিকানাধীন কোনো অংশ গ্রাহকের নিকট বিক্রি এবং হস্তান্তর হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক ঐ অংশের কোনো ভাড়া পায় না।

৭. মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও গ্রাহক ব্যাংকের অংশের পুরো টাকা শোধ করে মালের পূর্ণ মালিকানা পেতে পারেন।

৮. গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকে।

৯. চুক্তির শর্তানুসারে গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং তা বিক্রি ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয় করতে পারে।

১০. ব্যাংক এবং গ্রাহক তাদের স্ব-স্ব পুঁজি অনুপাত সম্পদের ঝুঁকি বহন করে।

১১. গ্রাহক এক্ষেত্রে ট্রাস্টির ভূমিকা পালন করে এবং সম্পদটি ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

১২. ব্যবহারকারী হিসেবে সম্পদটি ভালো এবং সচল অবস্থায় রাখার দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের।

১৩. ব্যাংকের লিখিত অনুমতি ছাড়া গ্রাহক সম্পদের কোনো পরিবর্তন, স্থানান্তর ইত্যাদি করতে পারে না।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত উল মিল্‌ক্-এর শর্তাবলী

১. যৌথ মালিকানা অর্জিত সম্পদ এবং তাদের বিনিময়ে ব্যবহৃত সম্পদের সুবিধা/সেবা পৃথকভাবে চিহ্নিত হতে হবে।

২. সম্পদ অবশ্যই পচনশীল হবে না বা ব্যবহারের ফলে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে না। অর্থাৎ সম্পদি হতে হবে Non-Fungible, যা একাধিকাবার ব্যবহার করা যাবে।

৩. যে সকল সম্পদের দখল হস্তান্তরযোগ্য নয় তা ভাড়া দেয়া যাবে না। যৌথ মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তির অংশীদার তার অংশ অন্য কোনো অংশীদার বা ব্যক্তির নিকট ভাড়া দিতে পারে।

৪. ভাড়া গ্রহণকারী চুক্তির শর্তানুসারে সম্পদ ব্যবহার করবে। চুক্তিতে এ ব্যাপারে কোনো কিছুর উল্লেখ না থাকলে প্রচলিত প্রথা বা নিয়মানুযায়ী সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সম্পদ এবং তার থেকে প্রাপ্ত সুবিধা বা সেবা ইসলামী শরীয়াহর নীতি অনুযায়ী হালাল হতে হবে।

৬. ভাড়ার মেয়াদের শুরুতে সম্পদটি ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় এর দখল ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে অর্পণ করতে হবে।

৭. চুক্তির মেয়াদ এবং প্রতি একক সময়ের ভাড়ার পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৮. চুক্তি যখনই হোক না কেন, সম্পদের দখল হস্তান্তরের দিন থেকে ভাড়া গণনা শুরু হবে।

৯. চুক্তির শর্তানুযায়ী ভাড়া অগ্রিম, বিলম্বে অথবা কিস্তিতে পরিশোধিত হতে পারে।

১০. চুক্তির মেয়াদ অথবা ভাড়ার পরিমাণ অথবা উভয়ই পারস্পরিক সম্পতিতে পুনর্নির্ধারিত হতে হবে।

১১. ভাড়াগ্রহীতার কাছে সম্পদটি একটি ট্রাস্ট সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই সম্পদটি তার অবহেলা, অব্যস্থাপনা ইত্যাদির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস না হলে তার জন্য ভাড়াগ্রহীতা দায়ী হবে না।

১২. সম্পদের মৌলিক মেরামত সংরক্ষণ বা কোনো স্থায়ী যন্ত্রাংশের পরিবর্তন চুক্তি অনুযায়ী যে কেউ অথবা চুক্তির অবর্তমানে মালিক বা ভাড়া প্রদানকারী বহন করবে। তবে সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ভাড়া গ্রহণকারী পক্ষ বহন করবে।

১৩. চুক্তি অথবা প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী না হলে ভাড়াগ্রহীতা সম্পদটি অন্য কারো কাছে পুনরায় ভাড়া প্রদান করতে পারে।

১৪. ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ভাড়াগ্রহীতা সম্পদটি মালিকের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য। পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে নতুন চুক্তিও হতে পারে অথবা ভাড়া গ্রহণকারী মালিকের কাছ থেকে সম্মত দামে সম্পদটি ক্রয় করে নিতে পারে।

১৫. সম্পদটি ধ্বংস বা বিলীন হয়ে না গেলে কোনো পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

১৬. যদি সম্পদটি প্রাকৃতিক কোনো কারণে ধ্বংস অথবা কার্য-অনুপযোগী হয়ে যায় এবং মালিক যদি একই ধরনের একটি সম্পদ দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করতে চায় তবে চুক্তি বাতিল হবে না।

১৭. চুক্তির মেয়াদের মধ্যে মালিক ভাড়াগ্রহীতার কাছে আংশিকভাবে অথবা একত্রে তার অংশ বিক্রি করতে পারে। যখনই আংশিক অথবা সম্পূর্ণ সম্পদটি বিক্রি হয়ে যাবে তখনই ভাড়া চুক্তিটি ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে।

১৮. ভাড়া গ্রহণকারী চুক্তির মেয়াদের মধ্যে সম্পদটি পর্যায়ক্রমে আংশিকভাবে অথবা মেয়াদান্তে ক্রয় করার এবং মালিকও এভাবে বিক্রি করার অঙ্গীকার করতে পারে।

১৯. ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভাড়াসহ ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার থেকে স্বতন্ত্র ভাড়া হচ্ছে সম্পদের সেবা বা সুবিধা ব্যবহাররের মূল্য, তাই ভাড়ার পরিমাণকে কখনও দামের সাথে এক করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতি

ইসলামী অর্থব্যবস্থার যাবতীয় কার্যকলাপ ইসলামী শরীয়াহর নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থার ন্যায় ইসলামী অর্থব্যবস্থা কোনো ঋণ বা আগাম প্রদান করে না। কেননা প্রচলিত ঋণ বা আগামের সাথে সুদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা ঋণ ও আগামের পরিবর্তে শরীয়াহর নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিনিয়োগ কার্যক্রম বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা তার বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে সকল নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি অনুসরণ করে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

গ্রাহক নির্বাচন

সঠিক বিনিয়োগগ্রাহক নির্বাচনের ওপর ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই ভালো বিনিয়োগগ্রাহক নির্বাচন ইসলামী অর্থব্যবস্থার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বশর্ত। প্রচলিত পদ্ধতিতে যে ঋণ বা আগাম দেয়া হয় তা যথাসময়ে পরিশোধিত না হলে তার ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপিত হতে থাকে এবং তা ঐ ব্যক্তির আয় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিনিয়োগ পদ্ধতি ও আয়ের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বিনিয়োগ যথাসময়ে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত না হলে চুক্তির অতিরিক্ত কোনো অর্থ গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করা যায় না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের সাথে লাভ-ক্ষতির ভাগিদার হয়ে থাকে। কাজেই গ্রাহক নির্বাচন সঠিক না হলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গ্রাহক নির্বাচনের সময় যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ :

ক. প্রথমেই গ্রাহকের যে সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হয় তা হচ্ছে :

- শরীয়াহর প্রতি অনুগত (Adherance to Shariah) : গ্রাহককে অবশ্যই শরীয়াহর নিয়ম নীতি জানা এবং তা যথাযথভাবে পরিপালনের সদিচ্ছা থাকতে হবে।
- দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (Commitment) : প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি পালনে গ্রাহককে অবশ্যই দৃঢ় হতে হবে।
- সক্ষমতা (Ability) : তাকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সব দিক দিয়ে সক্ষম হতে হবে।
- সম্ভাবনা (Potentiality) : তাকে অবশ্যই ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হতে হবে।
- দক্ষতা (Expertise & Efficiency) : সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা থাকতে হবে।
- অকৃত্রিমতা (Genuinnes) : তাকে সব দিক দিয়ে অকৃত্রিম হতে হবে। কোনো কিছু বাড়িয়ে বলা বা করা অথবা চেপে যাওয়া স্বভাব থেকে দূরে থাকতে হবে।

খ. গ্রাহক নির্বাচন দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত, গ্রাহক তার নিজস্ব প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের কাছে আসে। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য গ্রাহকের কাছে যেতে পারে।

গ. উপরোক্ত দুটি পদ্ধতির উভয় ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে তার যোগ্যতা ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা, কাঙ্খিত বিনিয়োগ, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করতে হবে। ইসলামী শরীয়াহর নীতি অনুযায়ী যে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাহকের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিটি বাছাই করে ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহককে বিস্তারিত ধারণা দিতে হবে, যাতে ঐ পদ্ধতির আওতায় বিনিয়োগকালে কোনরূপ সমস্যা এবং ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়।

ঘ. বিনিয়োগ নিতে আগ্রহী প্রত্যেক গ্রাহকের নামে সাধারণত একটি আলওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব থাকা জরুরী। তবে কিছু কিছু বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী সঞ্চয়ী হিসাব থাকলেও চলে। যদি ইতোপূর্বে গ্রাহকের নামে এ ধরনের উপযোগী কোনো হিসাব খোলা না থাকে তবে গ্রাহককে যথাযথ পরিচিতিসহ একটি হিসাব খোলার পরামর্শ দিতে হবে। গ্রাহককে একটি সময় পর্যন্ত (সাধারণত ছয় মাস) ঐ হিসাবে সন্তোষজনক যৌক্তিক লেনদেন করতে হয়। গ্রাহকের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের সময় অন্যান্য বিষয়ের সাথে হিসেবের যৌক্তিক লেনদেনসমূহও বিবেচনায় আনা হয়। গ্রাহকরা অনেক সময় অধিক লেনদেন দেখানোর জন্য অযথা অর্থ উত্তোলন ও জমা দিয়ে থাকেন। যৌক্তিক লেনদেন বিবেচনার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এবং সনাক্ত করা গেলে উক্ত অযথা লেনদেন বিবেচনায় আনা হয় না।

ঙ. পুরাতন ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তাদের অতীত সাফল্য বিবেচনায় আনা হয়। লেনদেনকারী অন্যান্য ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীদের সাথে সুসম্পর্ক, খ্যাতি ইত্যাদিও বিবেচিত হয়ে থাকে।

চ. গ্রাহক নির্বাচনের সময় ইসলামী শরীয়াহর নীতি, প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ নীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনাবলী, সরকারী নীতি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। গ্রাহক বা তার ব্যবসা/শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উপরোক্ত কোনো নীতির পরিপন্থী কিছু দেয়া গেলে তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গ্রাহককে পরামর্শ দেয়া হয় এবং সর্বোপরি কোনো অবস্থাতেই তা পরিহার করা সম্ভব না হলে সৌজন্যতার সাথে তার কাছ থেকে সরে আসতে হয়।

এ ছাড়া যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হয় সেগুলো হলো :

২. যথাযথ পদ্ধতিতে গ্রাহক নির্বাচনের পর গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র নিতে হয়। বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি ও প্রকল্পের জন্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমন্বিত আবেদনপত্র বিতরণ করে থাকে।

৩. গ্রাহকের কাজকে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন করা।

৪. বিনিয়োগ (Sanction) মঞ্জুরীর জন্য প্রতিষ্ঠানের পর্ষদ বা ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত বিনিয়োগ মঞ্জুরীর অর্পিত ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. বিনিয়োগ প্রদানের প্রয়োজনীয় দলিলপত্র (Documentation) সম্পাদন করা।

বিনিয়োগ চুক্তিপত্র যেমন– মুরাবাহা চুক্তিপত্র, মুদারাবা চুক্তিপত্র, মুশারাকা চুক্তিপত্র, ডিমান্ড প্রমিসরি নোট ইত্যাদি।

বিশেষ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ : গ্রাহক ও সেবা

যারা ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারে তারাই ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারে। তবুও কতিপয় বিশেষ গ্রাহকের ক্ষেত্রে জটিলতা ও নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে ব্যাংকারদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নিম্নে এ ধরনের কিছু গ্রাহক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রাপ্ত বয়স্ক গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান

কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাকে বিনিয়োগ দেয়া ব্যাংকের জন্য নিরাপদ নয়। কারণ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি আইনসঙ্গত কোন চুক্তি করতে পারে না বিধায় প্রয়োজনে ব্যাংক তার পাওনা আদায়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি কোন যৌথ হিসাব বা অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগ দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কারণ ব্যাংক সেক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে।

যৌথ হিসাবে বিনিয়োগ প্রদান

যৌথ হিসাবে যদি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়, তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাকে বা তাদেরকে ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নেয়ারও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কাজেই যৌথ হিসাবে বিনিয়োগ নিতে হলে ঐ হিসাবের সকলকে যৌথভাবে ব্যাংকের কাছে আবেদন করতে হবে। এমতাবস্থায় তারা সবাই ঐ দেনার জন্য দায়ী থাকবে এবং কেউ মারা গেলে তার উত্তরাধীকারীগণও দায়ী থাকবে।

ফার্মের নামে বিনিয়োগ প্রদান

ফার্মের নামে বিনিয়োগ দেয়া হলে ফার্মের মালিক ব্যক্তি হিসাবে চার্জ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করতে পারবেন না; বরং মালিক হিসেবে চার্জ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করবেন। তার স্বাক্ষরের সাথে তিনি কোন্ ক্ষমতা বলে স্বাক্ষর করলেন, তা উল্লেখ করে সীল ব্যবহার করতে হবে। ফার্মের নামে বিনিয়োগের অর্থ ফার্মের মালিকের ব্যক্তিগত হিসাবে লেনদেন করা যাবে না।

অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগ প্রদান

অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক কারবারের পার্টনারশীপ দলীল থেকে দেখে নেবে যে, বিনিয়োগ নেয়ার ব্যাপারে দলীলে কি বলা আছে। বিনিয়োগের আবেদনপত্রে এবং চার্জ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করার ক্ষমতাপত্রে সকল অংশীদারের স্বাক্ষর থাকতে হবে। অংশীদারী কারবারের প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে সকল দেনার জন্য দায়ী থাকে বিধা, ব্যাংক প্রত্যেকের স্বাক্ষর নেবে। অংশীদারী করবারের কোন সম্পদ ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা বা কারবারের পক্ষ থেকে তৃতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষে গ্যারান্টি দেয়ার কোন ক্ষমতা কোন অংশীদারের নেই। কাজেই অংশীদারী কারবারের সম্পত্তি বন্ধক নিতে হলে বা কারবারের পক্ষ থেকে কোন গ্যারান্টি নিতে হলে সকল অংশীদারের পক্ষ থেকে ম্যান্ডেট বা ক্ষমতানামা থাকতে হবে।

লিমিটেড কোম্পানীর নামে বিনিয়োগ প্রদান

কোন কোম্পানীর নামে বিনিয়োগ দেয়ার পূর্বে বিনিয়োগ নেয়ার ব্যাপারে কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স-এর রেজুলেশন নিতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোম্পানী এবং কোম্পানীর মালিক দুটি আলাদা সত্তা। এ কারণে লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যাংক তার পাওনা আদায়ের জন্য কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করলেও কেবল কোম্পানীর সম্পদের উপর তা কার্যকরী হবে, মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পদের উপর নয়। এ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য ব্যাংকারগণ বিনিয়োগ দেয়ার সময়, মালিকদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিয়ে থাকে, যাতে প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে ব্যাংকের পাওনা আদায় করা যায়। কোম্পানী আইন ১৯১৩-এর ১০৯ ধারামতে কোম্পানীর কোন সম্পদ বন্ধক দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হলে বা কোম্পানীর সম্পদের উপর কোন চার্জ সৃষ্টি করা হলে, তা অবশ্যই ২১ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর কাছে রেজিস্ট্রি করতে হবে। অপরদিকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে যিনি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করবেন, কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাকে সে ব্যাপারে ক্ষমতা দেয়া আছে কি না তাও কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স-এর রেজুলেশন থেকে নিশ্চিত হতে হবে।

অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ প্রদান

অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেমন– স্কুল, কলেজ, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ দেয়া ব্যাংকের জন্য ঠিক নয়। তবে বিনিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির রেজুলেশন থাকলে এবং ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা বন্ধকের ব্যবস্থা থাকলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ সম্পূর্ণ অস্থায়ী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিনিয়োগ নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের আইনগত কোন ক্ষমতা নেই।

সমবায় সমিতিকে বিনিয়োগ প্রদান

সমবায় সমিতি তার সদস্যদের বাইরে অন্য কারো কাছ থেকে সর্বোচ্চ কত টাকা বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারবে, তা তার বাৎসরিক সভায় নির্ধারিত হয় এবং তা কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। কাজেই সমবায় সমিতিকে বিনিয়োগ দিতে হলে এসব বিষয় নিশ্চিত হওয়া দরকার। সমবায় সমিতির বিনিয়োগ সন্তোষজনক বন্ধক এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ছাড়া দেয়া ঠিক নয়।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রচলিত বিনিয়োগের পদ্ধতিগুলোর পাশাপাশি এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা এখন সময়ের দাবী। বাংলাদেশে এখন যে যৎসামান্য অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে তার মাধ্যমেও নতুন নতুন বিনিয়োগ পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে একটি নতুন দিক-দর্শন দেয়া একান্তই প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : সাত
মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলাম দারিদ্র ও বুভুক্ষার বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছে এবং তা খতম করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে যাতে এই সমস্যা মানুষের ঈমান-আকীদা, চরিত্র, পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে। এ জন্যই ইসলাম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মৌলিক কতিপয় প্রয়োজন পূরণ আবশ্যিক করে দিয়েছে। খাদ্য, বাসস্থান, শীত-গ্রীষ্মের পোশাক এবং সে যদি কোন কাজে অভিজ্ঞ হতে চায় তাহলে সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রভৃতি সংগ্রহ করে দিতে হবে। যদি সে কোন হাতের কাজ জানে তাহলে তাকে তার হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি সে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে তাহলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। ইসলাম চায় সমাজের প্রত্যেক সদস্যই তার অবস্থা অনুযায়ী জীবনের মান-মর্যাদা পাক। এতে আল্লাহর ফরজ আদায়ে এবং জীবনের দায়িত্ব পালনে তার জন্য সহযোগিতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়ন

ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক মান প্রত্যেক মানুষ কি করে পাবে? এবং এ ব্যাপারে ইসলাম কি কি মাধ্যম অবলম্বন করেছে? ইসলাম কিভাবে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। মানব সম্পদকে কিভাবে উন্নয়নের হাতিয়ার বানানো যায়– এইসব প্রশ্নের জবাব হলো, ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত মাধ্যমসমূহ অবলম্বন করেছে :

সার্বক্ষণিক কাজে সময় ও চিন্তা বিনিয়োগ

ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে দাবি করা হয় যে, সে কোন না কোন কাজ করুক এবং তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, সে বিস্তৃত বিশাল জমিনে চলাফেরা করুক এবং আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ করুক। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন :

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه- واليه النشور-

সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য ভূতলকে অধীন বানিয়ে রেখেছেন, তোমরা চলাচল কর তার বক্ষের ওপর এবং ভক্ষণ কর আল্লাহর রিযিক।[১]

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা মোকাবিলার প্রথম হাতিয়ার হলো কাজ। সম্পদ অর্জনের প্রথম মাধ্যম হলো কাজ এবং এই জমিনকে আবাদ করার জন্য কাজই হলো মৌলিক বস্তু। এই জমিনে মানুষকে খেলাফতের মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং একে আবাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকে সালেহ (আ.) নিজের জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন :

يقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره- هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها-

হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ প্রভু নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে পয়দা করেছেন আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২]

---

১. সূরা মূলক : ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যে কোন ধরনের কাজের দরজা খোলা রেখেছে। যে ব্যক্তি যে কাজে যোগ্য সেই কাজই সে অবলম্বন করতে পারে। কোন নির্দিষ্ট কাজ তার ওপর ফরজ নয়। কিন্তু সমাজের মঙ্গলে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হলে তাকে তা করতে হবে। ইসলাম অবশ্যই সেই সব কাজ অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকারক।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাধীন কোন মেহনতী মানুষের যথাযথ শ্রমের মূল্য এবং প্রচেষ্টার ফল থেকে মাহরুম রাখা যায় না বরং মজুরের পারিশ্রমিক তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করে দেওয়া হয়। কেননা যদি তার পারিশ্রমিক দেয়া না হয় তাহলে তার ওপর জুলুম করা হবে। আর ইসলামে জুলুম সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

কোন মেহনতী মানুষ হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদের মাধ্যমে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও আসবাবপত্র ক্রয় এবং জীবনের মান বৃদ্ধি করতে পারে অথবা অর্জিত সম্পদ দিয়ে রোগ ও বার্ধক্যের সময় উপকৃত হতে পারে অথবা তার সন্তান-সন্ততি এবং উত্তরাধিকাররা তাঁর মৃত্যুর পর ফায়দা হাসিল করতে পারে। ইসলামী ব্যবস্থায় এ সবই বৈধ এবং এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ইবাদতের স্বার্থে কাজ করা

কিছু লোক কোন কাজ করে না, আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য তারা দুনিয়ার কাজ-কাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বলে, কোরআন মজিদেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন :

وما خلقن الجن والانس الا ليعبدون-

আমি জ্বীন ও ইনসানকে দুনিয়ায় শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদাতের জন্য দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলে প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইবাদত ছেড়ে অন্য কোন কাজ করা কোনক্রমেই জায়েজ নয় বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

এই সব মানুষ দুনিয়া ত্যাগ প্রসঙ্গে নবী করিম (সা:)-এর শিক্ষাসমূহ থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়েছে। তিনি ফরমিয়েছেন, দুনিয়ার কোন কাজ সঠিক নিয়তে এবং ইসলামী নির্দেশাবলীর প্রতি খেয়াল রেখে আনজাম দেওয়া হলে সেই কাজ স্বয়ং ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ যদি এই চিন্তায় জীবিকার তালাশে বের হয় যে, সে ধন-সম্পদহাসিল করে নিজের এবং নিজের সন্তান-সন্তানাদির ভরণ পোষণ করবে, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল করবে অথবা ভালো কাজ এবং আল্লাহ্‌র পথে তার কালামকে বুলন্দ করার জন্য ব্যয় করবে-তাহলে আল্লাহ্‌র পথে এই কাজ এক ধরনের জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। এ জন্য আল্লাহ্ পাক জীবিকা অন্বেষণ উপলক্ষে যমিনের ওপর চলাফেরা ও জিহাদ ফি সাবিল্লিাহকে এই আয়াতে একত্র করেছেন :

واخرون يقاتلون فى سبيل الله-

কিছু লোক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সিদ্ধান্তে বিদেশ যাত্রা করে; আর কিছু লোক আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে।[৩]

তিরমিজী শরীফে হজরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবী করিম (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের পরে আমাদের নিকট মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং রিযিকের

---

২. সূরা হুদ : ৬১।

৩. সূরা মুযাম্মিল : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধানে ব্যয় করা। এই কথা বলে তিনি উপরে বর্ণিত আয়াত তেলাওয়াত করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা:) ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দানের জন্য বলেছেন, 'একজন সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আম্বিয়া, ছিদ্দিকীন ও শহীদের সাথী হবেন।'[৪]

কৃষি কাজে তিনি এভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, 'কোন মুসলমান যখন কোন কিছুর চাষ করে অথবা কোন চারা লাগায়, অতঃপর সেই ফসল থেকে পাখি, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে সেই মুসলমানের তরফ থেকে তা সাদকা হয়ে যায়।'[৫]

শিল্প ও বাণিজ্যে উৎসাহ প্রসঙ্গে নবী করিম (সা:) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি নিজের হাতে কামাই করে খাওয়া থেকে ভালো খাবার কখনই খায় না।' যে ব্যক্তি হালাল রুজির তালাশে ক্লান্ত হয়ে রাত কাটালো, সে যেন মাগফিরাতে পূর্ণ হয়ে রাত কাটালো।

ইমাম ইব্রাহিম নখরী (রাঃ)-কে এক বার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সে-সত্যবাদী ব্যবসায়ী না সর্বদা ইবাদতকারী। তিনি বলেছিলেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী। কেননা মাপ-জোখের ও লেনদেনের সময় শয়তান তার কাছ এসে বিপথগামী করার অপচেষ্টা চালায় আর সে শয়তানের সাথে জিহাদ করে।

যে কোন পেশাকেই উৎসাহের সাথে গ্রহণ

কিছু লোক বিশেষ কোন কাজ করতে চায় না। কেননা এতে সে লজ্জা ও অপমানিত বোধ করে। যেমন অনেক আরব কোন পেশা অথবা হস্তশিল্পকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। এমন কি একজন আরবী কবি তার ঋণদাতাকে গালি দিয়ে বলতো যে, তার বাপ-দাদাদের মধ্যে একজন তো কামার ছিল। কামার হওয়া যেন লজ্জাজনক এবং অপমানকর ব্যাপার। কিছু লোক এমনও রয়েছে যে, যারা অবজ্ঞার চোখে দেখা মেহনতমূলক পেশার চেয়ে অন্যের কাছে হাত পাতাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। ইসলাম এইসব ভুল ধ্যান-ধারণার কঠোর প্রতিবাদ করে কাজ এবং হস্তশিল্পের বিশেষ মর্যাদা ও মূল্য দেয়। বেকার থাকা এবং অন্যের ঘাড়ে চেপে থাকাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল পদ্ধতিতে রুজি-কামাই করা অত্যন্ত মর্যাদাকর ও শরীফ কাজ-অন্যরা তা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলেও।

বুখারী শরীফে যুবায়ের বিন আওয়াম থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে যে, নবী করিম (সা:) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি রশি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি খোঁজ করে বোঝা বেঁধে বাজারে গিয়ে বিক্রয় করে এবং আল্লাহ্ তাকে বেইজ্জতী হওয়া থেকে বাঁচান। মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে এই কাজ তার জন্য অনেক উত্তম। কেননা যার কাছে হাত পাতা হবে সে তাকে কিছু দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে।' এই হাদিস থেকে পরিষ্কার হয় যে, কাজ যত কঠিনই হোক এবং তা থেকে উপকার যত কমই হোক না কেন, বেকার থাকা ও মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে অনেক ভাল।

বুখারী শরীফের একটি হাদিসে আছে নবী করিম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্পাক এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি বকরী চরাননি। সাহাবারা আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসুল আপনিও কি? রাসুল (সা:) বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও কতিপয় কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরিয়েছি।'

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, দাউদ (আ.) যুদ্ধের পোশাক প্রস্তুতকারী ছিলেন। আদম (আ.) কৃষক ছিলেন। নূহ (আ.) সুতার ছিলেন। ইদরিস (আ.) ছিলেন দরজী। মুসা (আ.) ছিলেন রাখাল।[৬]

---

৪. বুখারী।

৫. বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাসের বড় বড় ইমাম এবং দুনিয়াখ্যাত অমর আলেমদের অধিকাংশই বাপ-দাদাদের বংশ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেননি, বরং তাদের বাপ-দাদাদের জীবিকার পেশার মাধ্যমেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এটাকে ইসলামী সমাজে কোনোমেই খুঁত হিসেবে ধরা হয়নি। অধিকাংশ আলেম ও ইমাম লিখিত পুস্তকে তাদের পেশার উপাধিসম্বলিত নাম উল্লেখিত হয়েছে।

দূর দেশ হলেও কাজের স্বার্থে সফর

কিছু লোক আছে যারা নিজের শহর অথবা দেশ ও জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করতে পারে না। যেখানে তাদের আপনজন ও বন্ধু-বান্ধব রয়েছে সেখানে কাজ না পাওয়ার কারণে তারা কাজও করে না। আবার কাজের জন্য স্বদেশ অথবা নিজের শহর ছেড়ে বাইরেও যেতে চায় না। তারা স্বদেশে বেকার থাকাকে অন্য এলাকার বিস্তৃত রিযিক ও সম্পদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

এ ধরনের মানুষকে ইসলাম হিজরতের উৎসাহ দিয়েছে এবং জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। উপরন্তু এটাও তাদের কাছে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যমীন অত্যন্ত প্রশস্ত এবং মানুষের রিযিক কোন এক স্থানে সীমিত নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি জীবিকার অন্বেষণে নিজের সন্তান-সন্ততি ও দেশ ছেড়ে দূরে গেছে এবং এই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে তার জন্মস্থান থেকে শুরু করে দাফনের স্থান পর্যন্ত প্রশস্ত জায়গা বেহেশতে দেওয়া হবে। রাসুলে খোদা (সা:) বলেছেন : 'সফর কর এবং সম্পদশালী হয়ে যাও।'[৭]

আল্লাহ্ পাক বলেছেন :

ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مرغما كثيرا و سعة-

> বস্তুত আল্লাহ্‌র পথে যে-ই হিজরত করবে যমীনে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সে অনেক জায়গা এবং দিন যাপনের জন্য বিরাট অবকাশ পাবে।[৮]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেছেন, মদীনার এক ব্যক্তি মারা গেল। আল্লাহ্‌র রাসুল (সা.) তার নামাজে জানাজা পড়লেন এবং বললেন, 'এই ব্যক্তি যদি মদীনায় না মরে অন্য কোথাও মরতো তাহলে কতই না ভালো হতো।' সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! কেন?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি বিদেশ-বিভুঁইয়ে মারা যায় তার জন্য তার জন্মস্থান থেকে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত স্থানের সমান বেহেশতে স্থান হবে।' এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনায় এক ব্যক্তির কবরের কাছে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'এই ব্যক্তি যদি বিদেশ বিভুঁইয়ে মারা যেত তাহলে কতইনা ভালো হতো।' এসব হাদিস থেকে উৎসাহ পেয়ে প্রথম যুগে মুসলমানরা দূর-দূরান্ত এলাকায় বেরিয়ে পড়তেন। তারা সেখানে দ্বীনের তাবলীগের ফরজ আঞ্জাম দিতেন। রিযকের অন্বেষণ, জ্ঞান অর্জন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতেন।

পরমুখাপেক্ষিতাকে উপেক্ষা করা

কিছু লোক আছে যারা কোন পরিশ্রম করে না। কোন কাজ অথবা জীবিকার অন্বেষণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সফর থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদের সাদকা-খায়রাত ও যাকাত ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে

---

৬. মুসতাদরাক হাকিম।

৭. তাবরানী।

৮. আন নিসা : ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। অন্যের কাছে ভিক্ষা চাওয়াকে নিজের জন্য মুবাহ মনে করে। এই সওয়াল বা ভিক্ষা চাওয়ায় বেইজ্জতী এবং জিল্লতী থাকা সত্ত্বেও তারা এটা করে। শারীরিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অন্যের কাছে হাত পাততে দ্বিধাবোধ করে না। মুসলিম দেশে এ ধরনের লোক বেশি পাওয়া যায়। বাদশাহ, আমীর ও বিত্তশালীদের চারপাশে ভিড়কারী তোষামুদেরাও এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সব লোকের ব্যাপারে ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যতক্ষণ তার শক্তি থাকবে এবং কামাই করার ক্ষমতা রাখবে সে কোন প্রকারেই যাকাত ও সাদকার হকদার হবে না। সুতরাং আবু দাউদ এবং নাসায়ীর কিতাবে বর্ণিত হাদিসে খোদার রাসুল (সা:) যাকাত প্রার্থনাকারী দু'ব্যক্তিকে বলেছিলেন, 'কোন ধনী এবং কোন তাগড়া ব্যক্তি আর উপার্জনশীল ব্যক্তির যাকাতের মালে কোন অংশ নেই।'

এইভাবে ইসলামে মানুষের কাছে অপ্রয়োজনে হাত পাতা (অর্থাৎ খায়রাত ও সাদকা যাঞ্ছা করা) থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হয়েছে। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) ফরমিয়েছেন, 'সব সময় মানুষের কাছে ভিক্ষা যাঞ্ছাকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার চেহারায় সামান্যতম গোশতও থাকবে না।' হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসে নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্যের কাছে অপ্রয়োজনে শুধু নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নওয়াল করে সে নিজের জন্য আগুনের অঙ্গার চায়। চাইলে সে অঙ্গার বেশিও করতে পারে আবার কমও করতে পারে।'

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী করিম (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাদকা, অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাকা এবং মানুষের কাছে হাত পাতা সম্পর্কে বলেন, : 'ওপরের হাত (প্রদানকারী) নিচের হাতের (গ্রহণকারী) চেয়ে উত্তম।' হযরত আবু হোরাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত গাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সকালে বের হয় এবং সাদকা দানের উদ্দেশ্যে ও মানুষের কাছে মুখাপেক্ষীহীন হওয়ার লক্ষ্যে, নিজের পিঠের ওপর জঙ্গল থেকে কাঠ বহন করে আনে। মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে এই কাজ উত্তম। মানুষের কাছে চাইলে দিতেও পারে, নাও পারে। এজন্য ওপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।' আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে-নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'বান্দাহ যেই অন্যের কাছে হাত পাতার দরজা খোলে আল্লাহ্ তার ওপর দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার দরজা খুলে দেন।' আয়েদ বিন আমর থেকে রাওয়াতেকৃত- এক ব্যক্তি নবী করিমের (সা.) খিদমতে হাজির হয়ে কিছু চাইলো এবং তিনি তাকে দিলেন। যখন সেই ব্যক্তি নিজের পা'কে দরজার চৌকাঠে রাখলো তখন নবী (সা.) বললেন, 'মানুষ যদি জানে যে, সওয়াল রায় কি ধরনের যিল্লতী এবং বেইজ্জতী রয়েছে তাহলে কেউ যেন কারো কাছে সওয়ালের উদ্দেশ্যে না যায়।' অবশ্যই দু'অবস্থায় সওয়াল করা বা হাত পাতা দোষের কিছু নয়। প্রথমত সমকালীন শাসনকর্তা অথবা এমন কোন ব্যক্তির কাছে হাতপাতা যাকে আল্লাহ্ সওয়ালকারীর অভিভাবক বানিয়েছে। দ্বিতীয় কোন কঠিন প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সওয়াল করা। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের সেই প্রত্যেক ব্যক্তির শাস্তি প্রদানের অধিকার রয়েছে : যে সুস্থ ও নাদুস নুদুস এবং উপার্জন করে খাওয়ার শক্তি রাখা সত্ত্বেও সমাজের বোঝা হয়ে থাকতে চায় এবং যে ভিক্ষা করাকে পেশা বানিয়ে নিয়েছে। যে ব্যক্তির যাকা গ্রহণ অবৈধ, সেও যদি তা গ্রহণের বৈধ বলে চিন্তা করে এবং বৈধ কোন ওজর ব্যতিরেকে ভিক্ষা করে। এমন সকল গুনাহর কাজ করে যাতে শরীয়ত কোন শাস্তির বিধান রাখেনি এবং কাফফারাও দেওয়া প্রয়োজন নেই- তবুও মুসলমান শাসক এইসব কাজ যারা করবে তাদেরকে অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষাবৃত্তি নয় কাজকে সম্মান প্রদর্শন করা

ইমাম গাযালী (রা:) নিজের লিখিত পুস্তক 'এহইয়াউ উলূমুদ্দীন'-এ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর আলোচনা প্রসঙ্গে রুজি-কামাইয়ের প্রশ্নে খারাপ পেশার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

> এমন কিছু পেশা রয়েছে যা করার জন্য প্রথমত কিছু মেহনত ও চেষ্টা ছাড়া কিছু শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কিছু লোক শৈশবকালে তা শেখায় গাফলতি করে থাকে অথবা অন্য কোন কারণে শিখতে পারে না। বস্তুত সে কোন শিল্প বা বাণিজ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে উপার্জন করতে পারে না। এইজন্য সে অন্যের পরিশ্রমের ফল খাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। এমনিভাবে দু'ধরনের বাজে বা নীচু পেশার জন্ম হয়। প্রথম, চুরি-ডাকাতি।
>
> দ্বিতীয় ভিক্ষার পেশা। সাধারণ মানুষ চোর ও ভিক্ষুক উভয়ের ব্যাপারেই সতর্ক থাকে এবং তাদের হাত থেকে নিজেদের সম্পদ বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং এই দুই গ্রুপ অন্যের সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের হিলা ও কৌশল অবলম্বনের ফন্দি-ফিকির করে। চোর-ডাকাতরা তো নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং নেতৃত্ব দিয়ে রাহাজানি করে। তাদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বিভিন্ন কৌশলে মাল লুট করে। আর ভিক্ষুকরাও অন্যের শ্রমলব্ধ সম্পদ লাভের চেষ্টা করে । তাদেরকে কিছু না দিয়ে অন্যের মত পরিশ্রম করতে বলা হলে তারা মানুষের সম্পদ লাভের বিভিন্নমুখী কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজের বেকারত্বের জন্য নানামুখী ওজর তালাশ করে। কিছু লোক নিজেদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে ধোকা দিয়ে অন্ধের এক দল সাজিয়ে ভিক্ষার নামে যাতে মানুষ তাদেরকে অক্ষম মনে করে কিছু দেয়। এমনও কিছু লোক আছে যারা নিজেদেরকে অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পাগল অথবা রুগ্ন বলে প্রকাশ করে যাতে মানুষের মধ্যে দয়ার আবেগ সৃষ্টি হয়ে তাদেরকে কিছু দেয়। এমনও কিছু আছে যারা মানুষকে আশ্চর্যান্বিত করার জন্য কিছু কাজ ও কথা শিখে নেয়। এই কথা ও কাজে প্রভাবান্বিত হয়ে মানুষ তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়। এমন কিছু কাজ আছে যার পারিশ্রমিক নেওয়া যায়। কিন্তু তাকে পারিশ্রমিক মনে করা হয় না। যেমন তাবিজ প্রদান ইত্যাদি কাজ। তাবিজ বিক্রেতারা শিশু ও অজ্ঞদেরকে ধোকা দিয়ে বলে যে, এই তাবিজ বিভিন্ন ধরনের রোগের ওষুধ। গণক ও ফুটপাতে দাঁড়িয়ে যারা বক্তৃতা করেন তারাও এই শ্রেণীভুক্ত। এইসব লোকের উদ্দেশ্য হলো-অন্যের অন্তরকে বিভিন্ন কৌশলে প্রভাবান্বিত করে তাদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া। চাওয়া ও ভিক্ষার হাত বাড়ানোর এই কৌশলের সংখ্যা হাজার দু' হাজারের মত হবে।

ইমাম গাযালী (রা:) চুরি ও ভিক্ষা উভয় ধিকৃত পেশা প্রসঙ্গে যে তথ্য প্রদান করেছেন তা নি:সন্দেহে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিষয়ের প্রতি গভীরতারই প্রমাণ করে।

সময় এবং শ্রমের বিনিয়োগে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

জীবিকা অনুসন্ধানে প্রচেষ্টা ও কাজ করতে না পারার শেষ শ্রেণীর লোক হলো তারা যারা কাজ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন চেষ্টা করতে পারে না। কেননা জীবিকার বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। এই অবস্থায় তাদের জন্য সবচেয়ে সহজ হলো নিজের এবং পরিবারের ভরণ পোষণের বোঝা সরকারের ওপর চাপিয়ে জীবিকা অন্বেষণের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা এবং নিজে বেকার বসে থেকে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটানো।[৯] কিন্তু ইসলাম এ ধরনের কোন ব্যক্তির কর্মপন্থায় উৎসাহ যোগায়নি, বরং ইসলাম সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর সাধারণভাবে এবং ক্ষমতাবান ও শাসকদের ওপর বিশেষভাবে এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, তারা যেন সেই ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী কোন কাজ তালাশ করে

---

৯. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আবদুল কাদের অনূ., *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা,* ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৯১, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

দেয় এবং জীবিকা অর্জনে তাকে সহযোগিতা করে। আনাস বিন মালেক (রা:) বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে : এক আনসারী নবী করিমের (সা:) খিদমতে হাজির হয়ে নিজের বেকারত্বের অভিযোগ পেশ করতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ (সা:) বললেন, 'তোমার ঘরে কি কিছুই নেই?' সে বললো, 'কেন নয়? একটি গদি আছে যা আমরা গায়ে দিই এবং নীচেও বিছাই। একটি পেয়ালা আছে, যা দিয়ে আমরা পানি পান করি।' তিনি বললেন, 'যাও, উভয় বস্তুই নিয়ে এস।' যখন সেই ব্যক্তি উভয় বস্তুই নিয়ে এল তখন তিনি তা নিয়ে উপস্থিত মজলিশের সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'এই দুটি জিনিস কে খরিদ করবে।' এক ব্যক্তি বললেন, 'আমি এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করতে পারি।' তিনি বললেন, 'দুই অথবা তিন দিরহাম দিয়ে কেনার কোন খরিদ্দার আছে কি?' অন্য একজন বললো, 'আমি দুই দিরহাম দিয়ে কিনতে পারি।' তিনি গদি ও পেয়ালা সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দুই দিরহাম নিয়ে দিলেন এবং আনসারীকে দিয়ে বললেন, 'এক দিরহামের খাদ্য ক্রয় করে পরিবার-পরিজনকে দিয়ে এস এবং অন্য দিরহাম দিয়ে একখানা কুঠার ক্রয় করে আমার কাছে নিয়ে এস।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নিজের মুবারক হাত দিয়ে কুঠারের হাতল লাগালেন এবং বললেন, 'এই কুঠার নিয়ে যাও এবং জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে এস এবং তা বিক্রয় কর। আর ১৫ দিন আমার কাছে আসবে না।' সে ব্যক্তি চলে গেল এবং কাঠ কেটে বিক্রয় করতে থাকলো। ১৫ দিন পর যখন সে আসল তখন সে ১০ দিরহাম কামাই করে ফেলেছিল। এই ১০ দিরহাম থেকে সে কয়েক দিরহামের কাপড় এবং খাদ্যদ্রব্য কিনেছিল। পুনরায় নবী করিম (সা:) তাকে বললেন, 'এইভাবে কামাই করে খাওয়া তোমার জন্য উত্তম। মানুষের কাছে চেয়ে-চিন্তে জীবন অতিবাহিত করলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কলঙ্কের প্রলেপ থাকবে। সওয়াল করা শুধুমাত্র তিন ব্যক্তির জন্য বৈধ : এক, অত্যন্ত গরীব। দুই, যে বিরাট ঋণ ভারে জর্জরিত এবং যার ওপর শোণিতপাতের মূল্য প্রদান প্রয়োজন হয়।'[১০]

হাদিসটি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কামাই করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যাকাত ও সাদকা নিয়ে জীবন ধারণ করুক এটা নবী করিম (সা:) পছন্দ করতেন না, বরং হালাল রুজির সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি এই ব্যক্তিকে সহযোগিতা করেছিলেন।

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যা সমাধানে ইসলাম অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা থেকে অনেক অনেক অগ্রসরমান। অথচ এই সব ব্যবস্থা রাসুলের (সা:) আগমনের কয়েক শতাব্দী পর মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে অভাবগ্রস্তকে কিছু বস্তুগত সাহায্য প্রদান এবং শুধুমাত্র ওয়াজ-নসিহত করে ভিক্ষুকের অন্তরে ভিক্ষার ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করাকেই ইসলাম যথেষ্ট মনে করে না, বরং ইসলাম সওয়ালকারীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতির দৃষ্টি প্রদর্শন এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাকে সহযোগিতা করে থাকে। তাকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক করার জন্য সে যেন নিজের যোগ্যতাসমূহকে কার্যকর করে তোলে এবং অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে।

পারস্পরিক সহযোগিতায় বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্প্রসারিত করা

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রচেষ্টা এবং মেহনতের হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার মুকাবিলা করা ইসলামে যদিও মৌলিক ব্যাপার তবুও সেই সব প্রতিবন্ধীর কী অপরাধ যারা কাজ করার কোন ক্ষমতাই রাখে না? সেই সব বিধবারই কি পাপ যাদের স্বামী তাদেরকে অসহায় রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে? ছোট ছোট শিশু এবং অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধদেরই কি অপরাধ? কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদেরই বা কি

---

১০. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

গোনাহ? হঠাৎ করে আপাতমুসিবতে যারা জীবিকা থেকে মাহরুম হয়েছে তাদেরই বা কি পাপ? সমাজের এ ধরনের লোকদেরকে কি দান-দক্ষিণার ওপর ছেড়ে দেওয়া যাবে?

না। ইসলাম এইসব লোককেও দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা এবং অভাবগ্রস্ততা থেকে নাজাত দানের ব্যবস্থা করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো এক খান্দানের লোকজন অন্যের কাছে রাখতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। শক্তিশালী দুর্বলের কাজে আসবে। বিত্তশালী নিজের বুভুক্ষু ভাইয়ের ভরণ-পোষণ করবে। মর্যাদাবান এবং ক্ষমতাশীলরা নিজের প্রতিবন্ধী ও অসহায় আত্মীয়-স্বজনকে পায়ের ওপর দাঁড়ানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। কেননা প্রকৃতির নিয়মই হলো একই খান্দানের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বেশি হয় এবং একে অপরের সাথে উত্তম ব্যবহার করে থাকে। তারা পারস্পরিক দয়ার সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়। এটা একটা বাস্তব ব্যাপার। ইসলাম একে অত্যন্ত জোরের সাথে সমর্থন করেছে :

واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتب الله-

কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্তের আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার।[১১]

বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আত্মীয়তার বন্ধনকে কাজে লাগানো

ইসলাম আত্মীয়দের অধিকারসমূহের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোরআন-হাদীসে তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ ও আত্মীয়দের সাথে খারাপ ব্যবহারকারীদের কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের এরশাদ হলো :

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتائ ذى القربى-

আল্লাহ্তায়ালা সুবিচার-ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের (সেলাহ রেহমীর) নির্দেশ দিচ্ছেন।[১২]

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا وبذى القربى واليتمى والمسكين والجارذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختا لا فخورا-

আর তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কাউকেই শরীক করো না। মাতাপিতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের প্রতিও এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চিত জানিও,আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায় অহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গৌরবে বিভ্রান্ত।[১৩]

واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا-

সেই খোদাকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে একে হক দাবী কর এবং আত্মীয় সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।[১৪]

فات ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون-

---

১১. আনফাল : ৭৫।

১২. নাহল : ৯০।

১৩. নিসা : ৩৬।

১৪. নিসা : ১।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব (হে ঈমানদার লোকেরা!) আত্মীয়কে তার হক পৌঁছিয়ে দাও আর মিসকিন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটা উত্তম পন্থা সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ চায়।[১৫]

নবী করিম (সা.) ফরমিয়েছেন :

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতের দিনের ওপর ঈমান রাখে তার উচিত আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।[১৬]

রাসুলে খোদা (সা.) ভাই বোনের হককে মা বাপের হকের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নিজের মা বাপ এবং বোন-ভাইয়ের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। অতঃপর আত্মীয়ের মধ্যে যারা নিকটবর্তী এবং তারপর যারা নিকটবর্তী।' তাহলে কোন কারণে এই হুকুম মানসুখ হয়ে যাবে? এবং কোন কারণে প্রথমটাকে (মাতা-পিতার হক) ওয়াজিব করা হবে আর দ্বিতীয়টাকে (বোন-ভাইয়ের হক) মুস্তাহাব রাখা হবে?

উম্মাহর ফকিহরা ঐক্যমত পোষণ করেন যে, স্বামীকে নিজের স্ত্রীর খোরপোষের জন্য এবং পিতাকে নিজের ও কন্যার খরচ ও পুত্রকে মাতাপিতার খরচের জন্য বাধ্য করা যায়। নিকটাত্মীয় এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের কাজী কোন আত্মীয়কে অন্য আত্মীয়ের উপর খরচ করার প্রশ্নে কতটুকুন বাধ্য করতে পারে- সে ব্যাপারেই এই মতবিরোধ। যদিও নিকটাত্মীয় ও আত্মীয়দের সাথে অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং ইহসান করাকে সকল ফকিহই দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি বলে মনে করছেন।

মানব সম্পদ উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মকর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা

ইসলামে আত্মনির্ভরশীল জীবন কাম্য। অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করবে, অনেকটা নিকট হাত না পেতে নিজেই নিজের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করবে ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তির কাছে এটিই দাবি করে। জন্যে ইসলাম হালাল উপার্জনকে ফরজ করে দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন :

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة-

অন্যান্য ফরজের সঙ্গে হালাল উপার্জনও একটি ফরজ।[১৭]

কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে হালাল উপার্জনে সচেষ্ট হতে হবে। নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মিটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

একথা সত্য যে, ইসলাম সম্পদের মোহ ও লোভ-লালসাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। ঘৃনা করে কৃপণতা-অর্থগৃধ্নুতাকে। কিন্তু সাথে সাথে পরিমিত ও প্রয়োজনীয় সম্পদের গুরুত্বও ইসলাম স্বীকার করে। কারণ ধন-সম্পদ ছাড়া নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব নয় (যাদ করা প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে ওয়াজিব-অবশ্য কর্তব্য)। এমনকি ন্যূনতম সম্পদহীন অবস্থা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে, মানুষকে ঈমান-আকিদাবিরোধী ও শরিয়াতবিরোধী কাজে লিপ্ত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন :

---

১৫. রূম : ৩৮।

১৬. বুখারী ও মুসলিম।

১৭. বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান।

Dhaka University Institutional Repository

كاد الفقر ان يكون كفرا-

দারিদ্র্য কুফুরির দিকে নিয়ে যেতে পারে।[১৮]

তাই দারিদ্র্যমুক্ত জীবনযাপন করার মতো প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। অন্য একটি হাদিসে রয়েছে :

ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه الا الدينار والدرهام-

লোকদের সম্মুখে এমন যুগ আসবে যখন (হারাম হতে বাঁচার জন্যে) অর্থকড়ি ব্যতিরেকে উপায় থাকবে না।[১৯]

কাজেই হারাম থেকে বাঁচার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ হালাল পথে সংগ্রহ করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন :

لا بأس بالغنى لمن التقى الله-

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার জন্যে ধন-সম্পদে ক্ষতি নেই।

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাধক ও মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরির (রহ) একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

كان المال فيما مضى يكره فاما اليوم فهو ترس المؤمن-

অতীতকালে মাল-সম্পদকে অপছন্দ করা হতো। কিন্তু আজকাল মালসম্পদ হলো মুমিনদের জন্যে ঢালস্বরূপ।[২০]

এ জন্যে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা ফরজ ইবাদত (বিশেষত: জুমার নামাজ) শেষ করার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর দেয়া ফযল (রুজি-রোজগার) অনুসন্ধান করতে বলেছেন

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله -

যখন নামাজ সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো ও আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করো।[২১]

আরেকটি আয়াতে রিযিকের সন্ধানে পৃথিবীর কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে :

نامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه-

অতএব তোমরা চল পৃথিবীর কন্দরে কন্দরে এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়া রিযিক আহার কর।[২২]

ইসলামের প্রাথমিককালের রাতের দীর্ঘ নামাজের বাধ্যবাধকতা থেকে পরবর্তীতে অব্যাহতি দানের অন্যতম কারণ হিসেবে রুজি-রোজগারের ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

اخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله-

অন্যান্যরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধান করে আল্লাহর অনুগ্রহ।[২৩]

---

১৮. বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান।

১৯. আহমদ।

২০. মিশকাত।

২১. আল জুম'আ : ১০।

২২. সূরা মূলক : ২০।

২৩. সূরা মুযযাম্মিল : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই অলস ও শ্রমবিমুখ হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। পরনির্ভরশীলতা-অন্যের অনুগ্রহের উপর বেঁচে থাকাও বাঞ্ছিত নয়। নবী করিম (সা:) বলেছেন :

ما اكل احد طعاما قط خير من ان يأكل من عمل يديه-

কারো জন্যে নিজের হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য নেই।[২৪]

এ থেকে বুঝা যায় যে, নিজের শ্রমে জীবিকা অর্জন সর্বোত্তম জীবিকা। এ জন্যে ইসলাম বিনা প্রয়োজনে অন্যের কাছে হাত পাততে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন :

من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثروا من النار-

যে যাঞ্চনা করে (হাত পাতে) অথচ তার নিকট এমন সম্বল রয়েছে যা তাকে উহা হতে বাঁচাতে পারে নিশ্চয়ই সে আগুন সংগ্রহ করছে।[২৫]

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে :

المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه-

চাওয়া হলো ক্ষতস্বরূপ যার দ্বারা যাঞ্চাকারী নিজের মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করছে।[২৬]

হাত পাতার নিচতা প্রকাশ করতে গিয়ে মহানবী (সা:) আরো বলেছেন :

اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا من المنفقه والسفلى هى السائله-

উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। উপরে দাতার হাত, নিচে গ্রহীতার হাত।[২৭]

এ প্রসঙ্গে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত কম্বল, বাটি ও কুড়াল সংক্রান্ত কাহিনীটি স্মর্তব্য। একদা মহানবীর (সা.) কাছে একজন ভিক্ষে চাইলে তিনি ভিক্ষে দেয়ার বদলে ঐ ব্যক্তির একমাত্র সম্বল ও বাটি বিক্রি করে একটি কুড়াল কিনে দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে বললেন।

মহানবী (সা.) কথামত কাজ করার ফলে শেষ পর্যন্ত লোকটির অভাব দূর হয়ে যায়। এ থেকে স্পষ্ট যে, ভিক্ষা নয় কাজই মহানবীর (সা.) শিক্ষা।

মোট কথা, হালালভাবে প্রয়োজনীয় ধন সম্পদ সংগ্রহ করা, আত্মনির্ভরশীল হওয়া অন্যের গলগ্রহ না হওয়া, পারতপক্ষে হাত না পাতা, শ্রমবিমুখ ও অলসতা পরিহার করে কাজ করা-পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।

কম্বল ও কুড়ালের কাহিনী থেকে এও বুঝা যায় যে, ভিক্ষা কোন সমাধান নয়। বরং মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া, স্বল্প কোন পুঁজি বা আয় উপার্জনের উপকরণ যোগাড় করে দেয়া এবং তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়াই হচ্ছে সমাধান। ইসলাম চায় স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন। আর স্থায়ী বিমোচনের জন্যে প্রয়োজন উদ্যোগ ও কঠোর পরিশ্রম, অলস ঘরে বসে না থেকে কাজ বা রুজি-রোজগারের সন্ধান বেরিয়ে পড়া, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। তাহলেই অবস্থার পরিবর্তন আশা করা যায়। যেমন-একটি হাদিসে আছে :

سافروا تستغنوا-

তোমরা (কাজ বা ব্যবসায় উদ্দেশ্যে) সফর কর এবং (পরিণামে) ধনাঢ্যতা অর্জন কর।[২৮]

---

২৪. বুখারী।

২৫. আবু দাউদ।

২৬. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।

২৭. বুখারী, মুসলিম।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ কঠোর পরিশ্রম, আত্মকর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল মনোভাব দারিদ্র্য বিমোচনের প্রকৃষ্টপ্রন্থা। আর পরমুকাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপনের জন্যে প্রয়োজন সে লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা। কেননা, যারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যে প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহ তাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। যেমন, মহানবী (সা.) বলেছেন :

ومن يستغن يغنه الله-

যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত-আত্মনির্ভরশীল হতে চায় আল্লাহ তাকে আত্মনির্ভরশীল করে দেন।[২৯]

অতএব ইসলামের নির্দেশনার আলোকে আমাদেরকে পরনির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল ও দারিদ্র্যমুক্ত জীবনযাপনের জন্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনের বিশেষ কর্মপন্থা

সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন দরিদ্র ও অভাবী শ্রেণীর অবস্থাও পরিস্থিতির আলোকে কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। সব দরিদ্র ও অভাবীর জন্যে এক ধরনের পদক্ষেপ বা নিছক আর্থিক সহযোগিতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে যথেষ্ট নয়। বরং দরিদ্র ও অভাবী শ্রেণীর অবস্থার আলোকে উপযুক্ত ও সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দরিদ্র শ্রেণীর শ্রেণী বিভাগ

সমাজের দরিদ্র ও অস্বচ্ছল-অভাবী শ্রেণীকে প্রধানত: চারটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. এমন দরিদ্র যারা কর্মক্ষম কিন্তু কর্মসংস্থানের বা আয়ের কোন ব্যবস্থা নেই।

২. কাজে নিয়োজিত আছে বটে কিন্তু উপার্জিত আয় দিয়ে তাদের সংসারের প্রয়োজন পূরণ হয় না।

৩. যাদের কোন কর্মক্ষমতা নেই। যেমন-বৃদ্ধ, পঙ্গু, দূরারোগ্য, ব্যাধিগ্রস্ত, অসুস্থ ইত্যাদি।

৪. মূলতঃ দরিদ্র নয় বটে কিন্তু হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা, সমস্যা, আকস্মিক কোন বিপদ ও দুর্যোগের কারণে অসুবিধায় পড়ে সাময়িকভাবে অভাবী হয়ে পড়েছে।

বেকার লোকদের সমস্যার সমাধানে করণীয় : যারা কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজ পাচ্ছে না তাদের জন্যে :

১. কর্মসংস্থানের ব্যাপক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২. তারা যাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও উৎপাদনমূলক (কৃষি-শিল্প) কোন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্যে পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৩. আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনে দেয়া যেতে পারে বা সরবরাহ করা যেতে পারে।

---

২৮. তাবারানী আল-আওসাত।

২৯. বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

৪. দরিদ্র লোকদের জন্যে যৌথ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা, শিল্পকারখানা স্থাপন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোর, কৃষি ফার্ম কায়েম ইত্যাদি বহু উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বেকার লোকেরা যেখানে কাজ করবে, উপার্জন করবে এবং শরীকানায় সমগ্রটার বা কোন অংশের তারা মালিক হবে।

উপরোল্লিখিত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য পুঁজির যোগান যাকাত তহবিল থেকে দেয়া যেতে পারে। সরকারী উদ্যোগে বিশেষ তহবিল গঠন করে সেখান থেকেও পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। বেসরকারী উদ্যোগেও যাকাত বা অন্য কোন উৎস থেকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন করা যেতে পারে। বিশেষ তহবিল গঠন করে তাদেরকে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণও দেয়া যেতে পারে। মোটকথা, সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে সরকারী উদ্যোগে জীবন ধারণের মতো বেকার ভাতার ব্যবস্থা প্রয়োজন।[৩০]

অভাবী কর্মজীবিদের জন্যে করণীয়

যারা কর্মজীবি কিন্তু প্রয়োজন পূরণ হয়না তাদের আয় বৃদ্ধির জন্যে ঃ

১. খণ্ডকালীন বা ছুটিকালীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে পুষ্টিভাতা ও শিক্ষা ভাতার ব্যবস্থা করা।

৪. পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করা।

৫. পরিবারের মহিলা সদস্যগণ যাতে কিছু বাড়তি আয় করতে পারেন তার জন্যে শরীয়াতের আওতায় কার্যকর ব্যবস্থা ও প্রকল্প গ্রহণ।

অক্ষম লোকদের জন্যে করণীয়

যারা শারীরিক বা মানসিক কারণে কাজ করতে অক্ষম

১. তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

২. যারা স্থায়ীভাবে অক্ষম তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্যে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। এছাড়া তাদের উপযোগী কোন প্রকল্পের কথাও চিন্তা করা যেতে পারে।[৩১]

হঠাৎ বিপদে পড়া লোকদের জন্যে করণীয়

যারা কোন আকস্মিক বিপদ, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, টর্নেডো, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

---

৩০. আহমাদ আবদুল কাদের, *ইসলাম দারিদ্র বিমোচন ইসলাম*, ঢাকা : নুসরা, ১৯৯৯, পৃ. ৭২।

৩১. আহমাদ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র বিমোচনে সমন্বিত কর্মসূচী

ব্যাষ্টিক পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিশেষ করে হত দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়ন নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করলে সফলতা আশা করা যায় :

১. দরিদ্রের সংগঠিত করা, তাদেরকে দলবদ্ধ করা : দলবদ্ধতার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, নিয়ম শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, দায়বোধ বাড়ে, পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সামাজিক শোষণের মুকাবেলা করা যায়।

২. আত্ম সঞ্চয় ও পুঁজিগঠন : দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে আত্মসঞ্চয়। ইচ্ছে থাকলে অভাবের মধ্যে থেকেও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। সামান্য অথচ নিয়মিত ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গড়ে তোলা সম্ভব। এ পুঁজিকে পরবর্তীতে আয় বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সঞ্চয় একজন দরিদ্র মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শক্তিদান করে।

৩. আত্মকর্মসংস্থান : কারো দিকে চেয়ে না থেকে নিজের কর্মসংস্থান নিজে সৃষ্টি করতে হবে। নিজের উপার্জনের ক্ষেত্র নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। বেকার বসে না থেকে বা অন্যের গলগ্রহ হয়ে না থেকে কোন না কোন উৎপাদনমূলক/আয়মূলক কাজে লিপ্ত হতে হবে। দৃঢ় ইচ্ছা ও চেষ্টা যত্ন থাকলে তা সম্ভব। আমাদের নবী (সা:) কর্তৃক একজন দরিদ্র লোকের কম্বল বিক্রি করে কুঠার কিনে দেয়া এবং এর দ্বারা কাঠ কেটে জীবন যাত্রা নির্বাহ করার কাহিনীতে সে শিক্ষাই পাওয়া যায়।

৪. আয় বর্ধনমূলক বিভিন্নমুখী কার্যক্রম : মূল পেশার পাশাপাশি অন্যান্য আয় বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে বাড়তি আয় সম্ভব। যেমন আঙ্গিনায় শাকসবজি লাগানো, ফলবান ও অর্থকরী গাছ লাগানো, হাঁস-মুরগী পাল, ছাগল-গরু পালন, হাতের কাজসহ বহু কাজ রয়েছে যা প্রত্যেক পরিবারের পক্ষেই করা সম্ভব। কাজেই একটি মাত্র কাজের উপর নির্ভর না করে সম্ভাব্য বহুমুখী কাজের মাধ্যমে আয় বাড়াতে হবে।

৫. দক্ষতা অর্জন : আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থানের জন্যে বিশেষ কোন কারিগরি, শিল্পমূলক কাজ জানা প্রয়োজন। দক্ষতা-অভিজ্ঞতা ছাড়া উন্নতি করা খুবই কঠিন। তাই প্রত্যেককে সামর্থমতো বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

৬. শিক্ষা : দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা ছাড়া উন্নতিও সম্ভব নয়। বিশেষ করে নিরক্ষরতা জাতির জন্যে অভিশাপ। সবাইকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে।

৭. স্বাস্থ্য পরিচর্যা : দারিদ্র্য ও পরনির্ভরশীলতার অন্যতম কারণ স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা, রোগশোক, প্রতিবন্ধিতা। তাই স্বাস্থ্যের পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন। কর্মক্ষম স্বাস্থ্য মানে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই।

৮. মিতব্যয়িতা : প্রত্যেককে সামর্থ্যের বাইরে ব্যয় থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে সামাজিক চাপে পড়ে বাহুল্য ব্যয় করে ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে হবে।

৯. সঠিক পরামর্শ : কেউ কেউ অনেক সময় সৎ ও উপযুক্ত পরামর্শের অভাবে দারিদ্র্য দূর করার সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে নিছক উপযুক্ত পরামর্শও অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে। নবীজী (সা:) একজন ভিখারীকে ভিক্ষা না দিয়ে ঐ ভিখারীর নিজস্ব সামান্য সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধির উপকরণের ব্যবস্থা ও উপার্জনের পন্থা বাৎলে দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে বুঝা যায় দরিদ্র লোকদেরকে দারিদ্র্যদূরীকরণের সঠিক পন্থা দেখিয়ে দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১০. স্বল্প পুঁজি সহায়তা গ্রহণ ও তার যথাযথ ব্যবহার : একজন উদ্যমী-সৎ-দক্ষ দরিদ্র মানুষ স্বল্প হাতিয়ার, উপকরণ বা নগদ আকারে স্বল্প পুঁজি সহায়তা পেলে তার ভাগ্য ফিরাতে পারে। অবশ্য সহায়তা যথাযথ ব্যবহারের উপর তা নির্ভর করে। কাজেই স্বল্প পুঁজি যোগান দেয়া এবং দরিদ্র লোকদের পক্ষে সামর্থ্যমতো তা গ্রহণ ও ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধি ও নিজস্ব পুঁজি তৈরির চেষ্টা খুবই জরুরী।

১১. প্রযুক্তি সহায়তা : আর্থিক বা উপকরণগত সহায়তা ছাড়াও পল্লীর দরিদ্র মানুষের জন্যে প্রযুক্তি সহায়তাও একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত প্রশিক্ষণ দান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করে দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২. দুর্যোগকালীন বিশেষ সহযোগিতা : দুর্যোগ ও দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতিতে বিশেষ জরুরী সহায়তা না পেলে একজন দরিদ্র মানুষ কোনক্রমেই দারিদ্র্যের করালগ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই জরুরী পরিস্থিতিতে বিশেষ সাহায্যে প্রয়োজন। মোটকথা দারিদ্র বিমোচনের জন্যে সরকারী-বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন।[৩২]

দারিদ্র্য বিমোচনে রাসূল (সা)-এর আদর্শ ও শিক্ষা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান, সম্পদের মালিকানা এবং অর্থ উপার্জন ও ভোগ, যাকাত ব্যবস্থা, অবৈধ আয় ও ব্যয় বন্ধসহ একটি খোদাভীতি পূর্ণ অর্থনৈতিক দর্শন পেশ করেন যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। মহানবী (সা)-এর এক গুণবাচক নাম রহমাত তথা দয়া ও করুণার নবী, পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين-

হে রাসুল (সা) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সারা পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ করে [তথা রাহমাতুল্লিল আলামীন রূপে]।[৩৩]

প্রিয় নবী (সা)-এর রহমত ও অনুগ্রহ ছিল সুদুরপ্রসারী ও অত্যন্ত ব্যাপক, তাঁর এ বৈশিষ্ট্যই তাকে অভাবী ইয়াতীম ও মিসকীনদের একান্ত আপন করে তুলে। নবী (সা) গরীব, ইয়াতীম, মিসকীনদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। মূলত আল্লাহর নিকট ও ইয়াতীম মিসকীন অধিকতর প্রিয়, অভাবী ও ইয়াতীমদের পরিচর্যা করা তাদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা ভালবাসার পরশে তাদের হাত বুলিয়ে দেয়া ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ।

রাসুলে পাক (সা) বলেছেন :

আমি ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ জান্নাতে একসাথে থাকবো।[৩৪]

মহানবী (সা) বলেন :

আমি প্রথম ব্যক্তি যে জান্নাতের কড়া নাড়া দেব এবং আমার সঙ্গে থাকবে দারিদ্র্য মুমিনগণ।[৩৫]

---

৩২. আহমাদ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৩৩. সূরা আম্বিয়া : ১০৭।

৩৪. সহীহ বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

অভাবী, ইয়াতীম মিসকীনেরা আমাদের ধন সম্পদ স্বরূপ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন নয়। রাসুলে করীম (সা) এরশাদ করেন :

> তোমরা দারিদ্র্য লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর, তাদের প্রতি সাধ্য অনুযায়ী অনুগ্রহ ও উপকার কর, আখেরাতের পথে তারা তোমাদের জন্যে সংগৃহীত ধন এবং প্রধান সম্বল, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা) তারা আমাদের জন্য কি প্রকার ধন। হুজুর (সা) বললেন, কিয়ামতের দিন দরিদ্রের প্রতি আদেশ করা হবে যারা পৃথিবীতে তোমাদের এক লোকমা অন্ন এবং ঢোক পানি কিংবা এক খণ্ড বস্ত্র দান করেছে আজ তোমরা তাদের হাত ধরে বেহেশতে চলে যাও।[৩৬]

রাসুল (সা) সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রদান করেছিলেন। যার মাধ্যমে ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজাসহ সকলের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত হয়েছিল। তিনি অন্যায় উপার্জন ও লুণ্ঠন তথা অবৈধ উপায়ে উপার্জন, ভোগ কঠোরভাবে বন্ধ করেছিলেন। প্রিয় নবী (সা) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হয়ে ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন। প্রিয় নবী (সা) এরশাদ করেছেন :

> মানুষের জন্য ঠিক ততটুকু খাবারই যথেষ্ট যা তাকে সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে।[৩৭]

তিনি কখনও খাদ্য মজুদ করে রাখেননি, এক বেলা আহার করার পর অন্য বেলার জন্য কিছু গচ্ছিত রাখেননি, বর্তমানে অনেক বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক ও ধনী ব্যক্তিদের নিকট সম্পদের পাহাড় জমা রয়েছে অথচ লক্ষ লক্ষ বনী আদম না খেয়ে ফুটপাতে জীবনযাপন করছে। রাসুল (সা)-এর সম্পদ জমা না করে রাখার আদর্শ গ্রহণ করলে পৃথিবীতে যে সম্পদ রয়েছে তাতে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। সম্পদ বিতরণ ও জমা না করে রাখার আদর্শ ১০০% বাস্তবায়ন সম্ভব না হলেও তবুও যদি মহানবী (সা)-এর যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইয়াতীম, মিসকীন, অভাবীদের জন্য ধনীদের সম্পদে যে প্রাপ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা পুরোপুরি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে সমাজ থেকে ক্ষুধা দারিদ্র্য দূর করা যায়। মহানবী (সা) আল-ইসলাম তথা আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যাদেশ দ্বারা ও বাস্তব জীবনে মডেলের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে যে শিক্ষা রেখে গেছেন, নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

মহানবী (সা) দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে তার গৃহিত মৌলিক কর্মসূচীগুলোর তুলে ধরা হল :

১. বাজার তদারক ও অভাবীদের খোঁজ খবর নেয়া।
২. উপার্জন ও উৎপাদনে উৎসাহ।
৩. উপার্জনে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোবৃত্তি।
৪. বিশেষ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ।
৫. জনগণের নিয়মিত সংবাদ রাখা।
৬. সম্পদশালীদের নিকট অধিক দানের জন্য উপদেশ।
৭. বৃদ্ধ, রুহ্ন, অকর্মণ্যসহ যারা উপার্জনে অক্ষম তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে ভাতা ব্যবস্থা।
৮. যাকাত ব্যয়ের খাতের মধ্যে দারিদ্র্য ও মিসকীনদের অগ্রাধিকার।

---

৩৫. মিশকাত।
৩৬. আল হাদিস, কিমিয়ায়ে সা'আদাত : ইমাম গাজ্জালী (রহ) দ্রষ্টব্য।
৩৭. তিরমিযী।

Dhaka University Institutional Repository

৯. পরিত্যক্ত সম্পত্তি দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করে দেয়া।

১০. শিক্ষার প্রসার : অগ্রগতি ও উৎপাদনের জন্য শিক্ষা প্রসার আবশ্যক।

রাসুল (সা) বলেন- 'প্রত্যেক মুমীন নর নারীর উপর জ্ঞান অর্জন ফরজ।[৩৮]

মহানবী (সা) দারিদ্র্য দূর করার জন্য যে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে ব্যাষ্টিক পর্যঅয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এবং হত দরিদ্রের ভাগ্য উন্নয়নে নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করলে সফলতা আশা করা যায়-

১. দরিদ্রদের সংগঠিত করা : দরিদ্রদের সংগঠিত ও দলবদ্ধতার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, নিয়ম শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, দায়বোধ বাড়ে, পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শোষণের মুকাবেলা করার শক্তি সঞ্চিত হয়। দরিদ্র ও অভাবী জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হয়।

২. আত্মসঞ্চয় ও পুঁজিগঠন : দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে আত্মসঞ্চয়। ইচ্ছে থাকলে অভাবের মধ্যে থেকেও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। একজন দরিদ্র ব্যক্তি সামান্য অথচ নিয়মিত ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব-পুঁজি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এ পুঁজি দিয়ে দারিদ্র্য দূর করার কাজে লাগাতে পারে। এ পুঁজিকে পরবর্তীতে আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সঞ্চয় একজন দরিদ্র মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শক্তি দান করে।

৩. আত্মকর্মসংস্থান : অন্যের দিকে চেয়েনা থেকে নিজের কর্মসংস্থান নিজে সৃষ্টি করতে হবে। নিজের উপার্জনের ক্ষেত্র ও যোগ্যতা নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। বেকার বসে না থেকে বা অন্যের গলগ্রহ হয়ে না থেকে কোন না কোন উৎপাদন আয়মূলক কাজে লিপ্ত হতে হবে। মানুষের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকলে ইহা অসম্ভব কিছু নয়। আমাদের প্রিয় নবী (সা) আত্মকর্মসংস্থানের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন :

ما اكل احد طعاما قط خير من ان ياكل من عمل يديه-

কারো জন্যে নিজের হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য নেই।[৩৯]

নিজের শ্রমে জীবিকা অর্জন সর্বোত্তম জীবিকা। এ জন্য মহানবী (সা) সব সময়ে অন্যের কাছে হাত না পেতে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহের তাগিদ দিয়ে বলেছেন :

لأنتحتط أحدكم حنفة ما ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه-

তোমাদের কারো কাঠের বোঝা পিঠে বহন করে এনে বিক্রয় করা কারো কাছে ভিক্ষা করার-চাই দিতে, নাও দিতে পারে তাঁর চেয়ে উত্তম।[৪০]

৪. আয়বর্ধনমূলক বিভিন্নমুখী কার্যক্রম : মানুষের মূল পেশা ও আয়ের পাশাপাশি অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে বাড়তি আয় সম্ভব। যেমন আঙ্গিনায় শাকসবজি লাগানো, ফলবান ও অর্থকরী গাছ লাগানো, হাঁস-মুরগী পালন, গরু-ছাগল পালন, হাতের কাজসহ বহুকাজ রয়েছে যা প্রত্যেক পরিবারের পক্ষেই করা সম্ভব। কাজেই একটি মাত্র কাজের উপর নির্ভর না করে সম্ভাব্য বহুমুখী কাজের মাধ্যমে আয় বাড়াতে হবে।

---

৩৮. ইবনে মাজাহ।

৩৯. বুখারী।

৪০. বুখারী, মুসলিম।

Dhaka University Institutional Repository

৫. দক্ষতা অর্জন ও অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষ কোন কারিগরী, শিল্পমূলক কাজ জানা প্রয়োজন। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন খুবই কঠিন। তাই প্রত্যেককে সামর্থ মতো বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতেহবে।

৬. শিক্ষা ও নৈতিকতা : দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষা ও নৈতিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। বিশেষ করে নিরক্ষরতা জাতির জন্য অভিশাপ। সবাইকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। সঠিক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নৈতিকতার গুণ ছাড়া মানবতার সার্বিক উন্নতি কঠিন।

৭. স্বাস্থ্য পরিচর্যা : দারিদ্র্য ও পরনির্ভরশীলতার অন্যতম কারণ স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা, রোগ শোক, প্রতিবন্ধিতা। তাই সমাজের জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি নিয়ে দারিদ্র্য মোচন সহজেই সম্ভব।

৮. মিতব্যয়িতা : প্রত্যেককে সামর্থের বাহিরে অতিরিক্ত ব্যয় থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক চাপে পড়ে বাহুল্য ব্যয় করে ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে।

৯. সঠিক ও সৎ পরামর্শ : অনেক সময় সৎ ও উপযুক্ত পরামর্শের অভাবে দারিদ্র্য দূর করার সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সঠিক ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে দারিদ্র্য দূর করার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা ভালো সুপারিশ সম্পর্কে করেন :

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شئ مقيتا-

> যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তা থেকে অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করবে সেও তা থেকে অংশ পাবে।[৪১]

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, প্রতিটি ভাল কাজে পরামর্শ দান ও সুপারিশ করেও যে কেউ সওয়াবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মহানবী (সা) ও সেবামূলক কাজে সুপারিশ করতে কথার দ্বারা হলেও অংশ নিতে বলেছেন। যেমন হাদিসে এসেছে :

> নবী করিম (সা)-এর কাছে যখন কোন প্রার্থী বা কোন অভাবী (বা কোন প্রয়োজনে কেউ) আসতো তখন তিনি (সাহাবীগণকে) বলতেন-তোমরা সুপারিশ কর। এতে তোমাদের সওয়াব দেয়া হবে।[৪২]

নবীজী (সা) একজন ভিখারীকে ভিক্ষা না দিয়ে ঐ ভিখারীর নিজস্ব সামান্য সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধির উপকরণের ব্যবস্থা ও উপার্জনের পন্থা বাতলে দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় দরিদ্র লোকদের দরিদ্র দূরীকরণের সঠিক পন্থা দেখিয়ে দেয়াও সওয়াবের কাজ।

১০. প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা : আর্থিক বা উপকরণগত সহায়তা ছাড়া পল্লীর দরিদ্র মানুষের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত প্রশিক্ষণ দান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করে দেয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

---

৪১. সূরা আন নিসা : ৮৫।

৪২. বুখারী, মুসলিম।

Dhaka University Institutional Repository

১১. স্বল্প পুঁজি সহায়তা ও তাঁর যথাযথ ব্যবহার : একজন উদ্যমী-সৎ-দক্ষ-দরিদ্র মানুষ স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প হাতিয়ার এবং উপকরণ পেলে তার ভাগ্য ফিরাতে পারে। আর এ সহায়তা যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা ও তদারকী করলে দারিদ্র্যতা দূল করতে দিক নির্দেশনা পাবে।

১২. দুর্ঘটনা ও দুর্যোগকালীন বিশেষ সহযোগিতা : দুর্যোগ ও দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতিতে একজন দরিদ্র মানুষের বিশেষ সহযোগিতার প্রয়োজন। তাই জরুরী পরিস্থিতিতে বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বিশেষ মুহূর্তে জরুরী সাহায্যের ব্যবস্থা নিতে হবে। আকস্মিক বিপদ, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, টর্নেডো, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে যারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. মৌলিক পারিবারিক সাহায্য : গ্রামাঞ্চলে ও শহরতলীতে এমন অসংখ্য দরিদ্র পরিবার রয়েছে যাদের জন্য মৌলিক সাহায্যের প্রয়োজন। এ ধরনের পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতাও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দ্বারা হত দরিদ্র পরিবারের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করা সম্ভব।

১৪. ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণ : পল্লী এলাকার অনেক কৃষক পরিবার পারিবারিক কোন বড় ধরনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক বা গ্রামীণ মহাজনের নিকট হতে টাকা ঋণ নেয়ার ফলে তাদের শেষ সম্বল চাষাবাদের জমিটুকু বেহাত হয়ে গেছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রে কৃষকেরাই এ তালিকায় (সংখ্যা গুরু) অধিক। জমি বন্ধকমুক্ত ও ঋণ পরিশোধ করে চাষাবাদের জমি যাতে পুনরায় চাষ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শহর ও পল্লী এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্থাপন মহিলাদের জন্য সেলাই কাটিং, নিটিং, এমব্রয়ডারী, বুটিক, ফেব্রিকক্স প্রিন্টসহ আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৪৩]

মোট কথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন।

এ ছাড়া বিশেষভাবে যারা কর্মক্ষম কিন্তু বেকার এবং যাঁরা কাজে নিয়োজিত আছে বটে কিন্তু উপার্জিত আয় দিয়ে তাদের সংসারের প্রয়োজন পূরণ হয় না ও অক্ষম লোকদের জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করলে সফলতা আশা করা যায়।

বেকার লোকদের সমস্যা সমাধানে করণীয়

যারা কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজ পাচ্ছে না তাদের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়-

১. কর্মসংস্থানের ব্যাপক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২. বেকারগণ যাতে ব্যবসা বাণিজ্যি ও উৎপাদনমূলক (কৃষি শিল্পে) যে কোন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৩. তাদের শিক্ষা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্মের ব্যবস্থা করতে হবে।

---

৪৩. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, *দারিদ্র বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ*, ঢাকা : স্টাডি পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. দরিদ্র লোকদের জন্য যৌথ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা, শিল্প কারখানা স্থাপন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, কৃষি ফার্ম কায়েমসহ নানা ধরনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বেকার লোকেরা যেখানে কাজ করবে, উপার্জন করবে এবং শরীকানায় সমগ্রটার বা কোন অংশের তারা মালিক হবে। এ প্রকারের প্রকল্পের পুঁজির জন্য যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য দেয়া যায়।

৬. সর্বোপরি কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে কর্মসংস্থানের প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগ জীবন ধারনের মতো বেকার ভাতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অভাবী কর্মজীবিদের জন্য করণীয় : যারা কর্মজীবি কিন্তু তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় না তাদের আয় বৃদ্ধির জন্য যে সকল উদ্যোগ নেয়া যায়-

১. খণ্ডকালীন বা ছুটিকালীন এবং অবসর সময় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. পরিবারের মহিলা সদস্যগণ যাতে কিছু বাড়তি আয় করতে পারেন তার জন্য শরীয়অতের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যকর ব্যবস্থা ও প্রকল্প গ্রহণ।

৪. বাড়িতে বা বাসায় সুযোগ থাকলে চাষাবাদের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

৫. তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য পুষ্টিভাতা ও শিক্ষাভাতার ব্যবস্থা করা।

৬. পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করা।

অক্ষম লোকদের জন্য করণীয় : যারা পঙ্গু এবং শারীরিক বা মানসিক কারণে কাজ করতে অক্ষম তাদের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়-

১. এদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

২. যারা স্থায়ীভাবে অক্ষম তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নিয়মিত ও পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। এছাড়া তাদের উপযোগী কোন প্রকল্পের কথাও চিন্তা করা যেতে পারে।[৪৪]

৩. যারা অক্ষম ও পঙ্গু তাদের জন্য স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থা করা।[৪৫]

মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ব্যবস্থা

হাদীসে রয়েছে- 'দরিদ্র মানুষকে কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়'। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ। এদেশের অধিকাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তাই সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর কা জরুরী। কিন্তু এ জন্যে যেসব বাধা রয়েছে সেসবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব, পুঁজির অভাব, প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব। এছাড়া রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসলহানী, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পে গৃহহানী। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে গোটা পরিবারের ভিক্ষুক হওয়ার অবস্থা। তাছাড়া রয়েছে রোগ-জ্বর-ব্যাধি। দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হওয়া বা অসুস্থতায় শারীরিকভাবে পঙ্গু ও অক্ষম হওয়া তো রয়েছেই। ফলে আমাদের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের পরিমাণ দুটোই বিশ্বের প্রায় শীর্ষস্থানীয়। অথচ বাংলাদেশের অবস্থা এমন হবার কথা নয়। এদেশের

---

৪৪. আহমদ আবদুল কাদের, *সেবা দারিদ্র্য বিমোচন ইসলাম*, পৃ. ৭১-৭২।

৪৫. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮৬% লোক মুসলমান। ব্যক্তি জীবনে নিষ্ঠাবান এবং খোদাভীরু। মুসলমানদের উপর আল্লাহর তরফ হতেই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে যা যথারীতি অনুশীলন করলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দারিদ্র্য থাকার কথা নয়। ইসলামের সোনালী যুগে তা ছিলও না। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জমিয়াতুল আরবে যাকাতের অর্থ নেবার লোক না থাকায় সেই অর্থ নতুন বিজিত দেশসমূহের জনগণের কল্যাণেই ব্যয় হতো।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ৬০% এর বেশী দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করে। এদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারের গৃহীত কর্মসূচী যেমন কোনক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, তেমনি একাজ বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিওদের উপর ফেলে রাখা যায় না। সমকালীন সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা বেকার দুঃস্থ ও গরীব জনগণকে কর্মসংস্থানের জন্যে সত্যিকারে কোন সাহায্য করতে অপারগ। কোলেট্যারাল বা জামানত ছাড়া তারা ঋণ দেয় না। যেসব বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা বিকালঙ্গ মানুষ সমাজের জন্যে দায়, যারা নিজেদেরকে অন্যের গলগ্রহ মনে করে সদা-সর্বদা মানসিকভাবে সংকুচিত থাকে, তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সমকালীন সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার কোন অবদান নেই।

সমাজকে গভীরভাবে নিরীক্ষন করলে দেখা যাবে, যখনই ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছে, নিজের চেষ্টায় রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে পেরেছে তখন শুধু তারই পারিবারিক উন্নতি হয়নি, গোটা সমাজের চেহারাও বদলাতে শুরু করেছে। কিন্তু এদের সহায়তা করার জন্যে সুদী ব্যাংকগুলোর কোন উদ্যোগ নেয়া সংগত কারণেই সম্ভব নয়। সুদের ভিত্তিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে যেসব এনজিও তারাও এই দারিদ্র্য দূর করতে তো পারেইনি, বরং এর পরিধি আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

সমাজের বিপুল সংখ্যক লোক কর্মজীবী হলে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতিধারা সচল হয়- কীনসের ভাষায় পূর্ণ কর্মসংস্থানে মাত্রা অর্জিত হয়, সেই স্তরে পৌছতে হলে দরকার একটা big push বা প্রবল ধাক্কা। সুদী ব্যাংকগুলো এই ধাক্কা দিতে কখনোই সমর্থ নয়। বরং তারা যদি কখনো উদ্যোগ নেয়ও পরিণামে শুরু হয়ে যায় ব্যবসায় চক্র বা business cycle যা অর্থনীতির জন্য খুবই অশুভ। তাই যদি বিনা সুদে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যায়, কাজের বা উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করা যায়, তাহলে সমাজে যে ধনাত্মক পরিবর্তন সূতি হয় তার চেইন রিঅ্যাকশন চলে দীর্ঘদিন ধরে। এক্ষেত্রে লাভের গুড় পিপড়েয় খায় না বলে উদ্যোক্তারা প্রকৃত অর্থেই স্বাবলম্বী হতে পারে।

বলা হয়ে থাকে এনজিওরা মানব উন্নয়নে কাজ করছে কিন্তু তারা পারিবারিকভাবে যাদের অন্ততঃ ১.০-১.৫ বিঘা জমি রয়েছে, মাছ চাষের ডোবা বা পুকুর রয়েছে অথবা কাজের সুযোগ ও সামর্থ রয়েছে তাদেরকেই এরা ঋণ দেয়।[৪৬] এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থেই যারা হত দরিদ্র বা hardcore poor তাদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করাই হবে প্রকৃত অর্থে সমাজকল্যাণ। এজন্যে বিত্তহীন মহিলা, ভূমিহীন কৃষক, নিরক্ষর যুবক, দুঃস্থ মাতা, সম্বলহীন বৃদ্ধ, রুগ্ন ও দুর্বল শিশু, শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এরাই হলো মানব উন্নয়নের যথার্থ টার্গেট গ্রুপ।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন ঃ প্রকল্প বিনিয়োগ, বিনিয়োগ স্কীম, ব্যাংকের ট্রেনিং এন্ড রিসার্স একাডেমী স্থাপন এবং ব্যাংক ফাউন্ডেশন গঠন।

---

৪৬. মোঃ হাবিবুর রহমান, *দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ৪ জুলাই ২০০৩, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ দেশে শিল্পায়নের এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প বিনিয়োগ দিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে ব্যাংক এই খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগের মাধ্যমে বেশ কিছু নতুন, নতুন শিল্পপতি সৃষ্টি করেছে যাদের মাধ্যমে দেশে রপ্তানী বিকল্প পণ্য তৈরীর মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে অন্যদিকে এইসব শিল্পের পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। অন্যদিকে এ সমস্ত শিল্প কারখানায় বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের প্রধান সমস্যা বেকারত্বের কিছুটা হলেও সমাধান হচ্ছে। এভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলো সমাজ থেকে দারিদ্র্যতা দূরীকরণের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকারের বিনিয়োগ স্কীমের মাধ্যমেও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে। যেমন :

ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় নবীন ডাক্তারদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য জেলা ও থানা শহরেও চিকিৎসা সরঞ্জাম, ক্লিনিক, চেম্বারসহ ফার্নিসী করে দেয়া, এমনকি রোগী দেখার সুবিধার জন্য মোটর-সাইকেল কিনে দেয়া হয়। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরীর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা-সরঞ্জাম কেনার জন্য সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

বিনিয়োগের পরিমাণ ও মেয়াদ

১. আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে আগ্রহী ডাক্তারদেরকে জেলা ও থানা শহরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ সুবিধা সহজ শর্তে যথাক্রমে পাঁচ বছর ও সাত বছর মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়।

২. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জন্য সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের মেয়াদ পাঁচ বছর।

৩. শিক্ষিত বেকার ডাক্তাররা গ্রুপ গঠন করে নতুন ক্লিনিক স্থাপনে আগ্রহী হলে ক্লিনিকের যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য তাদের প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা হারে ও একটি ক্লিনিকের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যেতে তপারে।

৪. অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক যদি চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের বর্তমান চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদেরকে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জন্য সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। অবশ্য ক্লিনিকের অবস্থান, সুনাম, উদ্যোক্তাদের যোগ্যতা ইত্যাদির উপর ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করবে। বিনিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ বছর।

৫. শিক্ষিত বেকার ডাক্তারদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে বা তার পূর্বেই ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করবেন তাদেরকে বিশেষ রেয়াত দেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প

কৃষকদের কৃষিপণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদান ও গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ব্যাংকের সকল শাখার ১৫ মাইল পরিধির মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় সহজ শর্তে পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল, মাড়াই কলসহ বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম দেয়া হয়।[৪৭]

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা

১. শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যে কোন গ্রামীণ যুবক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কৃষক এবং এটিকে ব্যবহা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন যে কোন ব্যক্তি এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা লাভের জন্য আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে এসএসসি বা তদূর্ধ্ব শিক্ষিত আবেদনকারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কৃষক আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে। এটিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৪৫ এবং শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত যুবকদের ক্ষেত্রে বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৩. আবেদনকারীকে শারীরীক ও মানসিক দিক দিয়ে সক্ষম এবং প্রদত্ত কৃষি সরঞ্জাম চালাবেন এ ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে।

৪. আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী এলাকার বাসিন্দা হবেন এবং ঐ এলাকায় অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা তার থাকতে হবে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিন এলাকার বাইরে অবস্থিত ব্যাংকের সকল শাখার ১০ মাইল পরিধির মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় গবাদি পশু পালন, মৎস্য খামার, কৃষি খামার, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, সামগ্রী নির্মাণ ও উৎপাদন, ব্যবসা/দোকান, পরিবহন, কৃষি সরঞ্জাম, বনানয়ন ইত্যাদি সরবরাহসহ বিভিন্ন সেবামূলক খাতে প্রায় ২০০টি আর্থিক কার্যক্রমে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদেরকে সহায়ক জামানত ছাড়া সহজ শর্তে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে।

বিনিয়োগ খাত[৪৮]

ক. গবাদি পশু-পাখি : দুধালো গাভী, গরু মোটা-তাজাকরণ, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এবং হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন।

খ. মৎস্য চাষ : মৎস্য খামার, মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং ইজারা গ্রহণ।

---

৪৭. মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৪৮. মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

গ. কৃষি প্রক্রিয়াকরণ : বেতের সামগ্রী, বাঁশের চাটাই ও অন্যান্য কাজ, মসলা, পাটের ব্যাগ ও পাটজাত সামগ্রী, ঘি, গুড়, আটা, ময়দা, নারিকেলের ছোবড়ার বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণ, তৈল নিষ্কাশন, আখ-ধান ডাল মাড়াই, মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প ইত্যাদি।

ঘ. ম্যানুফেকচারিং : পোষাক তৈরী, বিভিন্ন ধরনের কারখানা, কনটেইনার উৎপাদন (পস্নাস্টিক, ধাতব কাঁচা ইত্যাদি), রিকসা, রিকসা ভ্যান ও রিকসার হুড প্রস্তুত ও মেরামতকরণ, আসবাবপত্র নির্মাণ, লেপ-তোষক ও সংশিস্নষ্ট অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণ ও মেরামতকরণ, কামারের কাজ, ববিন নির্মাণ (পস্নাস্টিক, ধাতব ইত্যাদি) জুতা তৈরী, তাঁত বুনন (সাটিং, শাড়ি, ন্যাপকিন, পর্দা ইত্যাদি) তাঁতের ক্ষুদ্রাংশ তৈরী, মোমবাতি প্রস্তুতকরণ, তৈলবীজ মাড়াই কল নির্মাণ, ঝুড়ি প্রস্তুতকরণ, লৌহজাত গৃহ-সরঞ্জাম নির্মাণ, বিবিন্ন ধরনের লোহার সামগ্রী (তারকাটা, তারের জাল ইত্যাদি) তৈরী করা, দড়ি পাকানো, টুপি সেলাই, চানাচুর, আঠা তৈরীকরণ, গরু-মহিষের গাড়ী, টাঙ্গা, আইসক্রিম/স্কুল/অন্যান্য ভ্যান নির্মাণ ও মেরামতকরণ।

ঙ. ব্যবসা/দোকান : ধান-চাল, ডাবল, লবণ, গোলমরিচ, শাক-সবজি, গুড়, জ্বালানী কাঠ, খাম্বা, মুরগী, মাছ, শুটকি, গবাদি পশু, কলা, পেঁয়াজ, সুপারি, পান, মৌসুমী ফলমূল, বাঁশ, দুধ, সার, চা, গোল আলু, নারিকেল, মশলা, স্টেশনারী দ্রব্য সামগ্রী, বাসন-কোসন, লুঙ্গি, কাপড়, শাড়ী, সরিষা বীজ ও তৈল বীজ, ইট, যন্ত্রাংশ, আদা, তেলের পিঠা, চামড়া, পাটজাত সামগ্রী, সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়, কার্পাস তুলা, চীনাবাদাম, কাপড়ের ঝুড়ি বা থলে, সুতা, নারিকেলের ছোবরা, বাঁশের তৈরী সামগ্রী, স্লিপার ও জুতা, বীজ ও চারা, মৃৎশিল্প সামগ্রী, মৌসুমী কৃষিজাত পণ্য, তাতা ও খুন্তি জাতীয় বাসন-কোসন, গম, নারিকেল তৈল, রেস্তোরা ও হোটেল, মধু, আঁখ, স্টোভ, মাছের খাবার, গবাদি পশুর খাবার, রসুন, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, ক্রোকারিজ, ওষুধ, হার্ডওয়ার, লৌহজাত সামগ্রী, মিষ্টি, বাইসাইকেল/রিকসা/রিকসা ভ্যানের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, স্যানিটারী সামগ্রী, কাঁচম ঘড়ি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বইম গেঞ্জি, আন্ডারওয়ার, গামছা, তোয়ালে, মোজা ও রুমাল, চামড়াজাত সামগ্রী, এ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী, হোমিও ঔষধ, চশমা, বেকারী সামগ্রী ইত্যাদির দোকান, চায়ের স্টল, ম্যাগাজিন/সংবাদপত্র স্টল, জুতার স্টোর।

চ. পরিবহন : রিকসা, রিকসা ভ্যান গরুগাড়ী/মহিষের গাড়ী/টাঙ্গা, দেশী নৌকা, ইঞ্জিন চালিত নৌকা ক্রয়।

ছ. সেবা : লন্ড্রী, আটা-ময়দার কল, মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ, মোটর পাম্পিং দোকান, মসলা গুড়ার করার কল, ধান-ডাল মারই কল, করাত কল, ডাইং ও প্রিন্টিং সাইনবোর্ড পেইন্টিং দোকান, সুতা গুটানোর কারখানা, ঘড়ি মেরামতের দোকান, টিভি, রেডিও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী মেরামতের দোকান, রেফ্রিজারেটর মেরামতের দোকান, সরিষার তৈল উৎপাদনের দোকান।

জ. কৃষি সরঞ্জাম ও বনায়ন : হস্তচালিত নলকূপ ক্রয়, চাষাবাদ, শাক-সবজির বাগান, আঁখের ক্ষেত, লিচু বাগান, আম কাঁঠাল, সুপারি, পেয়ারা, আনারস ও অন্যান্য ফলের বাগান/ক্রয় ইজারা. বীজ ও চারা ক্রয়, রেশম গুটি, মৌমাছি পালন, মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ।[৪৯]

বিনিয়োগের পরিমাণ

১. বিনিয়োগ কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

২. একজন গ্রাহককে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হবে।

---

৪৯. ইসলামী ব্যাংকস ম্যানুয়েলস।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগের মেয়াদ : সর্বোচ্চ এক বছর

পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প

সড়ক ও নৌ-পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত অভিজ্ঞ সফল ব্যবসায়ী ও এ যোগ্য নতুন উদ্যোক্তাদের এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ক্রয়ে সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

এছাড়াও রয়েছে বহুজাতিকসহ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সংস্থা এবং স্বচ্ছল চাকরী ও পেশাজীবীদেরকে লিজিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন মালিকানা লাভের সুবিধা যার মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক উদ্যোক্তার ভাগ্যের উন্নয়ন এবং বহুসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।[৫০]

পরিবহনের ধরন

সড়ক পরিবহন : ১. বাস, ট্রাক, মিনিবাস; ২. প্রাইভেট কার, মাইক্রো, জীব; ৩. অটোরিক্সা, টেম্পো, পিক-আপ ভ্যান; ৪. এ্যাম্বুলেন্স।

নৌ-পরিবহন : ১. সর্বোচ্চ ৫০০ টনের কার্গো ভ্যাসেল; ২. অনধিক ৮০০ টনের সমুদ্রগামী ভ্যাসেল; ৩. যাত্রীবাহী লঞ্চ।

টার্গেট গ্রুপ

বাস/ট্রাক/মিনিবাস : পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান এবং পরিবহনকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক যোগ্য ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান।

প্রাইভেট কার/মাইক্রোবাস/জীপ

১. সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা।

২. প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

৩. প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা।

৪. পেশাজীবী : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার।

৫. পরিবহন খাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যারা পরিবহন (রেন্ট-এ কার) ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন বা আগ্রহী। এক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

অটোরিক্সা/টেম্পো/পিক-আপ ভ্যান

যে সব ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে পরিবহন ব্যবসায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং যোগ্য সম্ভাবনাময় যেসব ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র পরিবহনকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী তারা অটোরিক্সা/টেম্পো/পিক-আপ ভ্যান ক্রয়ে বিনিয়োগ লাভের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এম্বুলেন্স : প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক ও হাসপাতাল।

নৌ-পরিবহন : নৌ-পরিবহন ব্যবসায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল ব্যবসায়ী বা ব্যক্তি।

---

৫০. মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পল্লীখাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। কিন্তু পল্লী জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং জীবনযাপনের ন্যূনতম চাহিদা মিটানোর জন্য সম্পদের অভাব গ্রামের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি কর্মহীন হয়ে পড়ছে অথবা স্বল্পমূল্যে অপ্রতুল শ্রম যোগান দিয়ে আসছে এবং অভাব-অনটনে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। এর ফলে কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য পল্লী জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এছাড়াও শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আয় ও সম্পদের গগনচুম্বী পার্থক্য ও সুষম বন্টনের অভাবে গ্রামীণ সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্থবির ও শ্লথ।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ-জীবন ও অর্থনীতিতে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে পল্লী জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান, গরীব কৃষক ও বর্গাচাষীদের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক তার নির্ধারিত শাখাসমূহের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলে নিবিড়ভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৫১]

গ্রামীন পর্যায়ে বিনিয়োগ[৫২]

বিনিয়োগের খাত, সর্বোচ্চ সীমা ও মেয়াদ

	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	পরিমাণ
১.	২১ জাতের ফসল আবাদের জন্য	১ বছর	ট. ১০,০০০.০০
২.	পুকুরে মৎস্য চাষের জন্য	৩ বছর	ট. ২৫,০০০.০০
৩.	সর্বপ্রকার অকৃষিখাত ঃ উৎপাদন, ব্যবসা, দোকান প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফেরী, নার্সারী, পশুপালনসহ ৩৪৩টি আর্থিক কার্যক্রম।	১ বছর	ট. ১০,০০০.০০
৪.	সেচ খাতে	১ বছর	ট. ৫,০০০.০০
৫.	কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি (এক্ষেত্রে গ্রাহককে ১০% ইকুইটি দিতে হবে)	৩ বছর	ট. ২৫,০০০.০০
৬.	রিকশা, রিকশা ভ্যান ও গ্রামীণ পরিবহন	২ বছর	ট. ৫,০০০.০০
৭.	হস্তচালিত নলকূপ সরঞ্জাম	৩ বছর	ট. ৩,০০০.০০
৮.	গৃহ নির্মাণ সামগ্রী	৩ বছর	ট. ১৫,০০০.০০

(২০০৩ সালের জুন পর্যন্ত)

---

৫১. মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৫২. মোঃ হাবিবুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্স একাডেমী স্থাপন

ব্যাংকের তথা দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার নিজস্ব জায়গায় এই একাডেমী স্থাপন করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামী অর্থনীতির উপর প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে ব্যাংকের নিজস্ব এবং অন্যান্য ব্যাংকের এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মী বাহিনীকে ট্রেনিং এর মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংকের সহযোগী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য একটি সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ঃ প্রকল্পাধীন গ্রামের শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, গ্রাম থেকে নিরক্ষরতা দূর করা, জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনায় উৎসাহ দেয়া, জনগণকে স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান দান করে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে ইসলামী অনুশাসন পালনে জনগণকে অভ্যস্ত করে তোলা, জনগণের মাঝে পানাহারসহ সব কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে সহায়তা দেয়া, টিকাদান কর্মসূচী চালু করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করা, জটিল রোগের চিকিৎসালাভে পথ সুগম করা।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১০৪নং ধারা অনুযায়ী "সাদাকা তহবিল" নামে একটি দাতব্য তহবিল গঠন করা হয়। সাদাকা তহবিলের মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবা, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের পরিধি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ বিস্তৃত কর্ম-পরিধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯১ সালের ২০ মে সাদাকা তহবিলের নাম পরিবর্তন করে "ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন" করা হয়। ফাউন্ডেশন স্বতন্ত্র হিসাব ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টাফ কোম্পানীজ এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কার্যক্রম

দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপুষ্টি, কুসংস্কার, সন্ত্রাস, সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যায় বাংলাদেশ বিশেষভাবে জর্জরিত। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের দুঃস্থ, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং বেকার জনগোষ্ঠিকে কর্মক্ষম করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি ব্যাপক এবং সময় সাপেক্ষ কাজ। কোন একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গোটা দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

মানব সম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তারপরেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো গেলে গোটাদেশের দারিদ্র্যতা দূর না হলেও দারিদ্র্যতা দূরীকরণের এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। একই সাথে মানব কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে মানবতাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে মেধা, শ্রম ও শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : আট
ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা সমস্যা ও সম্ভাবনা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তা নৈতিক শিক্ষা ও আইন উভয়ের সাহায্য নিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে ইসলাম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসকে এ ব্যবস্থায়ও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য করার জন্য তৈরি করে। অন্যদিকে আইনের বলে তাদের ওপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে যার ফলে তারা এ ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য হয় এবং এর সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে সক্ষম হয় না।[১] ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও তার ভিত্তিসমূহের মধ্যে চারটি বিষয় মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী : ১. কতিপয় সীমা ও নিয়ন্ত্রণ সহকারে স্বাধীন অর্থনীতি, ২. যাকতের অপরিহার্যতা, ৩. উত্তরাধিকার আইন ও ৪. সুদ নিষিদ্ধকরণ। চতুর্থটি অর্থ সুদের উপর ভিত্তি করে যে বাংকিং ব্যবস্থা ও অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তার সর্বগ্রাসী অকল্যাণকর থাবা থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে ইসলাম পুনর্জাগরণ আন্দোলন প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। সীমিত তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে তার উন্নত কৌশল পদ্ধতির উপর প্রচুর গবেষণা হচ্ছে এবং একটি উপযোগী কাঠামো নির্মিত হয়েছে। বিভিন্নমুখী ব্যাংকিং সমস্যার ইসলামী সমাধানের জন্য ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বেসরকারী উদ্যোগে-দু'ভাবেই ইসলামী ব্যাংক এখন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশে বেসরকারী উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়েছে এবং তা সফলতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের পথে সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ইসলামীকরণ সময়ের তীব্র দাবী। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হচ্ছে প্রধান মাধ্যম। বেসরকারী খাতে যে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক কাজ করছে তারা বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রয়োজনীয় গতিশীলতা অর্জন করতে পারছে না। বাংলাদেশ সরকার নীতিগতভাবে দেশের গোটা অর্থব্যবস্থা ইসলামীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও আজ পর্যন্ত কোন ব্যাপক ও কার্যকর পন্থা গৃহীত হয়নি। নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরনের পথে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে, যার কারণে বিনিয়োগ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা কষ্টকর হচ্ছে।

সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের অভাব

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'ইসলাম' শ্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বরাই কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। তুরস্কের একজন ইতিহাসবিদ মি. তুরপাক বলেছেন :

---

১. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

> Countries under colonial rule with incipient national movements, religion became a symbol of identity with the cultural heritage of the indigenous peoples which the colonial powers had attempted to destory. Hence religion was used as an effective tool for social and political mobilisation.

পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু সেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন দায়িত্ববোধ মনে করেননি।[২] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী জনগনের মতামত ছাড়াই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সংবিধানে সংযোজন করে এবং 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়; কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় মুসলমানরা তা হতে দেয়নি।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশবাসীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সংবিধান সংশোধন করেন। সংবিধানের ৮নং ধারার ১ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।'[৩] পরবর্তীকালে এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ সরকার ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ গ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী ফোরামে ইসলামী আদর্শ, জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছে এবং রাখছে। বাংলাদেশ আইডিবির উদ্দেশ্য– The purpose of the Islamic Development Bank will be to forster economic development and social progress of member countries and Muslim communities individually as well as jointly in accordance with the principles of the shariah.- এর সাথে একমত পোষণ করে সদস্যপদ গ্রহণ করে।[৪] ১৯৮১ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় :

> Strict adherence to Islam and Islamic Principles and values, as a way of life, constitutes the highest protection for Muslims against the dangers which confront them. Islam is the only path which can lead them to strength, dignity and prosperity and a better future.[5]

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের পুরো ব্যবস্থা ইসলামীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পাশাপাশি সরকার দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অত্যন্ত জোরালোভাবে বক্তব্য পেশ করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি ঢাকায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষাদান' (Teaching Islamic Economics at University Level) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশের তৎকালীন মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্বোধনী বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন :

> বিশ্ব জুড়ে আজ দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় ও গণতান্ত্রিক এক মূল্যবোধের নবজাগরণ এবং প্রচলিত বৈষম্যমূলক বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তে একটি ইনসাফমূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা।

---

২. আবুল আসাদ, আজকের বিপর্যস্ত বিশ্বে মহানবী (সা.)-এর আদর্শের বিজয়, *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯১ সংখ্যা।

৩. বাংলাদেশ সরকার (আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৯০।

৪. আর্টিকেলস অব এগ্রিমেন্ট, ধারা নং-১, ১৯৭৫।

৫. ওআইসি, *দি মক্কা ডিক্লারেশন এন্ড দি প্লান অব অ্যাকশন ফর ইসিআইসি*, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

> মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) মদীনায় যে সমাজ ব্যবস্থা গঠন করেন সেখানে ইতিহাসের সর্বপ্রথম কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার এতটুকু ক্ষুণ্ন না করেও রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জীবিকার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছিল।
>
> ... ইসলামী অর্থনীতি দুনিয়ার বুকে দারিদ্র্য ও শোষণের মূলোৎপাটন এবং সামাজিক সাম্য ও ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারে একদা বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।[৬]

এমনিভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রেখেছেন। সেসবের বিস্তারিত উদ্ধৃতি না দিয়ে বলা যায়, সরকারের কথা ও কাজের মিল না দেখে জনগণকে বারবার হতাশ হতে হয়েছে।

পাকিস্তান, ইরান ও সুদানের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, কেবলমাত্র সরকারী পদক্ষেপই ব্যাংকিং তথা অর্থনীতিকে ইসলামীকরণ করার ক্ষমতা রাকে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ অপরিহার্য। এ জন্য সরকারকে আদর্শিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে উজ্জীবিত হয়ে স্বতস্ফূর্ততার সাথে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের উচ্চতর মূলনীতি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের পাশাপাশি সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা দরকার।

আইনগত কাঠামোর অভাব

পাকিস্তান ও ইরানে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং সেখানে আইনগত ভিত্তি পেয়েছে। পাকিস্তানে ১৯৮০ সালের ২৬ জুন 'The Legal Framework of Pakistan's Financial and Co-operative System' পরিবর্তন করে মুদারাবা লেনদেন এবং Participation Term Certificate (PTCS) ইস্যু করার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৮৫ সালে The Banking Tribunal Ordinance এবং The Banking and Financial Services (Amendment of Laws) Ordinance পাশ করা হয়। এতে ৭টি আইনের সংশোধন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে The Partnership Act, The Banking Companies Ordinance, The Wealth Tax Act, The Federal Bank of Co-operations, The Income Tax Ordinance, The Registration Act and Capital Issues, 1974.[7] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোর সাথে প্রচলিত আইনের সামঞ্জস্য না থাকায় ব্যাংকগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। ইসলামী লেনদেনে চুক্তি লংঘন হলে তার সমাধানার্থে ইসলামী আইন অনুসারে কোর্ট থাকা উচিত এবং Banking Companies Act, 1991-এ ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিয়ে আসা উচিত।

ইসলামী বিনিয়োগের পরিবেশের অভাব

ইসলামী বিনিয়োগের পরিবেশের অনুপস্থিতিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে বিনিয়োগ বিমুখ করে রাখছে এবং রাখবে। ইসলামী মুদ্রাবাজার, পুঁজিবাজার গঠন হওয়া দরকার। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক কাঠামো ঢেলে সাজানো না হলে ইসলামী ব্যাংকিং আশানুরূপ দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।

---

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, *প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকে*, ২৩-০৭-'৯১।

৭. ডি. এম. কোরেশী, *দি রোল অব শরীয়াহ্ বেজড্ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস ইন এ মুসলিম কান্ট্রি*, ২৮ এপ্রিল ১৯৮৬ সনে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট-এর প্রচলন না থাকা

শরীয়াহ্ নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরন ও মেয়াদী ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট-এর অভাব ইসলামী ব্যাংকিংকে কার্যকর বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত করছে। সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট-এর অভাব আর্থিক গতিময়তা সৃষ্টি করবে না। মুদারাবা সার্টিফিকেট, ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট, মুদারাবা বন্ড, পার্টিসিপেশন টার্ম সার্টিফিকেট, ইসলামিক কমার্শিয়াল পেপার, সলিডারিটি বন্ড ইত্যাদি চালু করা প্রয়োজন।

সরকারী অর্থায়নে সুদমুক্ত উদ্ভাবন ও চালুর অভাব

সরকারের ঘাটতি অর্থ সংস্থান পূরণের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী বন্ড, সার্টিফিকেট তৈরি না হলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত তারল্য (Excess Liquidity) খাটাতে পারবে না। ইসলামী ব্যাংকসমূহের অলস পরিসম্পদ পরিসঞ্চালনের জন্য সরকারী বিভিন্ন অর্থায়ন প্রক্রিয়াকে সুদমুক্ত করা উচিত। যেমন : Govt. Securities, Bonds, Approved Securities-কে Profit Bearing Approved Security-তে পরিণত করা যেতে পারে। সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ লাভ-ক্ষতি ভিত্তিতে সংগ্রহ করা উচিত। বিশেষায়িত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (সরকারী) যাবতীয় কার্যক্রম সুদমুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

সরকারী কর প্রশাসন পরিবর্তনের অভাব

সরকারের কর ব্যবস্থা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সাজানো না হলে বৈধভাবে অর্জিত মুনাফাও কালো টাকায় পরিণত হয়ে যেতে পারে– যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নিয়োজিত না হয়ে অপচয়মূলক ভোগে ব্যয় অথবা বিদেশে পাচার হয়ে যেতে পারে।[৮]

প্রতিশ্রুতিশীল দক্ষ ইসলামী ব্যাংকারের অভাব

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির হওয়ায় ইসলামী আদর্শিক বিষয়াদি, যেমন– ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স প্রায়ই তেমন একটা পড়ানো হয় না। ফলে প্রতি বছর যেসব ছাত্র শিক্ষা জীবন শেষ করে ব্যাংকিং পেশায় আত্মনিয়োগ করে, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে তাদের খুব একটা কিছু জানা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই দক্ষ ইসলামী ব্যাংকার সৃষ্টির পথে এটি একটি অন্তরায়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শুরু করেছেন ইসলামী আদর্শের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল কিছু উদ্যোগী ব্যক্তি– তাঁদের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় এক্ষেত্রে অতি স্বল্প সংখ্যক লোককে শিক্ষিত করা সম্ভব হয়েছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামী আদর্শভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন।

পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও প্রচারণার অভাব

ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সর্বমহলে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কোন সার্বিক ও ব্যাপক উদ্যোগ নেই। ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী (IBTRA) এবং ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো এক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। গতানুগতিক

---

৮. ড. এম উমর চাপড়া, টুয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারী সিস্টেম, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, লন্ডন, ইউকে, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রচারণার মানও তত উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেনি।[৯]

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে সংগঠিত গবেষণার অভাব

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে 'Islamic Economics Division' নামে একটি উপবিভাগ রয়েছে, যাদের গবেষণাকর্ম পাকিস্তানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণে যথেষ্ঠ অবদান রেখেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়াভিত্তিক পরিচালনা নিশ্চিত করা ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে 'ইসলামী অর্থনীতি সেল' নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেলে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে সংগঠিত গবেষণাকর্ম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেলের গবেষণাকর্ম সুষ্ঠু ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে উচ্চতর দক্ষতার অধিকারী বিশেষজ্ঞদেরকে (বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-পিএইচডি ডিগ্রীধারী) গবেষণা বিভাগে নিয়োগদান করা যেতে পারে।[১০]

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব

সুদভিত্তিক ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রায় তিনশ' বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকিং এ সুদভিত্তিক ও পুঁজিভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ও আবহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার বিপরীত। ইসলামী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী নিজস্ব সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের লক্ষ্য অর্জন একটি দুরুহ কাজ।

ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হওয়ায় এর বন্টন দক্ষতা কমে যায়। লাভ-লোকসানভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া উদ্যোক্তা, জমাকারী ও ব্যাংকেরমধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ব্যাহত হয়।[১১]

ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক আবহে পরিচালিত হবার কারণেই অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক প্রধানত বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল এবং বাই-সালাম তথা কেনা-বেচা পদ্ধতিতে তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা প্রচলিত ধারার প্লেজ ও হাইপোথিকেশনের জায়েজ বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যবস্থার সাথে বেচা-কেনা পদ্ধতির সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও তা সাধারণ জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে বোধগম্য হয় না। এ কারণে জনগণের কাছে প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হচ্ছে না। মুদারাবা এবং মুশারাকা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের অনন্য ও আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে কোনভাবেই সম্পর্কিত বা সামঞ্জস্যশীল নয়। এর কোন বিকল্প সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নেই।

---

৯. আব্দুল আউয়াল সরকার, *বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা,* ১ম বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সং, জানুয়ারী-জুন ১৯৯৩, পৃ. ৯২।

১০. আব্দুল আউয়াল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

১১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ,* ৮ম বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সং, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৪, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনও ব্যাপকভাবে মুদারাবা ও মুশারাকা বিনিয়োগ পদ্ধতির চর্চা করতে না পারায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সাধারণ্যে ধারণা সুস্পষ্ট হচ্ছে না। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিবেশের মধ্যে কাজ করছে। ফলে এসব ব্যাংকে শরীয়াহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন, শক্তিশালী ও দক্ষতা সম্পন্ন শরীয়াহ্ সংস্থার মাধ্যমে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান দরকার।[১২]

ইসলামী ব্যাংক এমন একটি পরিবেশে কাজ করছে যেখানে আইন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও মানসিক বিন্যাস সুদভিত্তিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী। এ পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ইসলামী ব্যাংকিং মূলনীতির বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গবেষণার ফলে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংক অনন্য ব্যবস্থা হিসেবে স্বাধীন পরিবেশে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার মাধ্যমেই অর্থনীতিতে তার কল্যাণকারিতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

ইসলামী জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যাংকারের ঘাটতি

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠার কারণে অধিকাংশ ব্যাংকারই পুঁজিবাদী অর্থনীতির আবহ, এর লক্ষ্য ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন। এ পরিবেশেই তারা প্রশিক্ষিত। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে তাদের প্রত্যয় ও অন্তদৃষ্টি এবং মানসিক প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে। তাদের সার্বিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানগত ভিত্তি নির্মাণ, মোটিভেশন প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন খুবই সীমিত। ইসলামী ব্যাংকের জন্য অধিকতর মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন এবং চ্যালেঞ্জ নেয়ার মতো ব্যাংকার প্রয়োজন। কারণ ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত পেশাজীবীদেরকে সদ্য বিকাশমান পদ্ধতির জন্য নতুন নতুন প্রোডাক্টস উদ্ভাবন করতে হবে। গ্রাহকের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে শরীয়ার আলোকে পূরণ করার মাধ্যমেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেয়ত্ব প্রমাণ করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর উন্নততর, স্বতন্ত্র ও বহুলাংশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ পদ্ধতির কারণে শিল্প, প্রযুক্তি এবং ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকারদের অনেক বেশী বাস্তব ধারণা ও জ্ঞান থাকা জরুরী। অধিকন্তু বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ে ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী অগ্রাধিকার এবং বৈধ ও অবৈধতার শরয়ী সীমারেখা সম্পর্কে তাদের সচেতন থাকা জরুরী।

ইসলামী ব্যাংকের কর্মী বাহিনী যাতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয় ভিত্তি অর্জন করতে পারে সে জন্য ব্যাপক ও অব্যাহত পরিচর্যা দরকার, যাতে করে তারা ইসলামী পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগেরমাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন পূরণে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের সংশয়মূলক ধারণা

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কারণে এবং দীর্ঘদিন ইসলামী আর্থিক লেনদেন চালু না থাকার দরুন ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণা ও জ্ঞান খুবই সীমিত কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে নেতিবাচক। অধিকাংশ বিনিয়োগ গ্রাহকেরই সুদ ও লাভের মধ্যে পার্থক্য, শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতি, হালাল-হারামের জ্ঞান এবং ইসলামী আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা নেই। শরীয়াহ্র মৌলিক জ্ঞান এবং হালাল-হারামের

১২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ধারণার প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা খুবই কঠিন। এ জন্য গ্রাহককে সাধ্যমত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা ইসলামী ব্যাংকসমূহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব।[১৩]

গ্রাহকগণকে ইসলামী ব্যাংকিংমুখী করার প্রয়াস এখনো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে। একদিকে গ্রাহকদের শরীয়াহ্ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুধুমাত্র বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জালের মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার কারণে প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা গ্রাহকদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কে দেনাদার-পাওনাদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় এই সম্পর্ক হলো সাহিবুল মাল ও মুদারিব, ব্যবসায় অংশীদার, পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা ইত্যাদি। গ্রাহকদের কাছে এ বিষয়ে ধারণা এখনো স্পষ্ট নয়।

তাত্ত্বিক গবেষণা ও জ্ঞানের সমন্বয়ের অভাব

প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থায় লেনদেন ও বিভিন্নমুখী সেবার প্রোডাক্টগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত ও বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা নতুন। তবে ইসলামী পদ্ধতিতে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের অনেক বেশী সুযোগ ও ক্ষেত্র রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অব্যাহত প্রক্রিয়া। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন ও নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

ইসলামী শরীয়াহ্র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ সুদভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এমন আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট তৈরির জন্য ইসলামী ব্যাংকার ও শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের নিরন্তর ও সমন্বিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকেরই গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ও লোকবলের অভাব রয়েছে। এ অভাব ও ঘাটতি দূর করা ইসলামী ব্যাংকিং-এর পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক এবং তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকার জন্যও জরুরী। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও পেশাদার ব্যাংকারদের মধ্যে জ্ঞানের ও চিন্তার সমন্বয় (Knowledge sharing) প্রয়োজন যাতে করে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট সবাই বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অবদান রাখতে পারেন।

গ্রাহকের ব্যাংকিং প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে ইসলামী নীতির ব্যাপারে আপস করার বা ইচ্ছামতো লাগসই করার একটি প্রবণতা অনেক সময় অনেক ইসরামী ব্যাংকের ব্যাংকারদের মধ্যে কাজ করে। অথচ ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য হলো লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়াহ্ পুরোপুরি প্রতিপালন করা। ইসলামী বিধি-বিধানের সীমার মধ্য থেকেই তাদের কাজকে এগিয়ে নিতে অভ্যস্ত হতে হবে।[১৪]

---

১৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণকারী আইন ও পরিবেশের অভাব

পৃথিবীর অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এমন পরিবেশের মধ্যে কাজ করছে যেখানে জনগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে প্রবল আবেগ থাকলেও সরকার ও প্রশাসনের মাঝে শরীয়াহ্ বিষয়ে আগ্রহ কম। ফলে ব্যাংকিং পদ্ধতিকে ক্রমশ ইসলামীকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব দেখা যায়। ইসলামী দেশসমূহের আন্তর্জাতিক ফোরামে বারবার এ জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেও নিজ দেশে সে ব্যাপারে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নিয়মনীতি এবং আইনের মাধ্যমে দেশের সুদভিত্তিক ব্যাকংগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে, ঠিক সেই অভিন্ন নিয়মকানুনের মাধ্যমেই ইসলামী ব্যাংকসমূহকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র কর্মধারার সাথে এটা অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যশীল নয়।

ইসলামী ব্যাংক এমন এক পরিবেশে অস্তিত্ব লাভ করেছে যেখানকার সকল আইন কানুন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুই সুদভিত্তিক অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম প্রচলিত দেওয়ানী আইন-কানুনের সঙ্গেও সকল ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে দেশের দেওয়ানী আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যক্ষ আইনগত ভিত্তি না থাকার কারণে এবং শরীয়াহ্র ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় উপযুক্ত সমাধান দিতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

সম্পদ ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার আলোকে ঢেলে সাজাতে অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তারা সব সময় স্বাধীনভাবে তাদের কাঙ্খিত ব্যবসাটি নির্বাচিত করতে পারে না। ফলে তাদের কার্যক্রম নিজস্ব চাহিদামাফিক হয় না। প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং গ্রাহকের নির্বাচনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ক্রমশ এক্ষেত্রে ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে।

ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানেন যে, স্বল্পমেয়াদী কিছু তহবিল তাদের মেয়াদপূর্তির পূর্বে উঠানো হয় না। তাই তারা সাধারণত এ তহবিলের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকেন। মেয়াদপূর্তির আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে এ তহবিল উত্তোলিত হলে প্রচলিত ব্যাংক সাধারণত বাইরের কোন উৎস থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু সুদমুক্ত ইসলামী অর্থ ও মূলধন বাজার না থাকায় আকস্মিক জরুরী প্রয়োজন মেটাতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাইরের কোন উৎস থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না। ইসলামী পদ্ধতির আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনাকাঙ্খিত অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।

তারল্য ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহযোগিতার অভাব

'ট্রেজারী বিল' এবং অর্থবাজারে প্রচলিত অন্যান্য চলমান 'সিকিউরিটিজ' প্রভৃতি ব্যবহার করে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো তাদের তারল্য (Liquidity) সংকট এড়াতে পারে। আবার অতিরিক্ত তারল্য কমানোর ক্ষেত্রেও তারা এসব ইনস্ট্রুমেন্ট কাজে লাগাতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের তারল্য সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদভিত্তিক এ ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টের সহযোগিতা নিতে পারছে না। এ জন্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকের তারল্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে পাকিস্তান Participation Term Certificate (PTC) ও Mudaraba Certificate এবং মালয়েশিয়ায় Government Investment Certificate (GIC) চালু করা হয়েছে। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।[১৫]

অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণে ব্যর্থতা

সমাজের অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের উদ্যোগ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখনো আশানুরূপ নয়। দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, ট্রাস্ট ও ইয়াতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসহ বহু সামাজিক খাত এখনো ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়নি।

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার-এ পশ্চাদপদতা

উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং জগতের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি ও নতুন নতুন প্রোডাক্টের উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য অনেক ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে এখনো প্রতিফলিত হয়নি।[১৬]

উন্নত প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে এ ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়াকে পুনর্বিন্যাস করার মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারবে না।

মিডিয়ার ব্যবহার ও প্রচার কার্যক্রমের ঘাটতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখনো প্রচারের ক্ষেত্রে মিডিয়ার সাফল্যজনক ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যক্রম এবং এর সফলতার নানা দিক সম্পর্কে এখনো এমনকি অধিকাংশ মুসলমানই অবগত নন। দুঃখজনক হলো, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা তাদের কার্যক্রমকে গণমুখী করার জন্য মিডিয়াকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে, এক্ষেত্রেও তাদের কোন প্রচার নেই। ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণাগত ও প্রায়োগিক শ্রেষ্ঠত্বকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা ইসলামী ব্যাংকগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী দায়িত্ব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড় রকমের ঘাটতি বিদ্যমান।

ইসলামী অর্থ বাজারের অনুপস্থিতি

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থ বাজারের (Islamic Money Market) অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল অর্থাৎ সাময়িক অতিরিক্ত তারল্য 'সরকারী ট্রেজারী বিল', 'অনুমোদিত সিকিউরিটিস' বা 'বাংলাদেশ ব্যাংক বিল' ইত্যাদিতে বিনেয়াগ করতে পারে না। সুদের কারণে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তারল্য সঞ্চিতির অনুমোদিত অংশ এবং

---

১৫. Meezan Books Guide to Islamic Banking, Karachi, Pakistan.

১৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত তারল্য ঐ সমস্ত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। ইসলামী ব্যাংককে তার সকল জামানত বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ টাকায় জমা রাখতে হয়। এভাবে ইসলামী ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য বিনিয়োগহীন অবস্থায় থেকে যায়। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জনের ওপর এর অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ইসলামী ব্যাংকসমূহের 'ইসলামী মুদারাবা বন্ড' উদ্ভাবনের দাবী দীর্ঘদিনের, যা এখনো কার্যকর হয়নি। সম্প্রতি এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি উদ্যোগ নিয়েছে। Government Islamic Investment Bond (GIIB) নামে এটি খুব শীঘ্রই বাজারে আসবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে একটি পুরনো দাবী পূরণ হবে।[১৭]

নিয়ন্ত্রণমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক স্বতন্ত্র কাঠামোর অভাব

বাংলাদেশ সরকার আইডিবি প্রতিষ্ঠার সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ হিসেবে এ দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ এখনো আশাপ্রদ নয়। আশির দশকের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকিং খাত পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলো, যা নানা কারণে সফল হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকিং খাত ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে ইসলামী শরীয়াহ্‌র আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অনুমতি প্রদান করে। বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে উৎসাহজনকভাবে দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সহযোগিতা দান রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির অংশ। ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক (Regulatory) ও তত্ত্বাবধানমূলক (Supervisory) স্বতন্ত্র কাঠামো এখনো তৈরী হয়নি। অবিলম্বে এ ঘাটতি পূরণ হলে তা এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমে শৃংখলা বিধান সহায়ক হবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন ব্যবস্থা, লাইসেন্স-এর জন্য যথাযথ আবশ্যকতা নির্ধারণ, ন্যূনতম মূলধন ও তারল্যের পরিমাণ নির্ধারণ, ঝুঁকি পরিমাপিত সম্পদ শ্রেণীকরণ ব্যবস্থাসহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিবেচনাপ্রযুক্ত ব্যবস্থা (Prudential Regulation) প্রণয়ন করা উচিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একটি গাইড লাইন প্রণয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন মহাব্যবস্থাপককে প্রধান করে একটি 'ফোকাস গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে।[১৮] এতে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব

কোন পদ্ধতিই কেবলমাত্র তার নিজস্ব উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাকে আরো অনেক সহযোগী (Supportive) প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়। এটা ইসলামী ব্যাংকের জন্যও প্রযোজ্য। কোন উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থনীতিবিদ, আইনবিশারদ, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, ব্যবস্থাপনা পরামর্শক, নিরীক্ষক এবং এরূপ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের সেবা দ্বারা লাভবান হতে পারে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে ওঠেনি। সিনিয়র ইসলামী ব্যাংকারদের উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে

---

১৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নেই। এছাড়া কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি।[১৯] গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্যও ইসলামী ব্যাংকসমূহের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফোরামের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে এ ধরনের সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেনি।

জ্ঞান ও দক্ষতা এবং কমিটমেন্ট-এর ঘাটতির কারণে শরীয়াহ্ পালনে ত্রুটি

জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি এবং ইসলামী বিধি-বিধান পুরোপুরি অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির অভাবের কারণে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংকারদের শরীয়াহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে কিছু দোষ-দুর্বলতা ধরা পড়ে। এখানে এ ধরনের কয়েকটি সাধারণ ত্রুটির উল্লেখ করা হলো। এসব ত্রুটি দূর করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা এবং ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ় প্রত্যয় প্রয়োজন।

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রাহকের ডিলারশীপ লাইসেন্স বা আমদানী লাইসেন্স ব্যবহার করে ব্যাংক গ্রাহকের নির্দেশিত মাল ক্রয় ও আমদানী করে এবং এরপর বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। এ ধরনের ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে তার লাইসেন্স ব্যবহারের অনুমতি পত্র (Letter of Authority) নেয়া জরুরী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য না বোঝার কারণে তা নেয়া হয় না। ফলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে ত্রুটি দেখা দেয়। হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (HPSM) পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবকাশকালীন (Gestation period) সময়ে ভাড়া চার্জ ও আদায় করার বিষয়টি শরীয়াহ্সম্মত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ব্যত্যয় ঘটে থাকে। প্রাক-জাহাজীকরণ (Pre-Shipment) মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফার পরিবর্তে পূর্ব নির্ধারিত হারে মুনাফা আদায় করা শরীয়াহ্ অনুমোদিত নয়।[২০] এক্ষেত্রেও কোন কোন ব্যাংক ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেওয়া অথবা ক্যাশমেমো না পাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য। চুক্তির দলিলের ছক পূরণ না করে খালি ও তারিখবিহীন রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর। কিন্তু অনেক সময় এ ত্রুটি দেখা যায়। ব্যাংকের পণ্য ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পেমেন্ট অর্ডার, ডিডি, টিটি ইত্যাদিতে ব্যাংকের অফিসারের স্বাক্ষর করার কথা। তার পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষর করার কোন কারণই থাকতে পারে না। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। ক্যাশমেমোতে টাকার পরিমাণের সাথে অনেক সময় বিনিয়োগের পরিমাণের মিল পাওয়া যায় না। ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক সরাসরি বিক্রেতা থেকে মালামাল গ্রহণের সুযোগ নেই। এক্ষেত্রেও ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। স্টক-লট-এর ক্ষেত্রে অনেক সময় বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। এ ধরনের ভুয়া ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা নেই।

শেষকথায় বলা যায়, 'জীবনের বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধানে ইসলামী শরীয়াহ্ বিশ্বজনীন সমাধান দিয়ে আসছে এবং শত শত বছর ধরে এমনিভাবে শরীয়তী বিধানসমূহ মানুষের কল্যাণ করে আসছে। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলামের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।'[২১] সে দৃষ্টিভঙ্গির একটি দিক হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং এবং ফিন্যান্স। উপরে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

---

১৯. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

২০. মোহাম্মদ আবদুল মান্না, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

২১. প্রফেসর এ আর আই দোয়ী, 'শরিয়তের বিধান, অপপ্রচার ও ভ্রান্তি', *ছাত্র সংবাদ*, ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

এতে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বর্তমানে কোন কিতাবী তত্ত্বগত ধারণা নয়; বরং বাস্তবে প্রচলিত সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থার নাম। এ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব বুঝাতে গিয়েই প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম. উমর চাপড়া বলেছেন :

> It seems that the Islamic system would perform better on several other plans including resource allocation, savings and capital formation, economic deffeciency and growth and stability. It would also bring about a lower monetary expansion and reduce in flationary pressures by helping attain a better balance between the supply and use of resources.[২২]

২২. ড. এম উমর চাপড়া, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাফল্য

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণে ব্যাপক আগ্রহ বৃদ্ধি

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ কার্যক্রমের মুখপাত্র ইসলামী ব্যাংকসমূহ পাইওনিয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ সাফল্য অবলোকন করে অন্যান্য সুদী ব্যাংকসমূহও ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় এগিয়ে এসেছে, যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে।

(৩১.১২.২০০৬ তারিখে সমাপ্ত বছর পর্যন্ত)

(মিলিয়ন টাকায়)[২৩]

ক্রমিক	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	শাখা সংখ্যা	মোট জনশক্তি	মোট আমানত	মোট বিনিয়োগ	লাভ/ লোকসান
	পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক						
০১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৯৮৩	১৭৬	৬৫৭৫	১৩২৮২.৫৮	১২৩৮৫.৪৪	৩৫২.৭৭
০২	ওরিয়েন্টাল ব্যাংক	১৯৮৭	৩০	৭০০	–	–	–
০৩	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক	১৯৯৫	৪৬	৮৭৫	১৬৭৭.৫৩	১৬১৩.২৭	১০০.৩১
০৪	সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক	১৯৯৫	২৪	৬৮৫	১৬১৪.৫১	১৫৩৭.৪৩	৩০.০৪
০৫	এক্সিম ব্যাংক	১৯৯৯	৩০	১০২০	৩৫০৬.৫৬	৩২৬৪.১৩	১৪১.৩২
০৬	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	২০০১	২১	৩৭৭	১৮০৯.০৬	১৬২৮.১৮	৮৫.০০
	মোট		৩২৭	১০২৩২	২১৮৯০.২৪	২০৩৬২.৪৫	৭০৯.৪৪
	সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা						
০১	প্রাইম ব্যাংক	১৯৯৫	০৫	৭৫	৭০৭	৪৯০	২৮.৮৯
০২	যমুনা ব্যাংক	২০০১	০২	২৯	৮৭	১০৯	৭০২৬
০৩	ঢাকা ব্যাংক	২০০৩	০২	২০	৩১২	১৬১	৫.৩৪
০৪	সাউথইস্ট ব্যাংক	২০০৩	০৫	৬৯	৪০৭	১৪২	৯.৫৩
০৫	প্রিমিয়ার ব্যাংক	২০০৩	০২	৪০	১৭২	৮০	২.৭০
০৬	সিটি ব্যাংক	২০০৩	০১	২৭	১১১	৬৩	৫.০৫
	মোট		১৮	২৬৯	১৯০৫	১০৬৭	৬০.২২
	সর্বমোট		৩৪৫	১০৫০১	২৩৭৯৫.২৪	২১৪২৯.৪৫	৭৬৯.৬৬

২৩. সূত্র : বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক পি আর ডি।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ৩১.১২.২০০৩ তারিখে মোট জমার পরিমাণ ছিলো ১,১২৮,২১০.০০ মিলিয়ন টাকা। তার মধ্যে সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট জমা ছিলো ২৩৭৯৫.২৪ মিলিয়ন টাকা। এটি দেশের মোট জমার শতকরা ১১.৬৩ ভাগ। দেশীয় অর্থনীতিতে এ সময় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো ৯০৩,১০০.০০ মিলিয়ন টাকা। তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ছিলো ২১৪২৯.৪৫ মিলিয়ন টাকা, যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ১১.১৫ ভাগ।[২৪]

সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

বাংলাদেশে ৮টি সুদভিত্তিক ব্যাংক প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক আল ফালাহ্ তাদের বর্তমান সংগঠন কাঠামোর মধ্যেই পৃথকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা চালু করেছে এবং এসব শাখা ইসলামী নীতিমালা অনুসারে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে উল্লেখিত ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহের উন্নয়নধারা সন্তোষজনক।[২৫]

জমাগ্রহণ পদ্ধতিতে সফলতা

আল ওয়াদিয়া

আল ওয়াদিয়া আরবী শব্দ 'ওয়াদিয়ুন' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে রাখা, জমা করা, ছেড়ে দেয়া, ত্যাগ করা ইত্যাদি। আল-ওয়াদিয়া মানে ব্যবহারের অনুমতিসহ আমানত রাখা। ইসলামী ব্যাংক আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে সংরক্ষণ ও নিরাপদ হেফাজতের লক্ষ্যে গ্রাহকদের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে এ শর্তে যে, আমানতের অর্থ গ্রাহককে চাওয়ামাত্র ফেরত দেবে। এই নীতিমালার অধীনে ব্যাংক চলতি হিসাব খোলে। গ্রাহকের অনুমতির ভিত্তিতে ব্যাংক তার নিজস্ব ঝুঁকিতে এ আমানতের অর্থ ব্যবহার করে। গ্রাহক এ ধরনের আমানতের উপর ব্যাংক থেকে কোন মুনাফা নেয় না।

ক. আল মুদারাবা

মুদারাবা শব্দটি আরবী 'দারব/দারবুন' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহর রহমত (মুনাফা) লাভের আশায় পরিভ্রমণ। মুদারাবা হচ্ছে এক ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তি। এখানে এক পক্ষ 'সাহিবুল মাল' বা 'রাব্বুল মাল' (অর্থের মালিক তথা যোগানদাতা)। তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের মাধ্যমে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন, তবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না। অপরপক্ষ 'মুদারিব' মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসা ও শিল্পে শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করেন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এখানে মুদারিব ট্রাস্টি বা ব্যবসায়ে প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করেন। ব্যবসায় লাভ হলে চুক্তির শর্ত অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত হারে উভয়ে তা ভাগ করে নেন এবং লোকসান হলে সাহিবুল মাল বা পুঁজির মালিককে পুঁজির লোকসান বহন করতে হয়। মুদারিবের লোকসান হয় তার সময় ও শ্রম এবং বিনিয়োজিত মেধা।

---

২৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

২৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, (যন্ত্রস্থ)।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংক অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর আকর্ষণ

ক. লাভ-লোকসান অংশীদারী পদ্ধতি (Profit & Loss Sharing mode) : শিরকাত/মুশারাকা।

খ. মুনাফায় অংশগ্রহণ এবং লোকসান বহন পদ্ধতি (Profit Sharing Loss Bearing mode : আল মুদারাবা।

গ. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি বা (Buying & Selling mode) : বাই-মুরাহাবা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম, বাই-ইসতিসা।

ঘ. ভাড়ায় অংশগ্রহণ পদ্ধতি (Rent Sharing mode) : ইজারা, ইজারা ওয়া ইকতিনা, মালিকানায় শরিকানার ভিত্তিতে ভাড়া ক্রয় (এইচ পি এস এম)।

ঙ. উৎপাদনে অংশগ্রহণ পদ্ধতি (Production Sharing mode) : মোজারা, মুসাকাহ।[২৬]

কৃষি খাতে বিনিয়োগ-এ সফলতা

কৃষি খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পর্যাপ্ত নয়। এ খাতে বিনিয়োগ তাদের মোট বিনিয়োগের ০.৯২ শতাংশ মাত্র। এর প্রধান কারণ হলো, কৃষিখাত বিনিয়োগের জন্য কৃষি ব্যাংকের মতো বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংগুলো কৃষি খাতে বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহও গ্রামীণ এলাকায় তাদের শাখা যথেষ্ট সম্প্রসারিত করতে পারেনি। তবে এদেশের প্রথম শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৫ সাল থেকে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করার মাধ্যমে এক্ষেত্রে তার ভূমিকা সম্প্রসারিত করে চলেছে যা এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে।

শিল্পখাতে বিনিয়োগ-এ সফলতা

বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ২৭.২ শতাংশ। শিল্পখাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ অত্যন্ত সন্তোষজনক। বাংলাদেশের সকল ইসলামী ব্যাংক প্রকৃতিগতভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক। তবু তারা দীর্ঘমেয়াদী জমা সংগ্রহ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ৩১.১২.২০০৩ তারিখ পর্যন্ত তাদের মোট বিনিয়োগয়োগ্য তহবিলের ৩৩.২২ শতাংশ শিল্পখাতে বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে ১৫.৬৮ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের চলতি মূলধন হলো ১৭.৫৪।

সেবাখাতে বিনিয়োগ-এ সফলতা[২৭]

বাংলাদেশের জিডিপিতে সেবাখাতের অবদান ৪৯.৪ শতাংশ। এ খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের মূলধনের শতকরা ৬৫.৮৬ ভাগ বিনিয়োগ করেছে। ৩১.১২.২০০৩ তারিখে সেবাখাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারী বিনিয়োগ ছিল নিম্নরূপ :

- পাইকারি ও বেসরকারি বাণিজ্য (Wholesale & Private Trade) ৪৯.৩১%

---

২৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

২৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

- নির্মাণ (Construction) ০৬.৩৯%
- পরিবহণ ও যোগাযোগ (Transport & Communication) ০৩.৩৬%
- বিবিধ (Miscelleneous) ০৬.৮০%

মোট : ৬৫.৮৬%

দারিদ্র বিমোচন এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে বিনিয়োগ

দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম অনুপস্থিত। এ পটভূমিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর এই কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৮ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৩১.০৫.২০০৪ তারিখ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩৭০০টি গ্রামের তাদের টার্গেট গ্রুপের ১,৪৬,০০০ জন সদস্যকে তাদের প্রকল্পভুক্ত করেছে। এই প্রকল্পে ব্যাংক প্রত্যেক গ্রাহককে ৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে ব্যাংক এই প্রকল্পের অধীনে ২৯২৩.৫৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। ৩১.১২.২০০৩ তারিখে এই প্রকল্পে বিনিয়োগ স্থিতির পরিশান ছিল ৫৭০.৮৮ মিলিয়ন টাকা। এই প্রকল্পে আদায়ের হার ৯৯%, যা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিভিন্ন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তার মধ্যে রয়েছে যুবসমাজের জন্য 'আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প', দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'শিক্ষা কার্যক্রম', দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য 'স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম', 'মানবিক সাহায্যদান কার্যক্রম', 'ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম', উপকূলীয় অঞ্চলে 'সেবা কার্যক্রম', 'টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র', 'মসজিদ সংস্কার', 'দাওয়াহ কার্যক্রম', 'দুঃস্থ মহিলাদের বিক্রয়কেন্দ্র', এবং 'ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল'।

অন্যান্য সম্ভাবনাসমূহ

সম্ভাবনার শুভ শক্তি-প্রবাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে গতিশীল হবে বলে ইসলামী আদর্শবাদে বিশ্বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের সমর্থন মূর্ত হচ্ছে সমকালীন ইতিহাসের ঘটনাচক্রে। সে সবকিছুর মূল্যায়ন করে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার নিজস্ব নৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতির অধোগতির প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে কিছু কিছু আশার বলিষ্ঠ দীপ্তি বিকাশ লাভ করেছে বলতে পারি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে যে সকল সম্ভাবনা মৌলিকভাবে প্রতীয়মান হয় তার পাশাপাশি নিম্নোক্ত সম্ভাবনাগুলোও আশার আলো দেখায়।

১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে উপলব্ধি ক্রমশই বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর হচ্ছে। তার শক্তিকে উপেক্ষা করা সুস্থ সমাজ-সচেতন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনশীলতার গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলেই তা বোঝা যায়।

২. উপলব্ধি ফলপ্রসূ করতে হলে সকল পর্যায়েই সাংগঠনিক উদ্যোগ প্রয়োজন। সে উদ্যোগও ক্রমেই বলিষ্ট থেকে বলিষ্ঠতর হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সকল উদ্যোগের তথ্যই তা প্রমাণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আত্মবিশ্বাসকে বস্তুনিষ্ঠ রূপ দিতে হলেই প্রয়োজন পরনির্ভরশীলতা হ্রাস। সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এবং অন্য দরিদ্র দেশগুলো সমানভাবে পরনির্ভরশীল শিল্পপ্রতিষ্ঠার পুঁজি, যন্ত্রপাতি আমদানী করার প্রয়োজনে– এমনকি দেশরক্ষা কাজের সমরাস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনেও। এর পরনির্ভরশীলতার মাত্রা হ্রাস করা জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিকল্পনা সাপেক্ষ। সে পরিকল্পনাকে সুসমন্বিত করা অনিবার্য। আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এ ব্যাপারে সহযোগিতা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এমনি আরো আঞ্চলিক সহযোগিতা কাউন্সিল সংগঠন প্রয়োজন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি থেকে শুরু করে পুঁজিদ্রব্য, আর আত্মরক্ষার জন্য সমরাস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে সমন্বয়ের প্রয়োজন। প্রগতিশীল পরিকল্পনার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো থেকে পরনির্ভরশীলতা যথাসাধ্য হ্রাস করা প্রয়োজন। উদ্যোগ গ্রহণ করলেই সুফল অর্জন সম্ভব।

৪. শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রগতির প্রয়াসের সাফল্য লাভ সীমিত হতে বাধ্য। বিরুদ্ধ শক্তিকে শক্তির ভাষায় বোঝাতে পারলেই শুধু রাজনৈতিক সমঝোতা সৃষ্টি সম্ভব হয় অনেক ক্ষেত্রে। আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতার অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তির ভাষায় যেমন বুঝিয়ে দিল সাম্প্রতিক লেবাননের সংঘর্ষে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় শক্তি ইসরাঈলী আগ্রাসনকে সমর্থন যোগানো, শান্তিরক্ষী বাহিনীর অপসারণ এবং জামায়েলের ওয়াশিংটনের পরিবর্তে দামেশকে যাতায়াত করে সমাধানের সন্ধান তারই সাক্ষ্য বহন করছে।[২৮] এ শিক্ষাকে সম্মুকে রেখেই নতুন নীতি-কৌশলের পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সহযোগিতা আর সমন্বয়েই তা সম্ভাবনাময়।

৫. উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়িত করার কাঠামোতেই প্রতীয়মান হবে, ইসলামী আদর্শবাদ ও ইসলামী অর্থনীতির অনেক উপাদানকে সাদর আহবান জানানোর সামাজিক প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়েছে। তাতেই কাঠামোগত রূপান্তর প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হবে। বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা তো এখনো চলছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিশ দেশে। যেমন দশ-বিশটি পাশ্চাত্য পদ্ধতির ব্যাংকের সাথে দুয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত হয়ে 'মুদারাবা' নীতির অভিনবত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছে। সমাজের কাঠামোতে শ্রেণী-বিন্যাসের জন্যই এমনি দু'একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নিঃসন্দেহে হতে পারে। কারণ, ধর্মভীরু ইসলামী নীতিতে বিশ্বাসী মানুষের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সংখ্যাই তার নিশ্চয়তা দান করতে পারে। তার চেয়ে বেশি কিছু অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সাধারণভাবে। সে হবে দ্বিমুখী। একদিকে দরিদ্র দেশগুলোর চিন্তানায়ক ও পরিকল্পনাকারীরা বুঝবেন, ইসলামী অর্থনীতির ভোগ-নিয়ন্ত্রণ সঞ্চয়কে আর সুদের নির্বাসন কর্মোদ্যোগকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিষ্ঠতর করতে পারে। অন্যদিকে সম্পদশালী দেশগুলো ইসলামী অর্থনীতির আন্তর্জাতিক প্রয়োগে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে আন্তর্জাতিক যাকাত আদায় মাধ্যমে এবং তারও অধিক সাহায্য দানের নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে। তার ফলে দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর বিরাট জনসংখ্যা লাভ করবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা– যে নিরাপত্তা দরিদ্র অর্থনীতি থেকে জাতীয়ভাবে সম্ভব নয় আবার পাশ্চাত্য দেশগুলোর ওপর থেকে হ্রাস করে দিতে পারে নির্ভরশীলতাকে এবং মুক্ত করে দিতে পারে পর্বতপ্রমাণ সুদের গুরুভার থেকে আর অর্থনৈতিক শোষণ থেকে।

---

২৮. অধ্যাপক রায়হান শরীফ, *ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা,* ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৪, পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬. দৈন্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, পরনির্ভরশীলতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি পাবে মুসলিম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের। জনবল সেক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে অর্থনীতির কল-কারখানাই শুধু ঘোরাবে না, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে পারে শত্রুর বিরুদ্ধে– মুসলিম বিশ্বের যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে।

৭. নৈতিকতা ছাড়া অর্থনীতি আর জড়-সম্পদের সমৃদ্ধি জীবনকে, সংস্কৃতিকে এবং সভ্যতাকে করে দেয় পতনমুখী ও ধ্বংসমুখী। সে চেতনা সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য দেশে এসেছে। কিন্তু এ চেতনা সমাজ ধ্বংসের ও মূল্যবোধ ধ্বংসের নাটকীয় প্রদর্শনীকে উৎসাহদান করার পর এসেছে। ষাট দশকের যৌন স্বেচ্ছাচারের 'বিপ্লব'কে উৎসাহদানের অভিজ্ঞতার ধ্বংস ফলের জরিপ অনুসন্ধান করে এখন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে, সে বিপ্লবের তাণ্ডব সত্তর দশকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এখন বিয়ের হার অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অনেক হ্রাস পাচ্ছে, বিবাহ-পূর্ব স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পাচ্ছে ইত্যাদি।[২৯] কিন্তু তাণ্ডবলীলা শেষ হলে কি হবে; উন্নত দেশে অনাচার প্রবর্তন হলেই অদ্ভুতভাবে তা উদার সংস্কৃতির মর্যাদা পেয়ে পরনির্ভরশীলতার দরজা দিয়ে দরিদ্র মুসলিম ও অমুসলিম সব জাতির জীবনে প্রবেশ করে– শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে এবং দেশের ভবিষ্যত যুবশক্তির মন-মগজকে গ্রাস করে। মাদক দ্রব্যের আক্রমণও একই ধরনের পরিণতি আনে। এ সকল পরিণতিকে রোধ করতে হলে শুধু পরনির্ভরশীলতার আমদানী দ্রব্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেই চলবে না। প্রয়োজন কাঠামোগত সমাজ সংস্কার– সামাজিক আন্দোলন ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সংস্কারের মাধ্যমে। সে সবের জন্য প্রস্তুতিও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া-সাপেক্ষ। ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয়তাবাদের সত্যিকার সংজ্ঞা আবিষ্কার করে নীতি নির্ধারণ করতে পারলে কঠিন পরিস্থিতিতেও নতুন বলিষ্ঠ যাত্রা শুরু সম্ভব– ইসলামী আদর্শবাদের ও ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন সম্ভব। আত্মবিশ্বাস ও আত্মজিজ্ঞাসাকে পাথেয় করে অগ্রগতির পথ নির্বাচন করে নিলে সমাজেরও অগ্রগতি আসবে। এ পথে মূল্যবোধভিত্তিক অর্থনীতিরও অগ্রগতি আসবে।[৩০]

৮. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অধোগতি আর শোষণ-লোক-লালসাভিত্তিক অর্থনীতি কল্যাণ সৃষ্টির পরিবর্তে মানুষের অকল্যাণ সৃষ্টির নেতৃত্ব দান করছে। তাই তারই প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সমাজের দূরদর্শী গবেষকগণ তাকাতে চান মানুষের ঐতিহ্যমূলক জ্ঞান-ভাণ্ডারের দিকে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দিকে আর নয়। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মানুষের হাতের হাতিয়ার। মানুষের মানস-চরিত্রকে কল্যাণমুখী করা প্রয়োজন। তারই সন্ধানের পরিণতি শুমেকারের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে :

> The guidance we need for this work cannot be found in science and technology, the value of which utterly depends on the ends they serve; but it can still be found in the traditional wisdom of mankind.

অর্থাৎ এ কাজের জন্য আমাদের যে পরিচালনা-কৌশল প্রয়োজন, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে তা পাওয়া যাবে না। ওসবের মূল্য একেবারে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যেসব উদ্দেশ্য ঐ সবকে ব্যবহার করা হয়, তার ওপর। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিচালনা কৌশলকে এখনো পাওয়া যেতে পারে মানুষের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের মধ্যে।[৩১] মানুষের উদ্দেশ্যে ঐতিবাহী জ্ঞান তো মানুষের

---

২৯. সাপ্তাহিক 'টাইম', ৯ এপ্রিল, ১৯৮৪।

৩০. অধ্যাপক রায়হান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

৩১. E.F. Schumacher, Small is Beautiful, Abacus, London, 1978 (Reprinted), p. 250.

Dhaka University Institutional Repository

স্রষ্টার তরফ থেকেই এসেছে : 'জালিকার কিতাবু ফিহ্'। সে কুরআন ও বিশ্বনবীর বাণীভিত্তিক জ্ঞানের বিশ্লেষণ আর নীতিমালাই তো মানুষের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান। সে জ্ঞান অবলম্বন করেই ইসলামী জীবনদর্শন ও ইসলামী অর্থনীতি। জ্ঞানের বিবর্তনে চিন্তাধারা তাই অনুকূল হয়ে এসেছে সর্বত্র। প্রয়োজন শুধু সুচিন্তিত পরিকল্পনার, তার সমন্বয়ের এবং উপযোগী সংগঠনের। এমনকি এ প্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদদেরও রয়েছে গুরুদায়িত্ব :

> Serious efforts in this direction can open a new era of understanding economics and the institutions on which economics stands within the framework of Islamic society.[32]

সমস্যা সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সেই উদ্যোক্তা, সংগঠক পরিকল্পনাবিদ আর সমন্বয়কের দিকে তাকিয়ে আছে ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগে আগ্রহী মানুষেরা।

---

৩২. M. Raihan Sharif, The Islamic Economy : Principles and Applications, 1984 (in Press), Introduction, p.9.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : নয়

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ অনুসরণীয় কৌশল

বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক দারিদ্র্য, সামাজিক অসাম্য, সামাজিক অবিচার, সম্পদের কুক্ষিগতকরণ, লক্ষ লক্ষ্য বেকার যুবকের ঢল, অস্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য, বিদেশী সম্পদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, নিরক্ষরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এমনি আরো অনেক কিছু।

এসব হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ তৎপরতার ফসল। শরীয়াহ্‌র ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সামগ্রিক পুনর্গঠনই কেবল ধীরে ধীরে এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমাদের দেশ বিপুল সংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সাংবিধানিকভাবে দেশটি ইসলামী নয় বলে রাতারাতি সমস্ত ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বর্ধিত সংখ্যায় ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের পথ পাশাপাশি নব নব অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে। বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকগুলোর সংখ্যা ও কর্মতৎপরতা নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রসারিত করতে হবে। আর এ সময়ের মধ্যে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের দক্ষতা গুণগত ও সংখ্যাগতভাবে বৃদ্ধি করবে যাতে তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশে শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা উন্নয়নে কতিপয় অনুসরণীয় কৌশল উল্লেখ কর হলো।

বিনিয়োগ পরিকল্পনার ক্ষেত্র নির্দেশ

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করতে হবে।

ক. দেশের দারিদ্রসীমা নির্মূল অথবা অন্ততঃপক্ষে হ্রাস।

খ. দেশের বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সার্বিক ব্যবহার।

গ. ধীরে ধীরে কর্মসংস্থান সর্বোচ্চ বৃদ্ধি বা বেকারত্ব হ্রাস।

ঘ. দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন।

ঙ. জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির একটি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

চ. অঞ্চলভিত্তিক খাতওয়ারী ও মানুষের শ্রেণীগত অসমতা হ্রাস।

ছ. একটি অনুকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্য অর্জন।

জ. বিনিয়োগ কর্মসূচী জনিত অপ্রয়োজনীয় মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে তাদের বিনিয়োগ যথাযথভাবে বরাদ্দ করতে হবে :

ক. কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার মত অর্থনৈতিক তৎপরতার মূল এলাকাসমূহের মাধ্যমে বাণিজ্যিক খাতসমূহে বিনিয়োগ বরাদ্দ করা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিনিয়োগ বরাদ্দ এমন একটি পদ্ধতিতে করতে হবে যাতে করে অর্থনৈতিক খাতের আপেক্ষিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা অন্যদের চেয়ে অধিক লাভবান হন।

অর্থনৈতিক তৎপরতার নতুন এলাকাসমূহের দিকে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নজর দিতে হবে :

ক. শিক্ষা খাত

১. চাকরি লাভের পর পরিশোধের শর্তে ছাত্রদের অর্থ প্রদান;
২. বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ যোগান দেয়া;
৩. মহানগরী এলাকায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থলগ্নী করা।
৪. প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক ছাত্র টার্গেট করে বিনিয়োগ।
৫. মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজের শর্তে বিনিয়োগ।
৬. এম ফিল, পি এইচ ডি গবেষকদের শর্তসাপেক্ষে বিনিয়োগ।
৭. উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পড়াশোনায় বিনিয়োগ।

খ. শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়

শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাংককে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। আইবিবিএল-কে 'ব্যাংকযোগ্য প্রকল্পসমূহ' গড়ে তুলতে হবে। বেকার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়াস চালাতে হবে। এ উদ্দেশ্যে গ্রুপ ঋণ-এর ভূমিকা বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পাঁচজনের একটি গ্রুপকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

গ. স্বাস্থ্য খাত

১. চাকরিজীবী ব্যক্তিদের হাসপাতাল ব্যয় নির্বাহে অর্থ যোগান দেয়া।
২. ক্লিনিক ও ডিসপেনসারিতে অর্থ যোগান দেয়া।
৩. ল্যাব, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য বিনিয়োগ।
৪. ফার্মাসিউটিক্যালস বা ঔষধ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনিয়োগ।

ঘ. গৃহ নির্মাণ খাত

শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করার বিষয়টি ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত দিকগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

১. একটি সম্মত ভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণ আদায় করা যাবে এমন চুক্তিতে সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্বীকৃত নিয়োগকারীদের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণে সহায়তা দেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

২. উপরে (১)-এ উল্লেখিত সংগঠনগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তাদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন আবাস উন্নয়নে অর্থ যোগান দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের বিনিয়োগের ভিত্তি হতে পারে পেনশন/গ্রাচুইটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা ছাড়াও কর্মচারীদের বাড়ী ভাড়া ভাতা।

৩. ইসলামী ব্যাংকগুলো ভূসম্পত্তি ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ধরনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে যাদের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষে গৃহনির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এ ধরনের কর্মসূচী নিম্নআয়ের গ্রুপগুলোর জন্য পরিচালিত হতে হবে। ব্যক্তির কাছ থেকে নয়, সহায়ক সংস্থার মাধ্যমে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. যোগাযোগ খাত

১. বেসরকারী যোগাযোগ খাত বিশেষ করে চাকরিজীবীদের জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলো বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর সুপারিশ এবং পেনশন/গ্রাচুইটি তহবিল হস্তান্তরযোগ্য করা যেতে পারে। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে টাকা আদায়ের একটি উন্নত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২. মহানগরী এলাকায় সরকারী যানবাহন খাতে বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকগুলো সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে।

৩. কতিপয় সহায়ক দলিল/নিশ্চয়তাপত্রের মাধ্যমে বিদেশগামীদের বিমান টিকেটে বিনিয়োগের কথা ইসলামী ব্যাংকগুলো বিবেচনা করে দেখতে পারে।

চ. পল্লী ব্যাংকিং

যেহেতু দেশের জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যক মানুষ পল্লী এলাকা বাস করে, তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোকে পল্লী এলাকায় তাদের কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংক বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জনগণের মধ্যে বিনিয়োগ করছে সেভাবে এক বা একাধিক ইসলামী ব্যাংক অথবা তাদের সহায়ক সংস্থাগুলো পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারে।

ছ. ঋণদান কেন্দ্র

পল্লী এলাকায় বিনিয়োগের জন্য ইসলামী ব্যাংক তাদের কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে। এই কেন্দ্রগুলো ঋণদানকারী হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। যেমন :

১. ভাড়ার ভিত্তিতে কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য কৃষি সরঞ্জাম সংগ্রহ করা।

২. ভাড়ার ভিত্তিতে দেয়ার জন্য সেচ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা।

৩. ভাড়ার ভিত্তিতে দেয়ার জন্য স্বাস্থ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা। পল্লী ও শহর এই উভয় এলাকার জন্য এ কেন্দ্রগুলোর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

অর্থপূর্ণ ও কার্যকর বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অর্থপূর্ণ বিনিয়োগ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে সতিই যদি কোন আন্তরিক পদক্ষেপ নিতে হয় তাহলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করতে হবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাযোগ্য বিষয়ের কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আভাস দেয়া হলো :

১. বিনিয়োগ পরিকল্পনার ব্যাপকভিত্তিক সাফল্য নির্ভর করে ব্যাংকের জেলা/উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত, যথাযথ ও বিশ্বস্ত উপাত্তভিত্তিক উন্নয়নের উপর। বিশ্বস্ত বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি করতে হলে ঋণ গ্রহণকারী ইউনিটের সাথে সাথে ব্যাংকের মধ্যেও উন্নত তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. তদুপরি প্রয়োজনীয় ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানব সম্পদ মেশিনারীরও প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া সম্ভাবনাপূর্ণ ও বর্তমান এ উভয় ধরনের বিনিয়োগকারীদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দানের প্রয়োজন রয়েছে।

৩. বর্তমানে বিনিয়োগ নীতি এবং কয়েক ধরনের শিথিল বিনিয়োগ পরিকল্পনা সামষ্টিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে সামষ্টিক ভিত্তিতে গৃহীত নীতি বাস্তবায়নে ব্যষ্টিক পর্যায়ে উৎপাদক ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে তহবিলের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের মধ্যে ব্যাংকারদের পার্থক্য করতে হবে। এতে অবশ্য বিনিয়োগের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যা থেকে যায়।

৪. প্রস্তাবিত প্রকল্পের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা বিচার করার আগে বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা বিচার করতে হবে।

৫. সম্ভাবনাপূর্ণ ও বর্তমান বিনিয়োগকারী–এ উভয়কেই তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিনিয়োগ পূর্ব ও বিনিয়োগ পরবর্তী পরামর্শদানের বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে।

৬. ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক ও অর্থবহির্ভূত– এ উভয় ধরনের সার্বিক সার্ভিস দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা বিনিয়োগকারীদের বহুবিধ ঝামেলা থেকে রক্ষা করবে যা বিনিয়োগকারীদের সাফল্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৭. বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকদের ঋণ পরিশোধ আচরণ বিনিয়োগ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই কেবল নয়, ব্যাংকের ব্যয়-লাভ পর্যালোচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ব্যষ্টিক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধ আচরণের বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ ধরনের নিরীক্ষা বিনিয়োগের ব্যবহার ও পরিশোধের বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হওয়ার যথাযথ দিক-নির্দেশনা দেবে।

৮. প্রতিটি ব্যাংকের প্রতিটি শাখার বাজেটে বিনিয়োগ পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুটি সংযুক্ত এবং তার অগ্রগতি নিয়মিত মনিটর করতে হবে।

৯. একটি ব্যাংকের তার গ্রাহকের পরবর্তী তিন মাসের আশু চাহিদা সম্পর্কে খুবই সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তবে এ সময়সীমা কোনক্রমেই এর চেয়ে বেশী হবে না।

১০. বিনিয়োগ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরো একটি সমস্যা বিবেচনা করতে হবে এবং তা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত বিনিয়োগ সম্পদের উৎপাদনমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েক ধরনের মূল্য সমন্বয় সাধনের কথা বিবেচনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. একটি নির্ধারিত সময়ের বিনিয়োগ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার পূর্বে স্ট্যান্ডিং কমিটি হিসেবে দলবদ্ধভাবে সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ শাখা, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ ও আলোচনাকে উৎসাহিত করতে হবে। এ ধরনের দলে ব্যাংকার ও বিশেষজ্ঞ ছাড়াও সকল প্রকার অর্থনৈতিক তৎপরতার সাথে জড়িতদের পাশাপাশি জনগণের সকল স্তরের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই টীম অতীতের পরিকল্পনা মূল্যায়ন, ঐ সময়ের বিনিয়োগ পরিকল্পনার ত্রুটি চিহ্নিতকরণ এবং এই ত্রুটির কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে বের করবে। এভাবেই তারা পূর্ববর্তী বিনিয়োগ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পূর্ববর্তী সময়ের উন্নততর বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

একটি বা দু'টি ক্ষেত্রে এক বা দু'টি শ্রেণীর মানুষের ওপর গুরুত্বারোপ করে অন্যান্য খাত ও পর্যায়ের জনগণকে অবহেলা বা নামমাত্র নজর দিয়ে কোন অর্থপূর্ণ উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয়। উন্নয়নকে বহুবিধ খাতের দৃষ্টিতে দেখতে হবে, একই সঙ্গে জনগণের সকল শ্রেণীর অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্থ যোগান দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিবেচ্য পরিকল্পনা

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কৌশল এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল বাস্তব কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন, কুরআন এবং সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গিতে সে সকল কৌশল এখানে তুলে ধরা হলো :

যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী বাহিনী গঠন

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একদল মানুষ গড়ে উঠুক যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, সৎ কাজে আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।[১] ভালো কাজ সম্পাদনে এই হলো চির সত্য নীতি। বর্তমান তাবলীগ জামাতসহ অনেক সংগঠনই নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়ে এই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। আমার মতে, এটা তারা করছে একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রকৃতপক্ষে এই নীতির পেছনে একটি বিশাল ও ব্যাপক আবেদন রয়েছে এবং এতে পল্লী উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক ও যথার্থ অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের এবং প্রচারণার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং একটি ইসলামী ব্যাংকের জন্য পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম কৌশল হওয়া উচিত এমন একদল লোক সৃষ্টি করা যারা খারাপ অর্থনৈতিক নীতি ও ভালো অর্থনৈতিক নীতিসমূহ থেকে ভালো নীতিমালাকে বাছাই করে নিতে পারবে এবং পল্লীর জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে পারবে।

কর্মী বাহিনীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী এবং তা অর্জন সম্পর্কে এ পর্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। শুলজ-এর মতে : এই লোকদের জন্য দু'টি গুণ দরকার। একটি হলো জ্ঞান অপরটি হলো দক্ষতা। আমাদের বর্তমান প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্টভাবে বলতে হয় যে, ঐ কর্মী বাহিনীকে সংশ্লিষ্ট এলাকার বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তারা যাতে তাদের জ্ঞানকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারে, সে জন্য তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাও থাকতে হবে। জনাব মোশাররফ হোসেন তাঁর নিবন্ধসমূহে বলেছেন :

---

১. সূরা আলে ইমরান : ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

> চিরাচরিত কৃষকগোষ্ঠীকে সংগঠনমূলক কৃষি উদ্যোক্তায় অথবা বিশেষায়িত পর্যায়ে রূপান্তরিত করার মধ্যে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের চাবিকাঠি নিহিত।[২]

এ ব্যাপারে মীরজালের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে :

> আধুনিকতার সুফল পাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দুর্নীতিপরায়ণ আচরণ। দুর্নীতি উন্নয়নের পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।[৩]

মোটের উপর যে 'সোনার বাংলা'-র কথা বলা হয়, সেই সোনার বাংলা গড়ার জন্য প্রয়োজন সোনার মানুষের। আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডসহ ভালো কাজের জন্য মানুষের যেসব গুণাবলী প্রয়োজন, সেগুলো কুরআনুল কারীমে একটি মাত্র শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে, তা হচ্ছে 'মুত্তাকিন' অথবা 'তাকওয়া'।[৪]

এসব গুণাবলী অর্জন করা যেতে পারে আনুষ্ঠানিক স্কুল শিক্ষার মাধ্যমে এবং আনুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এসব গুণাবলী অর্জনে অনানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সেই সাথে চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে প্রায় সকল সমাজকর্মীই (আখতার হামিদ খান ও মাহবুব আল চাষীসহ) এ ধরনের কর্মী বাহিনীর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে তাঁরা অধিক সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা যে কর্মী বাহিনীর কথা আলোচনা করছি, সে ধরনের কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার কাজে, আমার জানা মতে, গ্রামীণ ব্যাংক কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার পর বাছাই করা লোকদেরকে গ্রামীণ ব্যাংক ৬ মাসের সরেজমিন প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।[৫]

বিনিয়োগযোগ্য তহবিল একত্রিকরণ

কোন দেশ দু'ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে– বহির্দেশীয় উৎস থেকে এবং আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। সংক্ষিপ্ত মেয়াদের জন্য হলে সাহায্য আকারে বহির্দেশীয় সূত্র থেকে বিনিময়যোগ্য তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য হলে তা পরিহার করা যেতে পারে। মোটের উপর দান করার হাত অনুকম্পা পাওয়ার হাতের চেয়ে ভাল।[৬] সুতরাং পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে ইসলামী ব্যাংককে সব সময়ই স্থানীয়ভাবে বিনিময়যোগ্য তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। স্থানীয়ভাবে তহবিল প্রধানত দু'ভাবে সংগঠিত করা যেতে পারে। ১. জমার মাধ্যমে এবং ২. ইকুইটি পুঁজির মাধ্যমে। যাকাতকেও এ তহবিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদিও যাকাতের অর্থের ব্যবহার কতিপয় সীমার মধ্যে হতে হবে।[৭]

'যারা সোনা ও রূপা মজুদ করে রাখে (মাটির নীচে পুঁতে রাখে) এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে (হে মুহাম্মদ [সা.]) কঠিন শাস্তির খবর দিন'।[৮] মজুদ বা হোর্ডিং (পুঁতে রাখা) ও সঞ্চয়ের মধ্যেকার পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে বুঝতে না পারলে কুরআনের এই নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। অনেক সময় অর্ধশিক্ষিত মাওলানা সাহেবরাও তাঁদের বক্তৃতায় ইসলামে সঞ্চয় নাজায়েজ বলে

---

২. হোসেইন : ১৯৮৮।
৩. মীরজাল : ১৯৭১।
৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সূরা বাকারা : ২-৪।
৫. দ্র. প্রশিক্ষণ সহায়িকা, গ্রামীণ ব্যাংক।
৬. বুখারী শরীফ।
৭. সূরা আত্ তওবা : ৬০।
৮. সূরা আত্ তওবা : ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। উল্লেখ্য, মজুদ বা হোর্ডিং (অথবা পুঁতে রাখা) ইসলামে নিন্দিত এবং সঞ্চয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। মজুদ বা হোর্ডিং করে রাখাকে ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং ইসলামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সঞ্চয়ের উৎপাদনমুখী ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৯]

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য স্থানীয়ভাবে বিনিময়যোগ্য তহবিল সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পল্লী ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পল্লী সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০ গুণ। ১৯৭৫ সালে পল্লী সঞ্চয়ের আনুপাতিক হার ছিলো ২.৯৬ এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ তা হ্রাস পেয়েছে ০.৬৩।[১০] এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে এবং ইসলামী ব্যাংককে সম্মানজনকভাবে টিকে থাকতে হলে পল্লী সঞ্চয় সংগঠিত করতে হবে।

এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ইসলামী ব্যাংককে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে এ ধরনের কয়েকটি পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হলো।

১. ইসলামী ব্যাংককে এ বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে যে, ব্যাংকের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণই হচ্ছে পল্লী তহবিল সংগঠনের চাবিকাঠি। যদি পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে নতুন নতুন শাখা খোলা হয়, তাহলে এতে স্থানীয় জনগণ সহজেই ব্যাংকের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে এবং এছাড়া তাদের যাতায়াত ব্যয়ও হ্রাস পাবে।

২. প্রাথমিকভাবে প্রতিটি গ্রাম তো দূরের কথা, এমনকি প্রতিটি ইউনিয়নেও ব্যাংকে শাখা খোলা সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্য ভ্রাম্যমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এতে স্থানীয় জনগণ এবং ব্যাংকসমূহের জন্যই যে কেবল যাতায়াত ব্যয় হ্রাস পাবে তাই নয়, পল্লীর মহিলারাও আধুনিক ব্যাংকিং সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবেন।

৩. খলিলী এবং অন্যান্যরা তাঁদের গবেষণামূলক জরিপে লক্ষ্য করেছেন যে, সাক্ষরতা সক্রিয়ভাবে পল্লী সঞ্চয়কে প্রভাবিত করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের উচিত সঞ্চয় অভিযানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে গ্রামে এবং বিশেষ করে সাপ্তাহিক বাজারগুলোতে সঞ্চয় সম্পর্কে প্রচারণা চালানো।

৪. গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকের কর্মচারীদের সেবার মান সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। ইসলামী ব্যাংকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা এবং কাগুজে কাজ-কারবার হ্রাস করতে হবে। এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

৫. গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি বিবেচনা করে ইসলামী ব্যাংককে আরো সহজতর ব্যাংকিং সময় প্রবর্তন করতে হবে। ব্যাংক কেবল যে গ্রামীণ জনগণের অবসর সময়কেই বিবেচনায় আনবে তাই নয়, সাপ্তাহিক হাট–বাজারগুলোর দিন-তারিখ ও সময়ের সাথেও ব্যাংকিং সময়ের সমন্বয় করবে। পরিশেষে তহবিল সংগঠনের জন্য সঞ্চয়কারী ও কর্মচারী উভয়কেই উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কর্মচারীদেরকে নগদ বোনাস হিসেবে অথবা পদোন্নতি হিসেবে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে। একইভাবে সঞ্চয়কারীকে সহজ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা যায়। যে সব গ্রাহক পুঁজি বিনিয়োগ করবে তাদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

---

৯. ড. এম উমর চাপড়া, ৫-৭, ১৯৮২।

১০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, খলিলী, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনিয়োজিত অংশীদার বাড়ানো

'আল্লাহ্ ততক্ষণ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ ঐ জাতি তার ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয়।'[১১]

এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে অনেক সময় উর্ধ্বতন মহল থেকে কর্মসূচী গৃহিত হয়েছে এবং তা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগণ ততক্ষণই কেবল সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়ে থাকে যতক্ষণ তারা ঐ কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীদের চাপের মুখে থাকেন অথবা অধিক পরিশ্রম না করেই খুব সহজে উপকৃত হতে পারেন। যখন এসবের কিছুই থাকে না তখন ঐ কর্মসূচীগুলো ব্যর্থ হয়ে যায়। ঠিক এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছে 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' কর্মসূচী এবং খাল খনন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে। এসব পরীক্ষামূলক কর্মসূচী কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এসব কর্মসূচী প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্যই যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যখন উর্ধ্বতম মহলের চাপ শিথিল হয়ে এলো এবং আর্থিকভাবে উপকৃত হবার পথ রূদ্ধ হয়ে এলো, তখন তারা এসব কর্মসূচীর প্রতি অনিহা প্রকাশ করতে থাকল। এ ধরনের ঘটনা বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী অনেক সংস্থার ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

সর্বপর্যায়ে শৃঙ্খলা আনয়ন

'পরম দয়াময়ের (আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?'[১২] অথবা 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয়, মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তোমরা উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন, তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত'।[১৩] কুরআনের এ দু'টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূর্য ও চন্দ্রের মত মহাশক্তিসম্পন্ন উপাদানগুলোর গতিবিধি থেকে শুরু করে মানুষের সাধারণ আচরণগত পদ্ধতি পর্যন্ত সর্বত্র শৃঙ্খলার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে কোন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হলে তা সুশৃঙ্খলভাবে করতে হবে। অবশ্য এটা এমন কোন অজানা বিষয়ও নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুমিল্লা মডেল যে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল, তার পেছনে বড় কারণ ছিল যে, সমবায় সদস্যরা কড়াকড়িভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। আর মডেলের বর্তমান অবনতিশীল অবস্থার জন্য যা দায়ী, তা হচ্ছে অতীতের মত সমবায়-শৃঙ্খলা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলা হচ্ছে-নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা বসছে না, সাপ্তাহিক সঞ্চয়ও আগের মত জমা পড়ছে না, হিসাব-নিকাশও সুষ্ঠুভাবে রাখা হচ্ছে না, ব্লক সুপারভাইজারগণ আগের মত সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না এবং এভাবে এখন আগের মত অনেক কিছুই হচ্ছে না।[১৪] অন্যপক্ষে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মী/কর্মচারীরাও সুশৃঙ্খলভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকেন এবং গ্রামীণ ব্যাংকের বর্তমান সাফল্যের পেছনে সংশ্লিষ্ট সবার শৃঙ্খলাবোধ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

---

১১. সূরা আর রাদ : ১১।

১২. সূরা আল মূলক : ৩।

১৩. সূরা আল মুজাদালা : ১১।

১৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হামিদ, অধ্যায় : ৯, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপভিত্তিক কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন

'তোমরা পরস্পরে সব কাজে এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে একে অন্যকে সহায়তা কর'।[১৫] পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশটি আমাদের দেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশেই পল্লী উন্নয়নের কার্যকর মডেল হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। ইসলামী ব্যাংকের জন্য সমবায় অথবা দলীয় কার্যক্রম অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। একটা প্রশ্ন সাধারণ উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, দলীয় কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক (যেমন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড) অথবা অনানুষ্ঠানিক (যেমন গ্রামীণ ব্যাংক) হবে কি না। আমার মতে, যেমনটা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে, অধিকাংশ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের গ্রামের অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রমই যথার্থ বলে বিবেচিত। অবশ্য আরেকটি পরামর্শও গৃহীত হতে পারে, যদিও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অথবা বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক দল থাকা দরকার তাদের প্রকৃত সংখ্যার (গ্রামীণ ব্যাংকের মত) ব্যাপারে চাপ দেয়া যাবে না। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য, যেমন– যারা সে স্কীমের সাথে জড়িত আছেন, তাদের সবাইকে একটি সমবায় সমিতির আওতায় আনতে হবে (সেচ স্কীমগুলোর মধ্যে রয়েছে অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ এবং লো-লিফট পাম্প)। যেসব ক্ষেত্রে ছোট-খাট আর্থিক বিষয় জড়িত রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে সাত ব্যক্তির দল গঠিত হতে পারে। কিন্তু যেখানে বড় ধরনের আর্থিক লেনদেনের প্রশ্ন রয়েছে, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকে ব্যাংকের সুযোগ-সুবিধা দেয়া যেতে পারে। তবে সাধারণতঃ তা একটি সীমার মধ্যেই থাকবে।

মানুষ হিসেবে সকলকে যথার্থ মূল্যায়ন ও দায়িত্ব প্রদান

'এই গ্রন্থ তোমার (মুহাম্মদ [সা.]) উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোর পথে।'[১৬] এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য, নির্দিষ্ট কোন জাতি, অঞ্চল অথবা সময়ের জন্য নয়। সুতরাং পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে জাতি-গোত্র-বংশ নির্বিশেষে যারা পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবে এবং ব্যাংকের শৃঙ্খলা মেনে চলতে রাজী হবে, ইসলামী ব্যাংক তাদের সবাইকে ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে জড়িত করবে।

এখানে একটি বিষয় গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, সাধারণত সব মানুষকে হয় তাদের আয়ের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যেমন– গরীব, মধ্যবিত্ত ও ধনী; অথবা তাদের পেশার দ্বারা, যেমন–কৃষক, তাঁতি, শিল্পী প্রভৃতি। মানুষের শ্রেণী ভাগের আরেকটি ভিত্তির কথা ভাবা যেতে পারে। যেমন– কেউ উৎপাদনকারী, কেউ সরঞ্জাম সরবরাহকারী, আবার কেউ উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা, কেউ ভোক্তা। একথা ধরে নেয়া যায় যে, যতক্ষণ না এই তিন শ্রেণীর মানুষকে (উৎপাদনকারী, সরঞ্জাম সরবরাহকারী এবং উৎপাদিত পণ্য ক্রয়কারী) বিবেচনায় আনা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত স্থায়ী উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে না।[১৭] অতীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা উৎপাদনকারীকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে কোন চেষ্টা নেয়া হয়নি, কোন প্রকার পূর্ব চিন্তা-ভাবনাও করা হয়নি, সে জন্য এ কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে।

---

১৫. সূরা আল মায়িদা : ৩।

১৬. সূরা ইবরাহীম : ১।

১৭. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, হামিদ, অধ্যায় : ১৮, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ইসলামী ব্যাংককে এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গোটা ব্যবস্থার সাথে জড়িত–সরবরাহকারী থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহারকারী পর্যন্ত–সকলকে সমান গুরুত্ব দেয়া যায়।

উপার্জন কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ

'যখন নামাজ শেষ হবে, তখন আল্লাহর রহমতের তালাশে জমিনে ছড়িয়ে পড়'।[১৮] হাদীসে বলা হয়েছে : 'তোমাদের জীবিকা অর্জনের চেষ্টা না করে ফজরের নামাজের পর আর ঘুমাবে না।' অন্যকথায় মুসলমানদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে, অলস জীবন-যাপন করতে এবং জীবিকার জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং তাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর বিশেষ করে ফজরের নামাযের পর হালাল রুযী-রোযগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে বলা হয়েছে এবং যখনই সম্ভব হবে ও তাদের সাধ্য অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে (যা পৃথিবীর সকল ধর্মেই স্বীকৃত), যেমন গরীব-দুঃখীদেরকে দান করা। একটি প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হতে পারে, কোন্ ধরনের কর্মকাণ্ডে ব্যাংক অগ্রাধিকার দেবে। শরীয়তে যেসব কার্যক্রমের অনুমতি নেই অর্থাৎ নিষিদ্ধ (যেমন মদ ও শূকরের মাংস) সেগুলো ছাড়া কোন কার্যক্রমের ব্যাপারে পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত ধারণা থাকা চলবে না। ব্যাংক কেবল ঐ সমস্ত কাজকে অগ্রাধিকার দেবে যে সব কাজের সাথে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট গ্রাহকরা পূর্ব থেকে পরিচিত। এটা আশা করা যায় যে, উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রদর্শনমূলক কাজ অব্যাহত রাখার সাথে সাথে জনগণও নতুন ধারণা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারবেন।

সম্পদহীনদের কাজে লাগানোর বিশেষ ব্যবস্থা

'তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই যেন ধন-সম্পদ আবর্তিত না হয়।'[১৯] ইসলামী ব্যাংকের মত একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য এ আয়াতের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে গোত্র-বংশ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণ প্রতিষ্ঠা করা। এ দর্শনকে বাস্তবে রূপ রূপ দেয়ার জন্য প্রাপ্ত তহবিলের ন্যায়সঙ্গত বরাদ্দ প্রয়োজন, যাতে সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরা এর থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের লোকদের জন্য যাকাত ও অন্যান্য বিশেষভাবে বরাদ্দকৃত তহবিল যথাযথভাবে কাজে লাগানো উচিত। এ শ্রেণীর লোকদের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা ইসলামী ব্যাংক ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারে।

পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন

আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন যারা পারস্পরিক শলা-পরামর্শের মাধ্যমে তাদের কাজ-কর্ম পরিচালনা করে।[২০] আমাদের নবী (সা.) তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এ নীতি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন অর্থাৎ কাজে লাগিয়েছিলেন এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের শাসনকর্তাগণ পুরোপুরি এ নীতির উপর ভিত্তি করেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে এ পারস্পরিক শলা-পরামর্শকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হতো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, গ্রামীণ ব্যাংক স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, কুরআনের এই নীতি অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়েছে। এই ব্যাংকের সাফল্যের পেছনে চাবিকাঠি হিসেবে কাজ কাজ করছে শলা-পরামর্শ।

---

১৮. সূরা আল জুময়া : ১০।

১৯. সূরা আল হাশর : ৭।

২০. সূরা আশ শূরা : ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ

'এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে তাঁর নিজ অনুগ্রহে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।'[২১] এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী বলেছেন :

> আল্লাহ তাঁর অপরিসীম দয়ায় মানুষকে দান করেছেন প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দমন করার ক্ষমতা এবং জ্ঞান ও অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে যে কোন গভীর রহস্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা।[২২]

গতিশীল উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ইসলামী ব্যাংককে গবেষণা ও উন্নয়নকে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী ব্যাংক যে কেবল তার কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে এর মূল্যায়ন করবে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে অথবা সংশোধন করবে অথবা তদনুযায়ী ভবিষ্যত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে– তাই নয়, সাথে সাথে মৌলিক গবেষণার কাজও চালিয়ে যাবে। আর এই গবেষণার মাধ্যমেই উদ্ভাবন করা যাবে নতুন জগতের শস্য-বীজ, উন্নত করা যাবে স্থানীয় সেচ প্রযুক্তিকে, পল্লীর চিকিৎসকদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

এখানে আরো বলা যেতে পারে যে, ইসলামী বিশ্বে ইজতেহাদের দরজা এখনো বন্ধ হয়নি। বরং অব্যাহত পরিবর্তনের পটভূমিতে– বিশেষ করে সামাজিক ও ভৌত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ইজতেহাদের গুরুত্ব দিন দিন আরো বাড়ছে। কেবল মনে রাখতে হবে, যে কোন নীতি নির্ধারণী বা দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে গ্রহণীয় কৌশলসমূহ

১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পরপরই নতুন সরকার সে দেশের সুদ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করে। কাজটি ছিল কঠিন। বিপ্লব-পূর্ব ইরানে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য কোন অনুকূল আইন ছিল না। ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের কাছে নতুন ব্যাংক ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ অবস্থায় শতাধিক বছরের সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে বিপ্লবী সরকারকে হিমসিম খেতে হয়। ইরানের আইনসভার ১৯৮০ সালের বাজেট অধিবেশনে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, অনতিবিলম্বে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার জন্য বিপ্লবী সরকার একটি বিস্তারিত রিপোর্ট আইনসভার নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে। এ লক্ষ্য সফল হয়নি। যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে সরকার আইনসভার নিকট কোন গ্রহণযোগ্য পরামর্শ পেশ করতে পারেনি।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং-এর তেমন প্রসার ঘটেনি। তাই বহির্বিশ্ব থেকে ইরান কোন উপযুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং মডেল পায়নি। ঐ সময় পর্যন্ত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে শুধুমাত্র কিছু তাত্ত্বিক বই-পুস্তকই রচিত হয়েছে, সুদবিহীন ব্যাংকিং-এর তেমন সার্থক মডেল উপস্থাপিত হয়নি। ১৯৬৩ সালে মিশরের মিটগামারে ডঃ আহমাদ আল-নাজ্জার লাভ-লোকসানে

---

২১. সূরা আল জাসিয়া : ১৩।

২২. দ্র. আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী, পাদটীকা ৩৬০৫, ১৯৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক কারণে এ ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাংকটি বন্ধ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাষ্যকারগণ মন্তব্য করেন, সফলতাই এই ব্যাংকিং ব্যর্থতার কারণ। বস্তুতঃ ব্যাংকটির অভাবিত সাফল্য তদানিন্তন মিশর সরকার সুদী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে বিবেচনা করেছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মালিকানায় ১৯৭৫ সালে দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, ১৯৭৭ সালে সুদানে ও মিসরে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক, কুয়েতে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, সারজাহ্তে ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, ১৯৭৮ সালে লুক্সেমবার্গে ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল, জর্দানে জর্দান ইসলামিক ব্যাংক, ১৯৭৯ সালে মানামায় বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, বাহমাসে ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, সুইজারল্যান্ডে ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী ও পাকিস্তানে কয়েকটি ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানী গঠিত হয়। এর পূর্বে অবশ্য ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এসব ব্যাংকের কোনটিকেই ইরান তার মডেল হিসেবে বেছে নিতে পারেনি। ইরানের প্রয়োজন ছিল ইসলামী ব্যাংকিং-এর জাতীয় মডেল। ফলে ইরানের বিশেষজ্ঞগণ নিজেদের জন্য উপযুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং মডেল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩-এই চার বছরের চেষ্টার ফলে ইরানের আইসভায় বিপন্নবী সরকার 'সুদবিহীন ব্যাংকিং পরিচালনা বিল' উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। আইনসভা এ বিলটি অনুমোদন করে। ১৯৮৪ সাল থেকে এ বিল 'সুদমুক্ত ব্যাংকিং আইন' হিসেবে চালু করা হয়। এ আইনে ইরানের ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্তব্য, আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ ও এর ব্যবহার, ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ব্যাংক মারকাজী জমহুরী) এবং এর দায়িত্ব-কর্তব্য ও আর্থিক নীতি সংক্রান্ত মোট ২৭টি ধারা রয়েছে। বর্তমানে ইরানের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা এ আইনের দ্বারাই পরিচালিত।

ইরান : প্রাথমিক তথ্য পত্র

বিপ্লব-পূর্ব ইরানে ব্যাংক ছিল ৩৬টি-সরকারী খাতে ৮টি এবং ব্যক্তিমালিকানায় ২৮টি। বিপ্লবের পর সমগ্র ব্যাংক জাতীয়করণ ও ইসলামীকরণ করে ঢেলে সাজানো হয়। বর্তমানে ইরানের ব্যাংক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ব্যাংক মারকাজী জমহুরী ইসলামী ইরান)

খ. ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক (জাতীয়)

গ. ৪টি বিশেষায়িত ব্যাংক (জাতীয়)

ঘ. ২৪টি আঞ্চলিক ব্যাংক।

সারা ইরানে উল্লেখিত ব্যাংকগুলোর শাখা ৯ হাজারের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইরানের ইসলামী ব্যাংকিং আইনে বিনিয়োগের এগারোটি পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো[২৩] নিম্নরূপ :

সিভিল পার্টনারশীপ

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতা চুক্তিবদ্ধ হারে মূলধন যোগান দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যবসায় অংশ নেয়। ইরানের আইনে এ ধরনের পার্টনারশীপ ব্যবসা রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হয় না। ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ই ব্যবসা পরিচালনায় অংশ নিতে পারে। কিন্তু ব্যাংক সাধারণতঃ তা করে না। সকল বিনিয়োগ প্রস্তাব পুংখানুপুংখ রূপে মূল্যায়ন করা হয়। কোন প্রস্তাবের সম্ভাব্য লাভের হার ব্যাংক মারকাজী কর্তৃক নির্ধারিত -এর সমতুল্য না হলে সে বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনা করা হয় না। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইরানের ব্যাংকারগণ এ পদ্ধতিটিকেই সর্বোত্তম বিবেচনা করেন।

লিগ্যাল পার্টনারশীপ

লিগ্যাল পার্টনারশীপ ও সিভিল পার্টনারশীপের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। সিভিল পার্টনারশীপ পদ্ধতিতে ব্যাংক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। কিন্তু লিগ্যাল পার্টনারশীপ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র প্রস্তাবিত অথবা চালু শিল্প প্রকল্পের ইকুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়। লিগ্যাল পার্টনারশীপে আইনানুগ রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন।

মোজারেবেহ্

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহীতাকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোজারেবেহ্ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয় না। ব্যবসা পরিচালনায় ব্যাংক সরাসরি অংশ নেয় না। ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতার মধ্যে লাভ পূর্ব নির্ধারিত হারে বন্টন করা হয়।

হায়ার পারচেজ

শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার যন্ত্রপাতি অথবা অন্য কোন সম্পত্তি ব্যাংক নিজ নামে ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে তা ভাড়ার ভিত্তিতে প্রদান করে। কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে বিনিয়োগ গ্রহীতা তার মালিক হতে পারেন। ব্যবহারকালীন সময়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যাংককে ভাড়া প্রদান করে।

ইনস্টলমেন্ট সেল্‌স

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতার নিকট স্বীকৃত মূল্যে বিক্রয় করে। বিনিয়োগ গ্রহীতা বিক্রয় মূল্য এককালীন অথবা কিস্তিতে পরিশোধ করে।

মোজারাহ্

কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহীতাকে জমি ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে। উৎপাদিত পণ্য পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতা বন্টন করে নেয়।

---

২৩. এম. ফরীদউদ্-দীন আহমাদ, *ইরানে ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা ; ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২, ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সং, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

মোসাকাত

ফুল বা ফল উৎপাদনের জন্য ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে। উৎপাদিত ফুল বা ফলের একটি নির্ধারিত অংশ ব্যাংক তার বিনিয়োগকৃত অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করে।

যোয়ালাহ্

যোয়ালাহ্ এক ধরনের ত্রিপাক্ষীয় চুক্তি। বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে ব্যাংক নির্মাণ কাজে অর্থ বিনিয়োগের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। নির্মাণ তদারকী ও সম্পাদনের জন্য ব্যাংক ঠিকাদার নিযুক্ত করে। বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে চুক্তি মূল্য ও ঠিকাদারকে প্রদত্ত অর্থের মধ্যেকার ব্যবধানই ব্যাংকের লাভ রূপে বিবেচিত হয়।

সালাম

সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য পণ্য সরবরাহকারীকে মূল্য অগ্রিম প্রদান করে। পণ্যের বিক্রয় মূল্য এবং প্রদত্ত অগ্রিম মূল্যের মধ্যকার ব্যবধানই ব্যাংকের লাভরূপে গণ্য হয়।

ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট

ব্যাংক নিজেই কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তা আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করে। বিক্রয় মূল্য ও নির্মাণ মূল্যের ব্যবধান ব্যাংকের লাভ।

কর্জে হাসানা

সমাজের অসহায়, অবহেলিত ও গরীব-দুঃখীদেরকে প্রদত্ত লাভ-বিহীন অর্থ কর্জে হাসানা নামে পরিচিত। কর্জে হাসানা ডিপোজিটের অর্থ থেকে কর্জে হাসানা দেয়া হয়।

এই ১১টি পদ্ধতি ছাড়া ইরানে সম্প্রতি ডেট পারচেজ (Debt Purchase) নামে আর একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কোন বাণিজ্যিক বিলের হোল্ডার বিলটি মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ভাংগাতে চাইলে এ পদ্ধতিতে ব্যাংক তা ক্রয় করে। ক্রয়ের তারিখ থেকে মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত সময়ের লাভ ব্যাংক ভোগ করে।

অন্যান্য দেশের সাথে পারিভাষিক পার্থক্য ছাড়াও ইরানে কয়েকটি নতুন বিনিয়োগ পদ্ধতি চালু আছে। সিভিল পার্টনারশীপ ও সিগ্যাল পার্টনারশীপ অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকে মুশারাকা নামে পরিচিত। ইনস্টলমেন্ট সেল্‌স বাংলাদেশে মুরাবাহ ও বায়-ই-মুয়াজ্জাল নামে চালু আছে। মোজারাহ, মোশাকাত ও যোয়ালাহ পদ্ধতির প্রচলন অন্য কোন দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমে নেই। ইরানের ব্যাংকিং সিসেটমে ১২টি বিনিয়োগ পদ্ধতি চালু আছে ঠিকই, কিন্তু প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে ইনস্টলমেন্ট সেলস, সিভিল পার্টনারশীপ ও মোজারেবেহ পদ্ধতি উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে।

অর্থব্যবস্থা ইসলামীকরণে ইরানের অনুসৃত পদ্ধতি

আধুনিক বিশ্বের প্রথম সফল সর্বাত্মক ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয় ইরানে ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী।[২৪] ইসলামী বিপ্লবের সফলতার সাথে সাথেই সর্বপ্রথম যে কাজটি করা হলো তা হলো একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা, যার ভিত্তি হলো আল কুরআন ও সুন্নাহ। সার্বভৌমত্বের পশ্চিমা ধারণা 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'-কে প্রত্যাখ্যান করে বিপ্লবোত্তর ইরানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'আল্লাহর

২৪. *দৈনিক নয়া বাংলা*, বিশেষ সম্পাদকীয়, ৫ জুন, ১৯৮৯ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বভৌমত্ব'-এর ঘোষণাকে কার্যকর করা হয়।[২৫] ইসলামী বিপ্লবের পরপরই ইরানী কর্তৃপক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা তথা গোটা অর্থনীতিকে ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন। সংবিধানের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ঘোষণা করা হয় :

> The Planning of a correct and just economic system, in accordance with Islamic criteria, in order to create welfare, eliminate poverty and abolish all forms of deprivation with respect to food, housing, work, health care, and the provision of social insurance for all.[২৬]

ইরানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের বিষয়টিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১৯৭৯-৮২) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণার্থে ব্যাংকসমূহকে পুনর্গঠন করার জন্য জাতীয়করণ করা হয়।[২৭] এ পর্যায়ে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ কিছু বিষয় দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের জন্য কোন কার্যকর নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেনি। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৮২ সাল থেকে এবং তা ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে ; এ সময়ে ইসলামী ব্যাংকিং মডেল উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে 'The Law for Usary (Interest) Free Banking' নামে একটি একটি আইন পাশ করা হয় এবং ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয় আইন পাশের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে তাদের আমানত ইসলামী আইনের আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে এবং তিন বছরের মধ্যে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম সুদমুক্ত করতে হবে।[২৮] এ পর্যায়ে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পাশ্চাত্যের ব্যাংকিং ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের ন্যায় 'Quasi-independent Economic Institution' হিসেবে স্বাধীনতা দিয়ে ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপুল ক্ষমতা দেয়া হয়।

তৃতীয় এবং বর্তমান পর্যায় শুরু হয় ১৯৮৬ সাল থেকে। এ সময় ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় ইসলামী সরকারের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এবং ব্যাংকসমূহকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি কার্যকরী করে তোলা হয়। ১৯৮৫ সালের মধ্যে সুদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়। 'ব্যাংক মারকাজি জামহুরী ইসলামী' ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক এবং ৭টি নন্-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ইরানের ব্যাংক ব্যবস্থা। ১৯৮৭-৮৮ সালে ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ শাখার সংখ্যা ছিল ৭,২০০। ব্যাংক বিল্লি ও ব্যাংক সাদারাতের বৈদেশিক শাখার সংখ্যা ছিল ৫৬টি। ইরানে কোন বেসরকারী ব্যাংক নেই এবং বিদেশী ব্যাংকের কোন শাখা অফিস নেই। বিপ্লবের পর ইরান সরকার গোটা ব্যাংক ব্যবস্থা জাতীয়করণের পাশাপাশি ইসলামীকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে।

ইরানের ব্যাংকিং আইন 'The Loa for Usary Free Banking' -এর ৩ নং পরিচ্ছেদের (ক) উপধারা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ তলবী, মেয়াদী ও সঞ্চয়ী আমানত গ্রহণ করতে পারে। বেসরকারী তহবিল বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে। মেয়াদী বিনিয়োগ আমানত (Term Investment Deposits) গ্রহণকরে যৌথ উদ্যোগ, মোজারেবেহ, হায়ার পারচেজ, কিস্তিতে লেনদেন, মোজারাআহ, মোছাকাত, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, আগাম কাজ-কর্ম এবং জোয়ালাহ লেনদেনে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মূলতঃ বেসরকারী খাতে স্বল্পমেয়াদী এবং এক বছর মেয়াদী সরকারী বন্ডে বিনিয়োগ করে

---

২৫. ইরান সরকার (ইসলাম প্রচার সংস্থা), ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান, ১৯৯০।

২৬. প্রাগুক্ত, ৩ নং ধারার ১২ নং উপধারা।

২৭. ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতীয়করণের আবশ্যকতা সম্পর্কে ইসলামী আইনে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই।

২৮. ব্যাংক মারকাজি জমহুরী ইসলামী ইরান (ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক), দি ল ফর ইউজারী ফ্রি ব্যাংকিং, ২০ আগস্ট, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ 'আমানতকারীর এজেন্ট' হিসেবে কাজ করে। ব্যাংক তাদের আমানত বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্যোগে সরবরাহ করে এবং অর্জিত মুনাফা আমানত সংরক্ষণের মেয়াদ ও পরিমাণের ভিত্তিতে আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়।

ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক মারকাজি জমহুরী ইসলামী ইরান' দেশের মুদ্রানীতি মূলতঃ ঋণসীমা নির্ধারণ, ন্যূনতম জমানীতি এবং সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং চালু হওয়ার পর আরো কতিপয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে; যেমন– ঋণদান কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মুনাফা অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গৃহীত প্রকল্পের জন্য 'ন্যূনতম প্রত্যাশিত রেট অব রিটার্ন' ঠিক করে দেয়া ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন রেট অব রিটার্ন ঠিক করে দেয়। গত দশকে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে নূন্যতম রিজার্ভ নীতির ব্যবহার খুব একটা সম্ভব হয়নি। পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসনিক নীতিকে পরিবর্তন করার কৌশল অনুযায়ী ১৯৯১-৯২ সালে এ অনুপাতগুলোর পরিবর্তন করে শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে। এভাবে 'ব্যাংকিং মারকাজি' বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। উক্ত আইনের ৪র্থ অধ্যায়ে মুদ্রানীতি সম্পর্কে বিস্তৃত নীতিমালা দেয়া আছে (ইরানের ব্যাংকিং কার্যক্রমের উপর সারণী নং-১১ ও ১২ দ্রষ্টব্য)।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণে পাকিস্তানের অনুসৃত পদ্ধতি

ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে জাতীয় পর্যায়ে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সুদান, যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এ রূপান্তর ঘটেছে।[২৯] পাকিস্তানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণে অনুসৃত পদ্ধতি হচ্ছে সতর্কতামূলক এবং গভীরভাবে সুচিন্তিত।[৩০] কিন্তু ইরানের ইসলামী বিপ্লব সে দেশের গোটা অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামীকরণে দ্রুত পরিবর্তন আনয়নের অনুমোদন দিয়েছে। এ কারণে দু'দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ থেকে মুক্তিলাভের পরপরই ইসলামী শরীয়াহ্‌র আলোকে পাকিস্তানে গোটা অর্থব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবী তীব্র হতে থাকে। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যক্রম উদ্বোধনের দিনে ১ জুলাই, ১৯৪৮ সালে আয়োজিত বিরাট সভায় স্টেট ব্যাংকের প্রথম গভর্নর জাহিদ হুসাইন ঘোষণা করেছিলেন :

> Banking practices must be subjected to careful scrutiny on scientific lines by competent economists well acquainted with the basic principles and requirements of Islam and that the research organisation proposed to be established by the State Bank of Pakistan would devote special and unremitting attention to this most important aspect of our ideological problem.

এরপর বহুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে স্টেট ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে 'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং'-এর উপর সুসংগঠিত ও কার্যকর গবেষণা করার জন্য Islamic Economics Section

---

২৯. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *ইসলামিক ব্যাংকিং : থিওরী এন্ড প্র্যাকটিস*।

৩০. ফ্রেডারিক এল প্রিয়র, দি ইসলামিক ইকনমিক সিস্টেম, জার্নাল অব কমপ্যারেটিভ ইকনমিক্স, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

নামে একটা সেকশন খোলা হয়।[৩১] পরবর্তী সময়ে এটা একটি পরিপূর্ণ ডিভিশন-এ পরিণত হয়। এ ডিভিশনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা-কর্ম পরিচালনা করেন। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের ৩৭ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে অর্থনীতি থেকে সুদ বিলোপের উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবনের জন্য রাষ্ট্রকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক অর্থনীতি থেকে সুদ নির্মূলকরণের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেন এবং Council of Islamic Ideology (CII)-কে এজন্য প্রয়োজনীয় নীলনক্সা প্রণয়নের তাগিদ প্রদান করেন। সরকারের বলিষ্ঠ সিদ্ধানের কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনীতি ইসলামীকরণের পথ অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে। Council of Islamic Ideology দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে ১৫ জনকে নিয়ে অর্থনীতি থেকে সুদ বিলোপ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য একটি প্যানেল গঠন করে।

প্যানেল ১৯৮০ সালের জুন মাসে সরকারের নিকট একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে ইসলামে সুদ নিষিদ্ধকরণের প্রকৃতি এবং যৌক্তিকতাসহ সুদ রহিত করে লাভ-ক্ষতি অংশীদারিত্বভিত্তিক পদ্ধতির দিক তুলে ধরা হয়[৩২]। এদিকে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাস থেকে তিনটি বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠানকে Investment Corporation of Pakistan, The National Investment Trust এবং The House Building Finance Corporation (HBF)-কে ইসলামী আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। বিষয়টি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক যে, এ তিনটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের কাজ শুধু সুদমুক্তই নয়; বরং উত্তরোত্তর বিস্তৃত হচ্ছে। ১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারী থেকে পাকিস্তানে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

Council of Islamic Ideology কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টে ইসলামীকরণ পদ্ধতির কথা বলা হলেও এতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য কোন সুপারিশ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং বিশেষায়িত ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঠিক পূর্বের মতই বহাল থাকে। কেবলমাত্র তাদের অর্থায়ন কার্যক্রম অজ্ঞাত মুনাফার হারের ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ ছায়া-PLS পদ্ধতিতে পরিচালিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। রিপোর্টে ইসলামীকরণ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য নীতি নির্ধারক ও ব্যাংকারদের পর্যায়ক্রমিকভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য উপদেশ দেয়া হয়।

জানুয়ারী ১৯৮১ সালে সরকারের নির্দেশানুসারে PLS ভিত্তিতে আমানত গ্রহণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার খোলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ PLS আমানত পৃথকভাবে রাখে এবং সুদভিত্তিক কার্যক্রমে নিয়োগ করেনি। ১৯৮১ সালে বিভিন্ন সার্কুলার ইস্যু করার মাধ্যমে স্টেট ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিশেষায়িত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সুদমুক্ত সিকিউরিটিজে PLS আমানত খাটানোর জন্য অনুমোদন প্রদান করে।

একইভাবে রফতানী অর্থায়ন, দ্রব্যসামগ্রী আমদানী, বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অর্থায়ন এবং গৃহ নির্মাণে অর্থায়ন অনুমোদন দেয়া হয়। ১৯৮০-৮২ সালের মধ্যে ১৫ বছর মেয়াদী সুদমুক্ত ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট, যেমন Participation Term Certificates (PTC) উদ্ভাবন করা হয়। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ও মধ্যম মেয়াদী বেসরকারী বিনিয়োগ-ডিবেঞ্চারসমূহ স্থানান্তর করা হয় এবং সম্পদ সঞ্চালনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৮৪ সালের জুন মাসে সরকার ঘোষণা করে যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুসৃত দ্বৈত বাতায়ন প্রক্রিয়া রহিত করা হবে এবং স্থিরীকৃত সুদভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রা আমানত ব্যতীত সকল কার্যকম সুদহীন অর্থায়ন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হবে। ১৯৮৪ সালে সরকার Banking Tribunal

---

৩১. এস এ মিনাই, *ম্যানি এন্ড ব্যাংকিং ইন পাকিস্তান*, ১৯৮৪।

৩২. দি কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডিয়োলজি, রিপোর্ট অন দি ইলিমিনেশন অব ইন্টারেস্ট ফ্রম দি ইকোনমি, পাকিস্তান সরকার, জুন ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

Ordinance নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে, যার উদ্দেশ্য হল ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে অহেতুক বিলম্ব এবং খেলাপী থেকে ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করা। এ অধ্যাদেশ বলে 'পরিসীমা' নির্দিষ্ট করে সমগ্র পাকিস্তানে ১২টি ব্যাংকিং ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। উচ্চস্তরের বিচারকদের দ্বারা পরিচালিত এ ট্রাইব্যুনালগুলোকে অভিযোগ প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে তা মিটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল করার বিধান রাখা হয়।

অর্থায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, যেমন- মার্কআপ, মার্ক ডাউন, সার্ভিস চার্জ, পিটিসি সার্টিফিকেটস, ইক্যুইটি পার্টিসিপেশন, লিজিং, হায়ার পারচেজ, মুদারাবা, রেন্ট শেয়ারিং, বাই ব্যাক এ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন লেনদেন হচ্ছে। অর্থায়নের কৌশল ও পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে বলা যায়, পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তানের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইসলামীকরণ হয়েছে। বাস্তবে যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তা ইসলামী নীতিমালার আলোকে সমাধান বের করা হচ্ছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার চেয়ে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং-এ অর্থব্যবস্থা সম্পদের সর্বোত্তম দক্ষ ব্যবহার ও সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

সারণী নং-১০,১১ এবং ১২ থেকে পাকিস্তানের সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।[৩৩]

পাকিস্তানে ইসলামী নীতিমালার আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এবং মুদ্রানীতি পরিচালনার ব্যাপারে Council of Islamic Ideology তাদের রিপোর্টের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছে, পঞ্চম অধ্যায়ে সরকারী লেনদেনের ব্যাপারে পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে এ বিষয়গুলোর পদ্ধতি ইসলামী শরীয়াহ্ নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার (জুলাই, ১৯৯১) স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব আই. এ. হানফিকে প্রধান করে Commission for Islamisation of the Economic নামে একটি কমিশন গঠন করেছে।[৩৪] কমিশন পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পুরোপুরি ইসলামীকরণের জন্য সরকারকে বাস্তবায়নোপযোগী পরামর্শ দেবে।

সুদানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণ[৩৫]

সুদানে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন বহুলাংশে সফল। রাজনৈতিকভাবে গোটা অর্থনীতি ইসলামীকরণে সুদানী মুসলমানরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ১৯৮৩ সালে সুদানে ৪টি বৃহত্তম সুদভিত্তিক ব্যাংক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এবং ৬টি ইসলামী ব্যাংক বেসরকারী খাতে কর্মরত ছিল। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জারিকৃত প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রির মাধ্যমে সুদান গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণে মতামত প্রকাশ করে এবং যথাশীঘ্র সুদভিত্তিক লেনদেন বন্ধ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ প্রদান করে। সুদানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর ইস্যুকৃত এক নির্দেশে ঐ সময় থেকে সুদের ভিত্তিতে সঞ্চয়ী বা মেয়াদী আমানত গ্রহণ বন্ধ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ প্রদান করে এবং সুদের ভিত্তিতে আমদানীসমূহ জ্ঞাত ইসলামী নীতিমালার আলোকে বিনিয়োগ আমানতে বা শরীয়াহ্ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন আমানতে রূপান্তর করতে বলে। সকল বকেয়া সুদী আগামসমূহকে পরিশোধের মাধ্যমে

---

৩৩. ইকবাল জুবাইর এবং মিরাখর আব্বাস, *ইসলামিক ব্যাংকিং*, আই এম এফ অকেশনাল পেপার নং-৪৯, মার্চ ১৯৮৭।

৩৪. স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, স্টেট ব্যাংক নিউজ, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সংখ্যা।

৩৫. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মীমাংসা, অথবা ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করার উপদেশ দেয়া হয়। বিকল্প পথ উদ্ভাবনের পূর্ব পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেনসমূহ সুদভিত্তিক চলতে পারে বলে ঘোষণা করা হয়।

সরকার কর্তৃক নির্দেশিত এ পরিবর্তন হঠাৎ করে দেয়া হয় এবং ব্যাংকগুলো তড়িঘড়ি করে মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করে, যা মোট আর্থিক কার্যক্রমের ৯০% নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে সুদানী জনগণের মাঝে এক ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং ব্যাংক আমানত বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা হতে থাকে। সুদানের উপর বিস্তারিত কোন তথ্য না পাওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করা সম্ভব হচ্ছে না।

উপরের তিনটি দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষ থেকেই গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ের প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রীয় রূপ দেয়া হয়েছে সুদানে। এছাড়া বাংলাদেশসহ ৪৫টি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং অথবা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

সারণীসমূহ

সারণী : ১

ইরানের ব্যাংকিং ব্যবস্থার অর্থায়ন পদ্ধতি

খাতের প্রকৃতি	অনুমোদিত পদ্ধতি
১	২
উৎপাদন (শিল্প, খনি ও কৃষি)	মুশারাকা, লিজ-পারচেজ, সালাফ লেনদেন, কিস্তিতে বিক্রয়, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, মুজারাআহ, মুছাকাত এবং জোয়ালাহ।
বাণিজ্যিক	মুদারাবা, মুশারাকা, জোয়ালাহ।
সেবা	লিজ-পারচেজ, কিস্তিতে বিক্রয়, জোয়ালাহ।
গৃহায়ন	লিজ-পারচেজ, কিস্তি, করজে হাসানা, জোয়ালাহ।
ব্যক্তিগত ভোগ	কিস্তিতে বিক্রয় করজে হাসানা।

সারণী : ২

ব্যাংকিং ব্যবস্থা : আমানতের হারসমূহ

বছর শেষে	১৯৮৭/৮৮	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১
১	২	৩	৪	৫
মেয়াদী বিনিয়োগ আমানতসমূহ :				
স্বল্প মেয়াদী	৬.০	৬.০	৬.০	৬.৩
দীর্ঘ মেয়াদী				

Dhaka University Institutional Repository

১ বৎসর	৮.৫	৮.৫	৮.৫	৮.৮
২ বৎসর	–	–	–	১০.০
৩ বৎসর	–	–	–	১১.০
৫ বৎসর	–	–	–	১৩.০

সারণী : ৩

পাকিস্তানে লাভ-ক্ষতি অংশীদারিত্বভিত্তিক আমানতের প্রবৃদ্ধি

(বিলিয়ন রুপী)

আমানতের শ্রেণী	ডিসেম্বর শেষে				জুন শেষে	
	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৪	১৯৮৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট আমানত	৭০.০	৮২.৮	১০৬.৯	১১১.৭	১১৭.৯	১৩৮.০
রিটার্নবাহী আমানত	৫৪.৭	৬৬.৪	৮৬.৩	৯১.০	৯৮.০	–
পিএলএস আমানত	৬.৫	১২.৯	১৯.৯	২৯.৭	২২.১	৩৩.১
পিএলএস আমানত/মোট আমানত (শতকরা হার)	৯.২	১৫.৪	১৮.৬	২৬.৩	১৮.৭	২৭.৬
পিএলএস আমানত/ রিটার্নবাহী আমানত (শতকরা হার)	১১.৯	১৯.৪	২৩.১	৩২.৩	২২.৬	–

উৎস : আইএমএফ অকেশনাল পেপার-সিরিজ নং ৪৯।

সারণী নং : ৪

পাকিস্তান : বিভিন্ন লেনদেনে অর্থায়নের পদ্ধতি

কার্যক্রমের প্রকৃতি	অর্থায়নের ভিত্তি
১. ব্যবসায় বাণিজ্য : ক. দ্রব্য-সামগ্রী কার্যক্রম খ. ব্যবসা : অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক গ. অন্যান্য	মার্ক আপ। মার্ক আপ এবং মার্ক ডাউন। পিটিসি সার্টিফিকেট, ইকুইটি অংশগ্রহণ, লিজিং, হায়ার পারচেজ, মার্ক আপ।
২. শিল্প : ক. মেয়াদী বিনিয়োগ খ. চলতি মূলধন।	ইকুইটি অংশগ্রহণ, পিটিসি, মুদারাবা, লিজিং, হায়ার পারচেজ, মার্ক আপ। প্রফিট এন্ড লস শেয়ারিং (পিএলএস), মার্ক আপ।
৩. কৃষি ও মৎস : ক. স্বল্প মেয়াদী খ. মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী	মার্ক আপ, সার্ভিস চার্জ। লিজিং, হায়ার পারচেজ, পিএলএস, মার্ক আপ, রেন্ট শেয়ারিং, মার্ক আপ। রেন্ট শেয়ারিং, মার্ক আপ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. গৃহায়ন	
৫. ব্যক্তিগত আগাম : ক. ভোগ্যপণ্য সামগ্রী খ. ভোগ	হায়ার পারচেজ। বাই-ব্যাক ব্যবস্থা।

সূত্র : ব্যাংক মারকাজি জামহুরী ইসলামী ইরান।

অনুসরণীয় কৌশলের আলোচনার শেষ প্রান্তে এ কথা বলা যায়, আধুনিক বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অক্টোপাস ও ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন বেড়াজাল ছিন্ন করার জন্য বিভিন্ন তাত্ত্বিক কৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছে এবং সেগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রধান প্রধান যে সমস্যাগুলোর সমাধান প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের তুলনায় স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্যিক ঋণের মধ্যে ব্যাংকের পরিসম্পদসমূহ পুঞ্জিভূত হওয়া, স্বল্পমেয়াদী ফিন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস-এর অভাব, বৈদেশিক সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সাথে লেনদেনের সম্পর্ক নির্ণয়, প্রকল্প মূল্যায়নের কৌশলের অভাব, সরকারী ঘাটতি বাজেটে সুদমুক্ত অর্থায়নের কৌশলের অভাব, রেট অব রিটার্ন কমিশন ও রেট অব চার্জ নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত কৌশলের অভাব, অর্থায়ন সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃতব্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মুদ্রানীতি ও কৌশলের প্রকৃতি ইত্যাদি। উপরোক্ত সমস্যাগুলোর উপর কোন পরিপূর্ণ তাত্ত্বিক সমধানের রূপরেখা তৈরী না হলেও যে তাত্ত্বিক ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, গতানুগতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার চেয়ে ইসলামী ব্যাংকিং অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইক্যুইটিভিত্তিক হওয়ায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কার্যকর ব্যাংকিং চালাতে সক্ষম। ১৯৮৬ সালে মহসিন এস. খানব ইসলামী ব্যাংকিং-এর যে 'Analytical Model' তৈরী করেন তাতে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক যে কোন ব্যাংকিং সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। যেমন– পরিসম্পদে (Assets Position) সংকট সৃষ্টি হলে ব্যাংকে রক্ষিত আমানতের বহিঃস্থ মূল্য পরিবর্তনের মাধ্যমে তাতে ভারসাম্য আনয়ন করা যায়, সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহ যা পারে না। ইসলামী ব্যাংকিং-এর যে অগ্রযাত্রা ৭০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে তা বর্তমানে বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। ইসলামী ব্যাংকারদের জন্য সুখবর হচ্ছে, আজ পর্যন্ত কোন ইসলামী ব্যাংক ব্যর্থ হয়ে যায়নি।[৩৬]

৩৬. মোহসিন এস খান এবং মিরাখর আব্বাস, ইসলামিক ব্যাংকিং, আই এম এফ ওয়ার্কিং পেপার নং ৯১/৮৮, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তা নৈতিক শিক্ষা ও আইন উভয়ের সাহায্য নিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে ইসলাম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসকে এ ব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য করার জন্য তৈরি করে। অন্যদিকে আইনের বলে তাদের ওপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে যার ফলে তারা এ ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য হয় এবং এর সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে সক্ষম হয় না।[১] ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও তার ভিত্তিসমূহের মধ্যে চারটি বিষয় মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী : ১. কতিপয় সীমা ও নিয়ন্ত্রণ সহকারে স্বাধীন অর্থনীতি, ২. যাকতের অপরিহার্যতা, ৩. উত্তরাধিকার আইন ও ৪. সুদ নিষিদ্ধকরণ। সুদের উপর ভিত্তি করে যে বাংকিং ব্যবস্থা ও অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তার সর্বগ্রাসী অকল্যাণকর থাবা থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

সীমিত তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে তার উন্নত কৌশল পদ্ধতির উপর প্রচুর গবেষণা হচ্ছে এবং একটি উপযোগী কাঠামো নির্মিত হয়েছে। বিভিন্নমুখী ব্যাংকিং সমস্যার ইসলামী সমাধানের জন্য ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বেসরকারী উদ্যোগে-দু'ভাবেই ইসলামী ব্যাংক এখন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশে বেসরকারী উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়েছে এবং তা সফলতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

ইসলাম এর অনুসারীদেরকে অর্থ বিনিয়োগ করার অবাধ সুযোগ দেয় না; বরং বিনিয়োগের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটা মূলনীতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ধন বিনিয়োগ বা উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। অন্যদিকে যেসব উপায় অবলম্বন করলে ধন-উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সঙ্গত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি কুর'আন মজীদে এভাবে বিবৃত হয়েছে :

يايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما- ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে (অথবা পরস্পর

---

১. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পরকে) ধ্বংস করো না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি করুণাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যুলুম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবো।[২]

এ নীতিগত নির্দেশ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করা হয়েছে :

উৎকোচ,[৩] ব্যক্তি, সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাত,[৪] চুরি,[৫] এতীমের অর্থ অন্যায়ভাবে তসরূপ,[৬] ওজনে কম করা,[৭] চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসা,[৮] বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ,[৯] মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসা ও মদ পরিবেশন,[১০] জুয়া ও এমন সব উপায় উপকরণ যেগুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যক্রমে একদল লোকের সম্পদ অন্য একদল লোকের নিকট হস্তান্তরিত হয়,[১১] মূর্তি গড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা,[১২] ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষির ব্যবসা,[১৩] সুদ খাওয়া।[১৪]

বৈধ উপায়ে যে ধন উপার্জন করা হবে তা পুঞ্জীভূত করে রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে ধনের আবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং ধন বণ্টনে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে পুঞ্জীভূত করে রাখে সে নিজে যে কেবল মারাত্মক নৈতিক রোগে আক্রান্ত হয় তাই নয় বরং মূলত সে সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি জঘন্যতম অপরাধ করে। এর ফল তার নিজের জন্যও খারাপ হয়। এজন্য কুর'আন কার্পণ্য এবং কারূণের ন্যায় সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করে রাখার বিরোধিতা করেছে কঠোরভাবে। কুরআনে এসেছে :

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم-

যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক; বরং প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর।[১৫]

---

২. আন নিসা : ২৯-৩০।
৩. আল বাকারা : ১৮৮।
৪. আল বাকারা : ২৮৩ ও আলে ইমরান : ১৬১।
৫. আল মায়িদা : ৩৮।
৬. আন নিসা : ১০।
৭. আল মুতাফ্ফিফীন : ৩।
৮. আন নূর : ১৯।
৯. আন নূর : ২, ৩৩।
১০. আল মায়িদা : ৯।
১১. আল মায়িদা : ৯০।
১২. আল মায়িদা : ৯০।
১৩. আল মায়িদা : ৯০।
১৪. আল বাকারা : ২৭৫, ২৭৮-২৮০, আলে ইমরান : ১৩০।
১৫. আলে ইমরান : ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم-

যারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।[১৬]

সঞ্চয় করার পরিবর্তে ইসলাম অর্থ ব্যয় করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ব্যয় করার অর্থ বিলাসিতা ও আরামের জীবন যাপন করে দু-হাতে অর্থ লুটানো নয়; বরং ব্যয় করার ক্ষেত্রে 'আল্লাহ্‌র পথে'র শর্ত আরোপ করে। অর্থাৎ সমাজের কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজে তার অর্থ পুনঃ পুনঃ বিনিয়োগের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে। এটিই হবে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়।

ويسئلونك ماذا ينفقون- قل العفو-

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কী ব্যয় করবে? তাদেরকে বলে দাও, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় কর)।[১৭]

وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتمى والمسكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم-

আর সদ্ব্যবহার কর নিজের মা বাপ, আত্মীয়স্বজন, অভাবী, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, নিজের বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও মালিকানাধীন দাসদাসীদের সাথে।[১৮]

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم-

তাদের অর্থ সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।[১৯]

বিত্তবান মনে করে, অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে, অর্থ ব্যয় করলে অর্থ কমে যাবে না বরং এতে বরকত হবে ও বৃদ্ধি হবে, বিনিয়োগের পন্থায় অর্থ সঞ্চালিত হবে।

الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا-

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয়; কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন।[২০]

বিত্তবান মনে করে কোনো কিছু ব্যয় করা হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, তা নষ্ট হয়ে যায়নি বরং তার সর্বোত্তম লাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসবে।

---

১৬. আত তাওবা : ৩৪।
১৭. আল বাকারা ; ২১৯।
১৮. আন নিসা : ৩৬।
১৯. আয যারিয়াত আয়াত : ১৯।
২০. আল বাকারা : ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون-

সৎ কাজে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে এবং তোমাদের উপর কোনোক্রমেই যুলম করা হবে না।[২১]

وانفقوا مما رزقنهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور- ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله-

যারা আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে, যাতে কোনোক্রমেই লোকসানের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন বরং মেহেরবানী করে তাদেরকে আরো বেশী দান করবেন।[২২]

বিত্তবান মনে করে, সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, সুদের মাধ্যমে বরং সম্পদ কমে যায়। সৎকাজে অর্থ বিনিয়োগ করলেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

يمحق الله الربوا ويربى الصدقت-

আল্লাহ সুদ নির্মূল করেন এবং দান-সাদকাকে প্রতিপালন ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।[২৩]

وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتينم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون-

তোমরা এই যে সুদ দাও মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধির আশায়, জেনে রাখ, আল্লাহর নিকট তা কখনো বৃদ্ধি লাভ করে না! তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ যে অর্থ দান করে থাক একমাত্র তার মধ্যেই ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।[২৪]

উল্লেখ্য, পুঁজিপতি যদি কখনো সৎকাজে কোনো অর্থ ব্যয় করে তাহলে তার পিছনে তার আবেগ ও সদিচ্ছা থাকে না; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেই তা করে থাকে এবং এজন্য সে সবচেয়ে নিকৃষ্টমানের সম্পদ ব্যয় করে; তারপর নিজের শাণিত বাক্য-বাণে বিদ্ধ করে অর্থগ্রহীতার অর্ধেক প্রাণ বের করে নেয়। বিপরীত পক্ষে ইসলাম সবচেয়ে ভালো সম্পদ ব্যয় করা এবং এজন্য নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ না করা, এমনকি প্রতিদানে কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এ আশাও পোষণ না করার শিক্ষা দেয়।

انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون-

তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছো, আর যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর; আর বাছাই করে নিকৃষ্টতর বস্তু ব্যয় করো না।[২৫]

لا تبطلوا صدقتكم بالمن والاذى-

---

২১. আল বাকারা : ২৭২।
২২. ফাতির : ২৯-৩০
২৩. আল বাকারা : ২৭৬।
২৪. আর রূম : ৩৯।
২৫. আল বাকারা : ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদকাসমূহ ধ্বংস করো না।[২৬]

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا- انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور-

আর তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকীন, এতীম ও কয়েদীকে আহার করায় এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (এজন্য) আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশী নই।[২৭]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ধন একস্থানে পুঞ্জিভূত ও কুক্ষিগত হয়ে থাকতে পারবে না; ইসলামী সমাজে যারা তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের কারণে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ আহরণ করবে, ইসলাম চায় তারা যেন এই সম্পদ পুঞ্জিভূত করে না রাখে, এগুলো যাকাতের পন্থায় এমনভাবে বিনিয়োগ করতে যাতে সেখান থেকে ধনের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্পবিত্তের লোকেরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম হবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম একদিকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান, উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করে। যাতে লোকেরা নিজেদের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা আকাংখা অনুযায়ী ধনসম্পদ সঞ্চয় করাকে খারাপ জানবে এবং তা যাকাতের পন্থায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হবে। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীকে নামাযের পরে এ যাকাতের উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ সঞ্চয় করে, যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তার ঐ সম্পদ হালাল হতে পারে না।

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها-

(হে নবী!) তাদের ধনসম্পদ থেকে একটি সাদকা গ্রহণ কর, যা ঐ ধনসম্পদকে পাক পবিত্র ও হালাল করে দেবে।[২৮]

অন্য আয়াতে যাকাতের অর্থ কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করতে হবে এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

انما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل-

মূলত সাদকা-যাকাত হচ্ছে ফকির[২৯] ও মিসকীনদের[৩০] জন্য এবং তাদের জন্য।

---

২৬. আল বাকারা : ২৬৪।

২৭. আদ দাহর : ৮-৯।

২৮. আত তাওবা : ১০৩।

২৯. ফকির এমন সব লোকদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে কম রোজগার করার কারণে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। -লিসানুল আরব

Dhaka University Institutional Repository

নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগ, আল্লাহ্‌র পথে বিনিয়োগ ও যাকাত আদায় করার পরও যে অর্থসম্পদ কোনো একহাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে তাকে বিকেন্দ্রীভূত করার জন্য ইসলাম আর একটি পন্থা অবলম্বন করেছে। একে বলা হয় মীরাসী আইন। এ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে তা যতো কম বা বেশী হোক না কেন, তা কেটে টুকরো টুকরো করা হবে এবং নিকট ও দূরের সকল আত্মীয়ের মধ্যে ক্রমানুসারে বণ্টন করা হবে। যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে, যার কোনো ওয়ারিশ নেই, তাহলে তাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার অধিকার দেয়ার পরিবর্তে, তার সম্পদ মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা করে দিতে হবে। তাহলে সমগ্র জাতি এ থেকে লাভবান হতে পারবে। মীরাস বণ্টনের এ আইনের অস্তিত্ব একমাত্র ইসলামেই দেখা যায়, অন্য কোনো অর্থব্যবস্থায় এর অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য অর্থব্যবস্থা এ ব্যাপারে যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা এক ব্যক্তি যে অর্থ সঞ্চিত করে রেখে যায়, তার মৃত্যুর পর তা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট কেন্দ্রীভূত রাখতে চায়।[৩১] কিন্তু ইসলাম সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতি, এর ফলে অর্থের বিনিয়োগ সহজতর হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে স্তরে স্তরে।

যুদ্ধে সেনাবাহিনী যে গনীমতের অর্থ (শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ) হস্তগত করে, সে সম্পর্কে ইসলাম একটি বিশিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে। এ অর্থসম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। চারভাগ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং অবশিষ্ট একভাগ সাধারণ জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার জন্য রেখে দেয়া হয়।

واعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل-

জেনে রেখো, গনীমত হিসেবে তোমরা যা কিছু হস্তগত কর, তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ তাঁর রাসুল, রাসূলের নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।[৩২]

আল্লাহ্ ও রাসূলের অংশ বলতে এমন অংশকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের আওতাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া যুদ্ধের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র যেসব সম্পদ সম্পত্তির মালিক হয় ইসলাম সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন রাখার বিধান দিয়েছে।

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل- كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ... للفقراء المهجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ... والذين تبوؤ الذار والايمان من قبلهم... والذين جاءوا من بعدهم-

---

৩০. মিসকীনদের সংজ্ঞা বর্ণনা করে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন : 'যারা অর্থ উপার্জন করতে পারে না অথবা অর্থ উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে যে দরিদ্র শিশু এখনো অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা রাখে না এবং যেসব বেকার ও রুগ্ন ব্যক্তি সাময়িকভাবে উপার্জনের যোগ্যতা বঞ্চিত তারা সবাই মিসকীন।

৩১. জেষ্ঠ্য পুত্রের উত্তরাধিকার (Primogeniture) এবং একান্নবর্তী পরিবার (Joint Family System) প্রথা এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

৩২. সূরা আনফাল : ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

> জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে আল্লাহ্ 'ফায়' (বিনাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের যেসব সম্পদ হস্তগত হয়) হিসেবে যা কিছু দান করেছেন তা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, রাসূলের নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে এগুলো কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। ... আর এর মধ্যে অভাবী মুহাজিরদেরও অংশ রয়েছে, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সহায় সম্পদ থেকে বেদখল করে নির্বাসিত করা হয়েছে। ... আর তাদের অংশ রয়েছে যারা মুহাজিরদের আসার আগে মদীনায় ঈমান এনেছিল। ... আর তাদের পরে ভবিষ্যতে আগমনকারী বংশধরদেরও অংশ রয়েছে।[৩৩]

এ আয়াতগুলোতে কেবলমাত্র 'ফায়লব্ধ' অর্থের ব্যয়ক্ষেত্রগুলোর বিশদ বর্ণনা করা হয়নি; বরং এইসঙ্গে যে উদ্দেশ্যে ইসলাম ফায়লব্ধ অর্থসম্পদ বন্টন তথা সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে সেদিকেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ :

كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم-

'অর্থসম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।' কুরআন মজীদ ছোট একটি বাক্যের মধ্যে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছে সেটিই হচ্ছে সমগ্র ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর।

---

৩৩. আল হাশর : ৭-১০।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন
মুহাম্মদ আবদুল মতিন জালালাবাদী অনূদিত
: ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ
১ম খণ্ড, ঢাকা : ইফাবা, ৩য় সং, ২০০৩।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম
: সুদমুক্ত অর্থনীতি
ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০০২।

আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ
: ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব, প্রয়োগ, পদ্ধতি
ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৪।

এ এ এম হাবীবুর রহমান
: ইসলামী ব্যাংকিং
ঢাকা : হেলেনা পারভীন, ২য় সং, ২০০৪।

ড. ইউসুফ আল কারযাভী
আবদুল কাদের অনূদিত
: ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৯১।

এ জেড এম শামসুল আলম
: ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা
ঢাকা : ইফাবা, ৪র্থ সং, ২০০৫।

ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী
মোস্তাক মোহাম্মদ আব্দুল মুক্তাদির
মুনাওয়ার আলী এবং একে এম মফিজুল ইসলাম অনূদিত
: ইসলামী ব্যাংকিং
ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪।

মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন
: ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ
ঢাকা : সপ্তপদী প্রকাশনী, ১৯৯১।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত
: ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ২০০২।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত
: ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ২০০২।

মাওলানা হিফজুর রহমান
মওলানা আবদুল আউয়াল অনূদিত
: ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় প্রকাশ, ২০০০।

প্রবন্ধ সংকলন
: ইসলামী অর্থনীতি
ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৪।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
: ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন
ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০০৩।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন
: ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা
ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : ইসলামের অর্থনীতি
ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯৭।

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে
ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।

আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া : ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন
ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৩।

এম এ হামিদ
প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
অনূদিত ও সম্পাদিত : ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ
ঢাকা : দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য অনূদিত : ইসলামী অর্থনীতি
ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৪।

আহমাদ আবদুল কাদের : সেবা দারিদ্র বিমোচন ইসলাম
ঢাকা : নুসরা, ১৯৯৯।

শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান : ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব
ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৪।

অধ্যাপক মাওলানা এ কিউ এমন ছিফাতুল্লাহ : ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং
ঢাকা : প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২০০২।

ইকবাল কবীর মোহন : আধুনিক ব্যাংকিং
ঢাকা : সৌরভ প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত : ইসলামে হালাল-হারামের বিধান
ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১১শ প্রকাশ, ২০০৫।

মুহাম্মদ মাহ্ফুজুর রহমান ও
বিএম হাবিবুর রহমান সম্পাদিত : ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি
ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৬।

Dr. Masudul Alam Chowdhury : A Dynamic analysis of Trade and Development in Islamic Countries : Selected Case Studies
Dhaka : Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), 2003.

এ কে এম ফজলুল হক ও আবদুল গোফরান : ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি
ঢাকা : ১ম সংখ্যা, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ মুখলেছুর রহমান : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ্ বোর্ড
ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৪।

ড. খালীফা আবদুল হাকীম
সাইয়েদ আবদুল হাই অনূদিত : ইসলামী ভাবধারা
ঢাকা : আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স, ৩য় সং, ২০০৪।

মুহাম্মদ আমিনুর রহমান : বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্
ঢাকা : মতিয়া হাসান, ৩য় প্রকাশ, ২০০৪।

ড. এম এ মান্নান : ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ
ঢাকা : ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩।

মোঃ হেদায়েত উল্লাহ : ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং
ঢাকা : মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, ২০০০।

ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী
মোঃ কারামত আলী নিযামী অনূদিত : শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার
ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় সং, ২০০৪।

মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন : জেনারেল ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ
ঢাকা : সপ্তপদী প্রকাশনী, ২০০২।

গবেষণা বোর্ড সম্পাদিত : আল-কুরআনে অর্থনীতি (২য় খণ্ড)
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯০।

অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী : অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম
ঢাকা : স্মৃতি প্রকাশনী, ১৯৭৬।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
আবদুল মান্নান তালিব ও
আব্বাস আলী খান অনূদিত : সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, ২০০২।

বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী
অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন : সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়
ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০২।

মাও. মোহাম্মদ ইসমাঈল খাঁন : ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও ব্যবসা
ঢাকা : মীর পাবলিকেশন্স, ২০০১।
: যাকাত ওইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ২০০৫।

Dr. Rock-Antoine Mehanna
Dr. Kabir Hassan : On Openness Integration and Economic Growth
Dhaka : Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), 2003.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : সুদ সমাজ অর্থনীতি
ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২।

আবুল কাসেম হায়দার : বাণিজ্য বিনিয়োগ দুর্নীতি
ঢাকা : অনন্যা, ২০০৭।

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান : দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ
ঢাকা : স্টাডি পাবলিকেশান, ২০০২।

এম উমর চাপরা
ড. মাহমুদ আহমদ অনূদিত : ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০।

শাহ আবদুল হান্নান : বিশ্ব পরিস্থিতি, অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ
ঢাকা : বুক মাস্টার, ২০০৬।

ইমাম আবূ উবায়দ আল-কাসিম
ইব্ন সাল্লাম (র)
ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত : কিতাবুল আমওয়াল (প্রথম খণ্ড)
(ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা)
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭।

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ
রাজশাহী : স্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।